توجيهات الكلمة

ويليه ملحق بـ " لا إله إلا الله محمد رسول الله" كلمة صحيحة وتوحيدية

تأليف:

أكرم الزمان بن عبد السلام

الليسانس: الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة. الماجستير: جامعة دار الإحسان داكا.
مدير معهد التربية والثقافة الإسلامية- حاليا.
مدير قسم الدعوة والتعليم بجمعية إحياء التراث الإسلامي- الكويت- فرع بنغلاديش – سابقا.
الاستاذ المساعد بجامعة بنغلاديش الإسلامية، داكا- سابقا.

কালিমার মর্মকথা

সাথে রয়েছে
কালিমাহ "লা- ইলা-হা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" একটি শুদ্ধ ও তাওহীদী বাক্য

সংকলন:

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লীস্যান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব,
এম. এ. দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,
মহা পরিচালক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউট, কাজীবাড়ী, চাঁন পাড়া, উত্তর খান, ঢাকা।
বিভাগীয় প্রধান - শিক্ষা ও দাওয়াহ বিভাগ, (সাবেক) : জমঈয়তু ইহ্য়াউত্ তুরাছ আল-ইসলামী, কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস।
সহকারী অধ্যাপক (সাবেক), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কালিমার মর্মকথা

সাথে রয়েছে কালিমাহ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" একটি শুদ্ধ ও তাওহীদী বাক্য

সংকলক ঃ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম ।

প্রকাশক ঃ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউট
কাজীবাড়ী, চাঁন পাড়া, উত্তর খান, ঢাকা ।
০১৯১৪-০০৪৮৪৭, ০১৮১৭-১২৯৮০৭, ০১৭১৫-৪৫৮৫৪৪ ।

প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ :২০১০ ঈসায়ী

শব্দ বিন্যাস ঃ আবু আমিনাহ জায়েদ

বিনিময় ঃ ২৫০/= (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র ।

সূচি পত্র

দ্বিতীয় অংশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

المقدمة

ভূমিকা ঃ

ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। ছলাত ও সালাম নাযিল হোক নাবী মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) উপর এবং তাঁর পবিবার পরিজন ও ছাহাবায়ে কিরামের উপর এবং যারা তাকে ভালবাসে ও যথাযথ অনুসরণ করে তাদের সকলের উপর।

বহু প্রতিক্ষিত মুল্যবান গ্রন্থ "কালিমার মর্মকথা" বহুদিন যাবত প্রকাশ অপেক্ষায় থাকার পর আজ মুদ্রিত হচ্ছে। এর জন্য আল্লাহর দরবারে হামদ, ছানা এবং শুকরিয়া জানাচ্ছি।

"কালিমাহ" বলতে উদ্দেশ্য দ্বীন ইসলামের পাঁচটি রুকনের প্রথম রুকন। ইসলামের রুকন পাঁচটি হলো: কালিমাহ, ছলাত, যাকাত, ছিয়াম ও হাজ্জ। ইসলামের রুকন কালিমাহ অর্থ ও মর্মগতভাবে একটিই। "কালিমাহ" এর শব্দগত দিক দেখলে বহু রকমের শব্দে পাওয়া যাবে। অসুক্ষ্ম একটি অনুসন্ধানেই প্রায় ২০ রকম শব্দের একটা তালিকা হয়েছে। এ সমস্ত শব্দের নির্দেশনা হচ্ছে একটিই তা হলো সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব বা আল্লাহ এক তার স্বীকৃতি দান, বিশ্বাস ও বাস্তবায়ন করা। এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য শিক্ষক ও আল্লাহর বিধি-বিধানের একমাত্র বর্ণনাকারী নাবী ও রসূল।

এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত শব্দগুলো হলো " لا إله إلا الله" " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। "اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" "আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ" অর্থাৎ আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবূদ নেই আর মুহাম্মাদ (ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছে আল্লাহর রসূল। " لا إله إلا الله محمد رسول الله" লা ইলা-হা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ "আলাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ (ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) আলাহর প্রেরিত রসূল।

ইলম অর্জনের পর ইসলামের প্রথম ফরয হল এই কালিমাহ। কুরআন যেমন নবুওতের সুদীর্ঘ ২৩ বছরে নাযিল হয়েছিল। ঠিক তেমনি ইসলামের ৫টি রুকন দীর্ঘ ২৩ বছরে ফরয হয়েছে। প্রথমে শুধু কালিমা ফরয করা হয়। এ ফরযের জ্ঞান প্রচার এর জন্য ১২ বছর বরাদ্দ করা হয়েছিল। এ ১২ বছর পর্যন্ত নবী (ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জানানো হয়নি ইসলামের বাকী ৪টা রুকন সম্পর্কে। মক্কী জীবনের প্রায় ১৩টি বছর কেবল কালিমার দাওয়াত দিতেন। তাই তো তিনি এ সময় কালে কালিমাহ্ তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বললে জান্নাতে যাওয়ার কথা বা নিশ্চয়তা দিতেন। হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজের রাত্রে দ্বিতীয় রুকন ছলাত ফরয করা হয়েছিল। এরপর মদীনায় হিজরত করার পর যাকাত, ছিয়াম ও হাজ্জ ফরয করা হয়। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার বিষয়, কেন আল্লাহ প্রথম রুকন কালিমার দাওয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এত দীর্ঘ সময় (একটি রুক্নের জন্য) ১২ বছর এবং ৪টির জন্য ১১ বছর বরাদ্দ করলেন? । এর কারণ হল এই যে, কালিমার মধ্যেই পুরা ইসলামের সারনির্যাস রয়ে গেছে। এবং এর ভিতর এমন উপকারী সব জ্ঞান সন্নিহিত আছে যে, যে কোন ব্যক্তি তা জানলে ও বুঝলে পুরো ইসলামকে সঠিক ও যথাযথ ভাবে জানতে ও পালন করতে সক্ষম হবে। পুরো কুরআনের জন্য যেমন সূরা আল-ফাতিহা "মূল" তেমনি কালিমাহ্ হলো পুরো ইসলামের মূল। কোন ব্যক্তি কালিমা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান আহরণ সহকারে কালিমার স্বীকৃতি বা উচ্চারণ ও ঘোষণা দিলে এবং অবহিত জ্ঞান অনুযায়ী চর্চা বা আমল করলেই কেবল আল্লাহর দৃষ্টিতে ও রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিবেচনায় মু'মিন মুসলিম হতে পারবে। যারা আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট হয়ে এবং সমস্ত কাফির শক্তির উপর বিজয়ী হয়ে থাকে। শুধু উচ্চারণ ও যিকর দ্বারা আল্লাহর দৃষ্টিতে ও রসূলুলাহ (ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম)এর বিবেচনায় মুসলিম বা মু'মিন হতে পারবে না। জ্ঞান ও উপলব্ধি শুণ্য কালিমার মাধ্যমে ভূগোলবিদ

(ভূগোল লেখক) ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে ভৌগলিক মুসলিম হওয়া যায়। যারা হবে কাফিরদের পদলেহী ও তাদের করুণার ভিখারী। যার দৃষ্টান্ত হলো বর্ত্তমান যুগের হাজারে ৯৯৯ জন মুসলমান।[১] এসব মুসলিমের সহজ শব্দে আসল পরিচয় হলো নিম্নোক্ত শব্দগুলো।

১। ইসলামবিহীন মুসলমান

২। আত্মস্বীকৃত মুসলমান।

৩। স্বঘোষিত মুসলমান।

৪। শব্দভিত্তিক অর্থহীন মুসলমান।

৫। ভৌগলিক মুসলমান।

৬। প্রচলিত মুসলমান।

৭। পৈতৃক সূত্রে মুসলমান।

৮। আজব মুসলমান।

৯। অবান্তর মুসলমান।

১০। আজগুবী মুসলমান।

১১। অপ্রকৃত মুসলমান।

এর মধ্যে আছে জনসাধারণ এবং এসব জনসাধারণের নিকট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আলিম, ইমাম, মুহাদ্দিছ, শাইখুল হাদীছ, খত্বীব, পীর, ওলী, দরবেশ, আওলাদে রসূল, আধ্যাত্মিক নেতা, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দলের নেতা, নেত্রী, কর্মী, বুদ্ধিজীবি, ডক্টর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, বিত্তশালী, মন্ত্রী, এম,পি, চেয়ারম্যান, মিম্বর, মণ্ডল, মাতাব্বর নিম্নপদস্থ ও উচ্চপদস্থ মানবতাবাদী, নারীবাদী, মানবাধিকারের রক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইত্যাদি।

বিষয়টা বুঝার মত করে বলা যাক ঃ

(১) ৭/৮ জন মিলেও যদি একটা সংগঠন দাঁড় করানো হয়, তবুও এই সাত-আটজনকে সংগঠনে আবদ্ধ রাখার জন্য কিছু নিয়মাবলী নির্ধারণ

---

[১] টীকা: হাজারে ৯৯৯ জন ভৌগলিক মুসলিম এ মন্তব্য করেছেন মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র মাসজিদুল হারাম মক্কা মুকাররামার প্রাক্তন ইমাম ও খতীব সম্মানীত শাইখ আবুস সাম্হ মুহাম্মাদ আব্দুয যা-হির মুহাম্মাদ নুরুদ্দীন (রহ.)।

– দেখুন তার নিজস্ব লিখিত কিতাব হায়াতুল কুলূব পৃষ্ঠা ৫৭।

করতে হয়, এগুলোই হল এ সংগঠনের জ্ঞান। কোন একজন যদি সংগঠনের নিয়মাবলীর জ্ঞানের ধার না ধারে, সে কি ঐ সংগঠনের সদস্য থাকতে পারবে???

জবাব দিন যদি জ্ঞান ও বিবেক থেকে থাকে।

ইসলাম হল আল্লাহ প্রদত্ত একটা দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। সেই দ্বীনের জ্ঞান অর্জন না করে কিভাবে আপানি মুসলিম থাকতে পারেন?!

ইসলাম কি তাহলে অজ্ঞান ও পাগলদের ধর্ম?

২। ক্লাশ ওয়ান পাশ করতে হলে তার জন্য সিলেবাসভূক্ত নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক রয়েছে বাংলা, অংক, ইংরেজী– এই তিনটি পুস্তকে যে জ্ঞান বা পড়া রয়েছে, কোন ছাত্র বা ছাত্রী যদি এ পুস্তকগুলোর জ্ঞান অর্জন না করে বা ভাসা ভাসা কিছু জানে বা ফাঁকিবাজি করে এ ছাত্রটি কি ওয়ান পাশ করতে পারবে? কখনই না। বরং সে ওয়ান ক্লাশও পাশ করতে পারবে না। আল্লাহ জাহিলী যুগের জাহিলিয়াত বা অজ্ঞতা ও মুর্খতাকে উৎখাত করার জন্য আলোকোজ্জ্বল দ্বীন ইসলাম পাবার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে দু'খানা কিতাব নাযিল করেছেন। যদি সেই কিতাব দু'খানার জ্ঞান অর্জন না করে বা ইসলামে প্রবেশ ও তার ভিতরে বহাল থাকার নিয়মাবলী যদি না জানে বা অজ্ঞ থেকে যায় তাহলে কিভাবে অর্থগত মুসলিম হতে পারবে? নিজের জ্ঞান ও বিবেকের মূল্যায়ণ করে বা সাধারণ জ্ঞান বা কমনসেন্স দিয়ে বিষয়টা ভাবুন তো? জবাব কি আসে ও ফলাফল কি দাঁড়ায়?

কালিমা সম্পর্কিত অনেক জরুরী জ্ঞানই মক্কা-মদীনা থেকে আমাদের দেশে বা ভারতবর্ষে পৌঁছেনি। যেমন কালিমার শর্তাবলী ও কালিমা ভঙ্গের কারণ। তাওহীদ সুন্নাহ্‌র সঠিক জ্ঞান পৌঁছেনি বললেই চলে। যার জন্য খাঁটি মুসলিমের অভাব। অনেক মুসলিম এ অঞ্চলে থাকলেও তারা এ দেশে দলে-দলে, পীরে-পীরে, দরগা-দরবারে এবং মাযহাব-ত্বরীকায় বিভক্ত। আমল-আক্বীদায় শিরক ও বিদআতে পরিপূর্ণ। অবশ্য ২০/২৫ বছর যাবত উপরোক্ত বিষয়সমূহের কিছু কিছু প্রচার হচ্ছে। এতেই বিদআতী অনেক আমলে ধাক্কা লেগেছে। এসব জ্ঞানের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন। তাহলে শির্ক বিদআত কমবে।

কালিমার সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারলে এ বিভক্ত মুসলিম জাতি আবার ঐক্যবদ্ধ হবে। আমল আক্বীদায়, তাওহীদবাদী ও সুন্নাহ পন্থী হবে। এভাবে সত্যিকার অর্থে মুসলিম হতে সক্ষম হবে।

কালিমার অর্থ ও মর্মগত শিক্ষা-দিক্ষা এ দেশে নেই বললেই চলে। শব্দগত চর্চাটা ব্যাপক দেখা যায়। বিভিন্ন স্বর, ভঙ্গিমা,পন্থা ও পদ্ধতিতে কালিমার যিকর-এর মহড়া প্রদর্শন করে থাকে পীর-মুর্শিদের দল। ভিক্ষুকরা কালিমাকে তাদের ভিক্ষার স্বর বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে। এ সবই বিদ'আতী চর্চা ছাড়া আর কিছু নয়।

সম্প্রতি কালিমার শব্দগত চর্চার মহড়ার সাথে আরেক মাত্রা যোগ হয়েছে। তা হলো এই যে, কিছু বাংলা আলিম (জেনারেল শিক্ষিত) ব্যক্তি বলছেন " لا إله إلا الله محمد رسول الله" "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" নাকি ভুল ও শিরকী বাক্য। এ ভ্রান্তির আয়োজন সহ প্রচারকারী আব্দুল্লাহ ফারুক। তিনি **"ইসলামের মূলমন্ত্র "কালিমা ত্বইয়্যিবাহ" কোন বাক্যটি?"** নামক স্বরিরোধীতায় পরিপূর্ণ একটি পুস্তক লিখে অনেককে এ ভ্রান্তির বেড়াজালে ফাঁসিয়ে ফেলেছেন। যে আশঙ্কায় হাক্কানী আলিমগণ নিজ স্বাধীন ও ইলমী শর্তহীন ভাবে জেনারেল শিক্ষিতদেরকে ইসলামী গ্রন্থ সংকলনে নিরুৎসাহিত করেন সে আশঙ্কাই বাস্তবে ঘটে গেছে। তিনি তার কিতাবটিকে প্রশ্নপত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ উনি ৪৭ জন আলিম এর নিকট উপরোক্ত প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। যে প্রশ্নটি তাঁর বইয়ের শিরোনাম। উক্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব জানা ও জানানো যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে উত্তর পাওয়ার পরই বইটি লেখা উচিত ছিল। মজার ব্যাপার চারজন ছাড়া কেউই তার প্রশ্নপত্রের উত্তর দেয়নি। পত্রের উত্তর দিলেও প্রশ্নের কাঙ্খিত উত্তর কেউই দেয়নি। দু'এক জনের উত্তরকে ধ্যাণ মাফিক ব্যাখ্যা করে (যাকে অপব্যাখ্যাই বলা যায়) নিজ ধারণাপ্রসূত সিদ্ধান্তের পক্ষে খাটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। তার বইখানা পড়ে আমি যেটা বুঝেছি তা হলো এই যে, কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ কোন বাক্যটি প্রশ্নের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি নেয়া যে, কালিমাহ্ ত্বইয়্যিবাহ হলো শুধু " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' " لا إله إلا الله", "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" " لا إله إلا الله محمد رسول الله" কালিমাহ্ ত্বইয়্যিবাহ নয়। সাথে সাথে এ স্বীকৃতি আদায়ও

উদ্দেশ্য ছিল যে, দ্বিতীয় শব্দে কালিমাটি ঠিক নয়, বা অশুদ্ধ ও শিরকী বাক্য। তার কাংখিত বিষযেই বিশেষ করে শেষোক্ত বিষয়ে স্বীকৃতি আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরণের উত্তরের জন্য যেভাবে প্রশ্ন করা উচিত ছিল সেভাবে প্রশ্ন করার সাহস পায়নি। তা হলো এ ধরনের প্রশ্ন لا إله إلا الله محمد رسول الله কি শুদ্ধ বাক্য? অথবা এটা কি ভুল বাক্য নয়। অথবা এটা কি শিরকী বাক্য নয়?

এ ধরণের প্রশ্ন করলে ৪৭ জনই উত্তর দিতে বাধ্য হতো। আর তারা সত্যিকার অর্থে হিদায়াতপ্রাপ্ত আলিম হলে জাওয়াবে বলতেন প্রশ্নকারী একজন মনোবৃত্তির পুঁজারী, পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন অথবা হতে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি এ বিষয়ে গবেষণা ত্যাগ করে দ্বীনের আক্বীদাহ্ বিষয়ে জরুরী জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত হউন।

কালিমার উপরোক্ত শব্দগত বিভ্রান্তি নিরসণের জন্য গ্রন্থের শুরুর দিকে সাধারণ ও সংক্ষেপে আলোকপাাত করার পর দ্বীনের হিতাকাঙ্খী কিছু ভাইয়ের অনুরোধে গ্রন্থ শেষে কয়েকটি পরিশিষ্ট সংযোজনের মাধ্যমে উক্ত বিভ্রান্তি নিরসণের চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত তথ্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা যাবে সূচিপত্রে চোখ বুলালে। একটা গ্রন্থের সারনির্যাস জানার জন্য তার সূচিপত্র বিরাট সহায়ক ব্যবস্থা।

সুতরাং এ গ্রন্থের সন্নিবেশিত বিষয়াদির উল্লেখ না করে ভূমিকার ইতি এখানেই টানছি।

এ গ্রন্থখানার নাম অনেক ভাই বোন- আমার লিখিত অন্যান্য কিতাবের শেষে লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের তালিকায় পড়ার পর মুদ্রণের জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ করতে থাকেন। এমনকি জনৈক ইসলামপ্রিয় ভাই গ্রন্থখানা তাদের সৌজন্যে বিতরণের জন্য অনেক পূর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থও আমাকে হস্তান্তর করেছেন। আল্লাহ তাদের অর্থ কবুল করুন। গ্রন্থখানাকে মুসলিম নর-নারীদের আক্বীদাগত উন্নয়ন ও আক্বীদাগত বিভিন্ন ভ্রান্তি নিরসনের ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসাবে কবুল করুন। গ্রন্থখানাকে আমার জন্য ও যাদের লিখিত গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি তাদের সকলের জন্য জান্নাত লাভের এবং জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি লাভের অসীলা হিসাবে কবুল করুন।

গ্রন্থখানা সংকলন করতে যেয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং সংশোধনের তৌফিক দান করুন।

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৪ই জুন, ২০১১ ঈসায়ী।

التعريف بالكلمة وعددها

কালিমাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সংখ্যা

কালিমা বলতে ইসলামের পাঁচটি রুকনের প্রথমটি উদ্দেশ্য। এটি কুরআন ও হাদীছে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। যে শব্দে অতীত ও বর্তমানে সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজের নিকট পরিচিত ও প্রসিদ্ধ তাহলোঃ اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله আশহাদু আলা–ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়া আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। এ শব্দের পাশাপাশি আরেকটি শব্দ অনুরূপ পরিচিত ও প্রসিদ্ধ রয়েছে তা হল ঃ لا إله إلا الله محمد رسول الله "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এটি হলো ঈমানী বাণী। এ কালিমাটি আশহাদু আলা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" হলো নবী করীম (সা.) কর্তৃক শিক্ষা দেয়া দরূদে ইব্রাহীম এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই সংক্ষিপ্তকরণে ও এর ব্যবহারে সমস্ত মুহাদ্দিছীনে কেরাম ও ফুকাহায়ে ইযাম একমত। ফলে এই সংক্ষিপ্তরূপী কালিমাহ ও দরূদের পঠন ও লিখন এর জাওয়ায (বৈধতার) উপর মুসলিম উম্মতের পূর্বাপর উলামাগণের অঘোষিত ইজমা বলে আখ্যা দিলে মোটেও ভুল হবে না। কিংবা আলাদা দু'টি আয়াত বা দু'টি ছহীহ

হাদীছের বর্ণনা ভঙ্গি থেকে নেয়া হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন মারফু ও মাওকুফ ছহীহ ও যঈফ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরিশিষ্টে দেখুন। কোন অমুসলিম ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে চাইলে শাহাদাহ বা সাক্ষ্যমূলক শব্দসহ তাকে এই কালিমা মুখে উচ্চারণ করতে হবে এবং তার অর্থ ও মর্ম মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে এবং তদানুযায়ী (কালিমার দাবী পুরণার্থে) বাস্তবে আমল করতে হবে।

أسماء الكلمة

কালিমার নামসমূহ

এ কালিমাটি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

(১) কালিমাতুল ঈমান। (২) কালিমাতুল ইসলাম।
(৩) কালিমাতুল্লাহ। (৪) কালিমাতুল ইখলাস।
(৫) কালিমাতুত্ তাওহীদ। (৬) কালিমাতুশ শাহাদাহ।
(৭) কালিমাতুশ শাহাদাতাইন। (৮) কালিমাতুন ত্বইয়্যিবাহ।
(৯) কালিমাতুত-ত্বাকওয়াহ। (১০) কালিমাতুন নাজাত।
(১১) কালিমাতুল বারাআহ। (১২) কালিমাতুয্ যিকর।
(১৩) আফযালুয যিকর (১৪) আল-ক্বওলুছ্ ছাবিত্ব।
(১৫) আল-উরওয়াতুল উছক্বা। (১৬) শাহাদাতুল হাক্ব
(১৭) দা'ওয়াতুল হাক্ব (১৮) মিফতাহুল জান্নাহ্ বা জান্নাতের চাবী ইত্যাদি।

বিভিন্ন শব্দ বিশিষ্ট কালিমাহগুলোর সবগুলোর ক্ষেত্রেই উপরোক্ত সমস্ত নাম ব্যবহার করা সিদ্ধ। অথচ ইদানিং কালিমা তাইয়্যেবাহ কোনটি এ নিয়ে বেশ তোলপাড় চলছে। কেউ বলছে কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর পক্ষ অবলম্বনকারীদের কেউ কেউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কে কালিমার অংশ নয় বলেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি বরং শব্দগতভাবে বাক্যটিকে ভুল ও অর্থগত দিক দিয়ে শির্কী বাক্য বলেও মন্তব্য করেছে। এটা নিতান্তই ভুল ও আরবী ভাষা জ্ঞান স্বল্পতার পরিচয়। আবার কেউ কেউ উভয় অংশকে সম্মিলিতভাবে কালিমা তাইয়্যিবাহ বলেন। এর ব্যাপক ব্যবহার পূর্ব থেকে

চলে আসছে। সম্মিলিত রূপকে কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ বলা নবী (সা.) এর ছহীহ মারফূ হাদীছে পাওয়া না গেলেও সাহাবা তাবেঈগণ তথা সালাফে সালিহীনদের থেকে কালিমার এ রূপটির ব্যবহার ব্যাপকভাবে চলে আসছে। অতএব, এর ব্যবহার ছহীহ শুদ্ধ এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোন অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার জন্য এটি পড়বেন না, কারণ এতে শাহাদাত (সাক্ষ্য) দানমূলক শব্দ নেই। যা মুসলিম হওয়ার সময় জরুরী। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তির জন্য উক্ত শব্দ বিশিষ্ট কালিমার ব্যবহারে দোষারোপের কিছু নেই। والله أعلم

বি.দ্র. কালিমাহর শব্দাবলী বা কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ কোন বাক্যটি এবং কোন্ শব্দে কালিমার বাক্যগুলো ব্যবহার দলীলসম্মত ও ব্যাকরণ তথা ভাষাগতভাবে শুদ্ধ আর কোন্ বাক্যে কালিমাহর ব্যবহার অশুদ্ধ তা পরিশিষ্টে দেখুন। এই মুহূর্তে গুরুত্বহীন মনে করায় পরিশিষ্টে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

كم عدد الكلمة

কালিমা কয়টি?

ঈমানী কালিমাহ বা বাণী মাত্র একটি। আর সেটি হল উপরোক্ত কালিমাটি। এটিই ঈমানী কালিমাহ। এটিই তাওহীদি কালিমাহ এটিই শাহাদাতী কালিমাহ। একই কালিমাহ বহু নামে পরিচিত। যেমনটি নাম সমূহের তালিকা থেকে জানা গেছে। বিভিন্ন নামায শিক্ষা বই ও কায়দায় ৪ বা ৫টি নাম দিয়ে পাঁচ কালিমা উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় যে, যে ব্যক্তি পাঁচটি কালিমাহ কণ্ঠস্থ না করবে সে পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। এই কথা একেবারে দলীলশূণ্য ও ভিত্তিহীন। আসলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশের জন্য একটিই কালিমাহ রয়েছে। একাধিক নয়। এই কালিমাটিকে বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কখনো সংক্ষিপ্ত কখনো কিছু ব্যাখ্যাসহ কখনো আরো বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিভাবে বহুনামে অভিহিত করা হয়েছে। এক এক বর্ণনা ভঙ্গিকে বা বিভিন্ন নামানুসারে যদি আলাদা কালিমাহ ধরা হয় তাহলে বিভিন্ন দলীলে পাঁচের অধিক ভঙ্গি ও নাম ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব কালিমাহ পাঁচে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আরো বেশী হবে। সুতরাং কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে পাঁচ বা চার বলার কোন

যথার্থতা নেই। বরং তা ইসলামের জন্য বিরাট ক্ষতিকর। তাদের এই আচরণ (পঞ্চমীকরণ) ইসলামের উপর বাড়াবাড়ি ও ইসলাম ধর্মকে কঠিন করার শামিল। এটা এক থেকে দেড়শত বছরের ভিতরের উদ্ভুত নবজাত বিদআত। উল্লেখযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য কোন পুরাতন যুগের কিতাবে পাওয়া যায় না। মক্কা, মদীনাসহ আরব বিশ্বের কোন কিতাবে আজও এই বিদআতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আরবের কোন আলিম ও জনসাধারণ এসব নামে ৫ (পাঁচ) কালিমাহ জানে না। এটা শুধু ভারতবর্ষের অপরিপক্য মৌলবীরা বিনা গবেষণায় তাদের বড় হুজুরদের দেখাদেখি ও শুনাশুনি বলে ও লিখে থাকেন। আরবদের কিতাবে কালিমাহ একটাই পাওয়া যায়। কালিমা এক হওয়া মুসলিম জাতির ঐক্যের উৎস। এই এক কালিমাকে পাঁচ করে দেখানোতেই অনৈক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আল্লাহ কাফিরদের কালিমাহকে (শির্ককে) নীচু করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর কালিমাহটিকে সমুন্নত করেছেন। আর আলাহই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। – সূরা আত-তাওবাহ : ৪০।

উক্ত আয়াতে নবী (সা.)কে হত্যা করার ব্যাপারে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে নবী (সা.)কে হিফাযত করার মাধ্যমে শির্কের উপর আল্লাহর তাওহীদি কলিমার বিজয় লাভ করার কথা বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতে "কালিমাতুলাহি হিয়াল উল্ইয়াহ" দ্বারা তাওহীদি কালিমাহ "লা ইলাহা ইলালাহ" কে বোঝানো হয়েছে। – তাফসীর ইবনু কাছীর-২/৪৭১।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে كلمة الله আল্লাহর কালিমাটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। كلمات الله "আল্লাহর কালিমাহগুলো" বহুবচনে ব্যবহৃত হয়নি।

নবী (সা.) এর হাদীছ থেকে দলীল:

عن أبي موسى الاشعري رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءا أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله - رواه البخاري ومسلم في صحيحهما -

আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রকাশের জন্য, দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য, শক্তি-সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য এর মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে পরিচালিত। তিনি (সা.) বললেন: যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে এ জন্য যে আল্লাহর কালিমাহ সমুন্নত হোক। এটিই কেবল আল্লাহর পথে পরিচালিত। Ñ†evLvix I gymwjg, Df‡q Zv‡`i Qnxn nv`x‡Q G nv`xQwU msKjY K‡i‡Qb।

জ্ঞাতব্য: ইসলামের কালিমাহ যদি একাধিক হত বা প্রয়োজন থাকত তাহলে উপরোক্ত দলীল দ্বারা একবচনে كلمة الله আল্লাহর কালিমাহ না বলে বহুবচনে كلمات الله আলাহর কালিমাহসমূহ ব্যবহার করা হতো।

أهمية الكلمة

কালিমার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এই কালিমাটিই হলো মুসলিম ব্যক্তির আকীদার উৎস ও সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব লাভের আসল রহস্য। এটিই হলো তাওহীদি বাণী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো তাওহীদ। তাওহীদ অর্থ একত্ব। এই তাওহীদের চেয়ে আর কোন কিছুই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়তর নয়। এ কারণেই তাঁর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় ও নিকৃষ্ট বিষয় হলো তাওহীদের পরিপন্থী যে কোন বিষয় যাকে শিরক বলা হয়। শিরক অর্থ হলো বহুত্ববাদ বা আল্লাহর সাথে আর কাউকে কোন ব্যাপারে অংশীদার মনে করা। নিম্নে এক এক করে কালিমার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো।

১। আল্লাহ তাআলা এই তাওহীদের ঘোষণা বিভিন্ন ধর্মী মুখ থেকে শোনার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পরিপন্থী বিষয় শির্কের অপনোদন ও অস্বীকারের জন্য বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আসমান, জমিন এবং এতদোভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দেয় এবং শিরক ও যাবতীয় ত্রুটি ও কলূষতা থেকে তার পাক পবিত্র হওয়ার ঘোষণা দেয়। আল্লাহ বলেন :

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُورا

সাত আসমান ও যমীন এবং এতদোভয়ের মাঝে অবস্থিত সকলেই তার (শিরক ও যাবতীয় ক্রুটি থেকে) পবিত্রতার ঘোষণা দেয়। কোন এমন সৃষ্টি নেই যে তার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা জ্ঞাপন করে না, কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা জ্ঞাপন (এর ভাষা) বুঝ না, তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ও ক্ষমাকারী। – সূরা ইসরা : ৪৪।

আল্লাহ আরো বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْض وَٱلطَّيْرُ صَآفَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ *

তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে অবস্থিত সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করে। এমনকি (এই উদ্দেশ্যে) পাখিরাও কাতারবন্দী হয়। প্রত্যেকেই নিজস্ব সালাত (গুণগান) ও পবিত্রতা জ্ঞাপন এর পদ্ধতি ও ভাষা জেনে গেছে। আর আল্লাহ খুব ভালো জানেন তারা যে আমল করে থাকে। – সূরা নূর ৪১।

শুধু ঘোষণা করে না বরং কোন কোন মাখলুক ঘোষণার সত্যতা জ্ঞাপনার্থে সিজদাও করে। আল্লাহ বলেন:

وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ *

তরু-লতা ও গাছ-পালা সিজদা করে। – সূরা রহমান– ৬।

আল্লাহ আরো বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلأَرْض وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

তুমি কি দেখনা যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে যারা আসমানে থাকে এবং যারা যমীনে থাকে। সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পবর্তমালা, গাছপালা, প্রাণী ও অনেক মানুষ। আর অনেকের উপর আল্লাহর শাস্তি উপযুক্ত হয়েছে। আল্লাহ যাকে অপমান করেন তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। – সূরা হাজ্জ ১৮|

২। মানব ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও তার পরিপন্থী শির্কের অপনোদন ও উৎখাতের জন্য।

আল্লাহ বলেন:* وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

আমি জ্বীন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য।

–সুরা আয্-যারিয়াত ৫৬।

বহু মুফাসসির إلا ليعبدون শব্দের তাফসীর করেছেন إلا ليوحدون বলে। অর্থাৎ আমি মানব দানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার তাওহীদ ও একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। Ñ†`Lyb Zvdmx‡i KziZex, Zvdmx‡i gvAvwjgyZ Zvbhxj I dvZûj Kv`xi, kvIKvbx|

যারা ليعبدون এর তাফসীর ليوحدن করেছে। তারা দারুণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং খুবই তত্ত্বপূর্ণ ও সুক্ষ্ম অর্থই গ্রহণ করেছেন। কারণ যত ইবাদত রয়েছে নফল হোক আর ফরয হোক সেই ইবাদত এর বাহ্যিক রূপ মুখ্য উদ্দেশ্য নয় বরং তার মাধ্যমে আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ব প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য।

কোন ইবাদত বা আমল যদি এই তাওহীদ শুণ্য হয় তবে সে ইবাদত বা আমল সম্পুর্ণ বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনকি এই ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাতে না যেয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ তাওহীদশুণ্য ইবাদত ও আমল শিরকের মত মহাপাপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই কথার দলীল হিসাবে রাসূলুল্লাহ(সা.)এর এই হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।

নবী (সা.) বলেছেন:

أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أاشرك معي فيه غيري تركته وشركه ـ

আমি সমস্ত শরীকের চেয়ে শরীক হতে অধিক প্রয়োজনহীন, যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে আমি তাকে ও তার শিরককে পরিত্যাগ করেছি। – হাদীছটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

নবী (সা.) অন্য হাদীছে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন:

من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك- (رواه أحمد والحاكم، وفى إسناده ضعف لكنه حسن بشواهده)

যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য ছলাত আদায় করে সে ব্যক্তি শির্ক চর্চা করে, যে ব্যক্তি দেখানো জন্য ছিয়াম পালন করে সে শির্ক করে, যে ব্যক্তি দেখানোর

জন্য দান (ছদাকাহ) করে সে ব্যক্তি শির্ক চর্চা করে। –হাদীছটি ইমাম আহমাদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবীর কারণে দুর্বলতা থাকলেও সহযোগী গ্রহণযোগ্য একাধিক বর্ণনা থাকায় হাসান হওয়ার দাবী রাখে।

শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান বলেন ঃ وذكر أحاديث فى المعنى উক্ত হাদীছের অর্থে বহু (ছহীহ/হাসান) হাদীছ উল্লেখিত হয়েছে। তারপর বেশ কয়েকটি উল্লেখ করেছেন। Ñ দেখুন ফাতহুল মাজীদ পৃঃ ৫৩২-৫৩৫।

এ কথার দলীল হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এই হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য:

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريئ فقد قيل' ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في النار- ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن' فأتي به فعرفه نعمه فعرفها' قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرأن' قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ' فقد قيل' ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار- ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله' فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا انفقت فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد' فقد قيل' ثم امربه فسحب على وجهه حتى ألقي في النار - رواه مسلم رقم 1514

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির ফায়সালা (বিচার) করা হবে সে হল শহীদ ব্যক্তি। তাকে (আল্লাহর দরবারে) নিয়ে আনা হবে অত:পর তাকে যে সমস্ত নিআমত দেয়া হয়েছিল (শক্তি-সাহস, রণকৌশল ইত্যাদি) স্মরণ করানো হবে, সে সমস্ত নিআমতই স্বীকার করবে। এরপর বলা হবে এ সমস্ত নিআমতের শুকরিয়া স্বরূপ কি করেছ? সে বলবে আপনার পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন মিথ্যা বলেছ বরং তুমি যুদ্ধ করেছ এই জন্য যে, বীর যোদ্ধা বলা হবে, আর বাস্তবেও তা বলা হয়েছে। অত:পর নির্দেশ দেয়া হবে ফলে তাকে চেহারার ভরে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করে শিক্ষা দানও করেছিল এবং কুরআন পাঠ করতো। তাকে নিয়ে আসা হবে অত:পর যাবতীয় অনুগ্রহ (পাণ্ডিত্য, সুন্দর কণ্ঠস্বর) স্মরণ করানো হবে সে

তা স্বীকারও করবে। অত:পর আল্লাহ বলবেন এ সমস্ত নিআমতের শুকরিয়া স্বরূপ কি করেছ? সে বলবে ইলম শিক্ষা করেছিলাম এবং তা (মানুষকে) শিখিয়েও ছিলাম, আর আপনার উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন মিথ্যা বলেছ, বরং তুমি ইলম শিক্ষা (বিদ্যা অর্জন) করেছিলে এ জন্যই যে, তোমাকে আলিম বলা হবে। আর কুরআন পাঠ করেছিলে এই জন্য যে, তোমাকে ক্বারী বলা হবে, আর বাস্তবেও তা বলা হয়েছে। অত:পর তার ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হবে ফলে তাকে মুখের ভরে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ স্বচ্ছলতা দান করেছিলেন বিভিন্ন ধরণের ধন-সম্পদ দিয়ে। তাকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিআমতসমূহ স্মরণ করানো হবে আর সে তা স্বীকারও করবে। আলাহ বলবেন এই নিআমাতের দাবী হিসাবে কি আমল করেছ? সে বলবে এমন কোন পথ ছাড়িনি যে পথে খরচ করলে আপনি খুশী হবেন সে পথেই খরচ করেছি (আপনার উদ্দেশ্যে)। আল্লাহ বলবেন মিথ্যা বলেছ বরং তুমি ওসব করেছ এ জন্য যে তোমাকে দানশীল বলা হবে, আর বাস্তবেও তা বলা হয়েছে। অত:পর তার ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হবে ফলে তাকেও মুখের ভরে হিচঁড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

–ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন হাদীছ নং ১৫১৪।

পাঠকবৃন্দ আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হওয়া, ইলম শিক্ষা করে শিক্ষা দান করা, কুরআন পাঠ করা ও সৎপথে অজস্র সম্পদ ব্যয় করার মত মূল্যবান ইবাদত ও আমলের কোন মূল্যায়ন না করে আল্লাহ এমন আমলকারীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ এই জন্যই দিবেন যে, তাদের আমল তাওহীদ শূণ্য, আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি, তুচ্ছ স্বার্থ কামনা করা হয়েছে, সুনাম, সুখ্যাতি ও সুশ্রুতি অর্জনের আশা পোষণ করা হয়েছে- যা তাওহীদের পরিপন্থী।

এবার এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমল ও ইবাদত এর বাহ্যিকতা আসল উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য তার মাধ্যমে আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ যদি শরীয়ত প্রবর্তক কর্তৃক নির্ধারিত আমল-ইবাদতের মাধ্যম ছাড়া নিজের মনগড়া পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে তাও জায়েয হবে? এমনিভাবে সারাটি জীবন যদি আলাহ এক–আলাহ এক (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর যিকির করে তবুও

সেটাকে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা বা প্রতিষ্ঠা করা বলে গণ্য করা হবে না। শুধু মাত্র আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত আমল ও ইবাদতের মাধ্যমেই আল্লাহর তাওহীদ প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩। আল্লাহ তাআলা এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার উপর আদম সন্তানের সকলের নিকট আলামে রুহানীতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন।

আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِيٓ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِين. أَوْ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُون.

স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানের নিকট থেকে এবং তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে নিজেদের উপর স্বাক্ষী নির্ধারণ করে বলেছিলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা সকলে বলেছিল হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি আমাদের প্রতিপালক। এই অঙ্গীকার এই জন্য নেয়া হয়েছে যাতে একথা বলার অবকাশ না থাকে যে, আমরা এ বিষয়ে (অর্থাৎ এক আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে তা) থেকে গাফিল ছিলাম কিংবা একথা বলারও অবকাশ না থাকে যে, ইতিপূর্বে আমাদের বাপদাদাগণ আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলেন আর আমরা তাদের অনুগামী বংশধর ছিলাম, আমাদেরকে কি ধ্বংস করবেন সেই বাত্বিল পন্থীদের কৃতকর্মের ফলে?

– সূরা আ'রাফ ১৭২,১৭৩।

عن أبي بن كعب في قول الله عزوجل (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم) قال : جمعهم فجعلهم أزواجا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا: بلى) قال: فإنى أشهدعليكم السماوات السبع والارضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ان تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، إعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله غيرك فأقروا بذلك .... رواه أحمد قال الالبانى رحمه الله : كلا بل رواه ابنه عبد الله فى زوائد المسند (135/5) وسنده حسن موقوف ولكنه فى حكم المرفوع لأنه لايقال من قبل الرأى مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني 44/1 رقم 122

উবাই বিন কা'ব অত্র আয়াত সম্পর্কে বলেন:

وإذ إخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم আদম সন্তানদেরকে আলাহ রূহানী জগতে আকৃতিতে এনে জোড়া জোড়া অবস্থায় একত্রিত করে তাদের ভিতর কথা বলার ক্ষমতা সৃষ্টি করেছিলেন ফলে তারা কথাও বলেছিল। অত:পর তাদের থেকে চুক্তি ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদেরকে নিজেদের উপর স্বাক্ষী বানিয়েছিলেন। এই বলে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা সকলে বলেছিল নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ বলেছিলেন আমি তোমাদের উপর সাত আসমান, সাত যমীন ও তোমাদের পিতা আদমকে তোমাদের (এই অঙ্গীকারের) উপর স্বাক্ষী রেখেদিলাম যাতে কিয়ামতের দিন এটা না বল যে, এ সম্পর্কে আমরা জানি না। জেনে রেখ আমি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য ও প্রতিপালক নেই, অতএব আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থাপন করবে না। আর অবশ্যই আমি অচিরেই তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণ (দূত)কে পাঠাব– যারা তোমাদেরকে আমার সঙ্গে কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে স্মরণ করাবেন। আর তোমাদের উপর (জীবন ব্যবস্থা ও পথ নির্দেশিকা হিসাবে) আমার পক্ষ থেকে কিতাব অবতীর্ণ করবো। তারা বলেছিল আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আমাদের কোন উপাস্য ও প্রতিপালক নেই, এভাবে সকলে উক্ত অঙ্গীকার স্বীকার করেছিল।

– হাদীছটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

বর্তমান যুগের বিশ্বের একক মুহাদ্দিছ আলবানী (র.) বলেন, ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেননি বরং তাঁর কৃতিসন্তান আব্দুলাহ স্বীয় গ্রন্থ যাওয়ায়েদুল মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটির সনদ হাসান মাওকুফ কিন্তু তা মারফূ হাদীছেরই পর্যায়ভূক্ত। কেননা এমন ধরণের কথা অনুমান করে বলা যায় না। মিশকাত ১/৪৪ হাদীছ নং ১২২। [২]

৪। এই অঙ্গীকারকে কেন্দ্র করে বলা হয় যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে তাওহীদপন্থী।

---

[২]মাওকুফ হাদীস তাকে বলে যে হাদীসে রাসূল (সা.) এর উল্লেখ না করে সাহাবী নিজেই বর্ণনা করেন। যদি এমন বিষয় হয় যে তা ওহী ব্যতীত বলা সম্ভব নয় তাহলে সেই মাওকুফ মারফু'র পর্যায়ভুক্তই ধরা হয়।

মারফু হাদীছ তাকে বলে যে হাদীছ রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণনা করা হয়। সুয়ূত্বী প্রণীত তাদ্‌রীবুর রাবী ও অন্যান্য উছূলে হাদীছ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কুরআন ও হাদীছের ভাষায় এ স্বভাবকে فطرت বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ

একনিষ্ঠভাবে আপনি নিজের চেহারাকে অর্থাৎ নিজেকে দ্বীনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করুন। এটাই হলো সেই ফিত্বরাত যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর সৃষ্টি অপরিবর্তনীয়। – সূরা রূম ৩০।

রাসূলুলাহ (সা.) (হাদীছে কুদসীতে) বলেন:

إني خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين - رواه مسلم

নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ করেই সৃষ্টি করেছি অত:পর শয়তান তাদেরকে বিচ্যুত করে ফেলেছে। – মুসলিম।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه – متفق عليه

প্রত্যেকটি শিশু জন্মলাভ করে ফিত্বরাত এর উপর, কিন্তু তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদী বানায়, কিংবা খ্রীষ্টান বানায় কিংবা অগ্নিপুজক বানায়।

–বুখারী ও মুসলিম।

স্বভাবগত ঈমান বা তাওহীদের পরিচয় ও শিরকের উদ্ভব:

فطرت এর সংজ্ঞা

الجبلة المتهيئة لقبول الدين হক্ব দ্বীন গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত এমন স্বভাবকে فطرت বলা হয়। – কিতাবুত তা’রীফাতাল লিল জুরজানী পৃঃ ২১৫।

আদম (আ.) থেকে শুরু করে বহু শতাব্দীকাল পর্যন্ত মানুষ এই খাটি দ্বীন ও তাওহীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সর্বপ্রথম এই খাঁটি স্বভাব তাওহীদ কলুষিত হয়েছিল এবং শিরকের উদ্ভব হয়েছিল নূহ (আ.) এর নবীর কওমের ভিতর।

আল্লাহ বলেন:

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

মানুষ একই উম্মত (তাওহীদবাদী) ছিল (বহুদিন পরে তাদের ভিতর মতভেদ সৃষ্টি হয়) অত:পর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেন। –সূরা বাকারাহ ২১৩।

قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الاسلام - تفسير ابن كثير وكتاب التوحيد للفوزان

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আদম ও নুহ (আ.)এর মাঝে এক হাজার কালের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে সকলেই খাঁটি ইসলাম এর উপর ছিল।
– ইবনু কাছীর (১/২৩৭) ও শাইখ ফাওযান প্রণীত আত-তাওহীদ গ্রন্থ পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য।

এই দীর্ঘকাল পরে শয়তানের চক্রান্তে নূহ নবীর সম্প্রদায়ের কতিপয় সৎ ব্যক্তির অতিভক্তির কারণে শিরকের উদ্ভব হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُواْ لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً

আর তারা বলেছিল তোমরা খবরদার ছাড়বে না তোমাদের ইলাহসমূহকে (উপাস্যগুলিকে), ছাড়বে না অদকে, সুওয়া'কে ইয়াগুছকে ইয়াউককে ও নাসরকে। – সূরা নূহ ২৩।

অত্র আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী ও ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : صارت الأوثان التي كانت فى قوم نوح في العرب بعد: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل واما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبا وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموه بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت - صحيح البخاري وابن كثير

ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নূহ নবীর কওমে যে সমস্ত মুর্তির পুজা করা হয়েছিল পরবর্তীকালে ওগুলির পুজা আরবেও করা হয়েছিল। অদ: দাওমাতুল জান্দালের অধিবাসী কালব গোত্রের মুর্তি ছিল। সুওয়া: হুযাইল গোত্রের। ইয়াগুছ: মুরাদ গোত্রের অত:পর সাবার নিকটস্থ জুরফের অধিবাসী গুত্বাইফ গোত্রের। ইয়াউক্ব: হামদান গোত্রের। নাসর: হিমইয়ার গোত্রের যী কালা বংশের। প্রকৃতপক্ষে এগুলো নূহ নবীর কওমের কতিপয় সৎব্যক্তির নাম। যখন তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন (তখন তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা দু:খিত ও ব্যথিত হয়েছিল)। এমতাবস্থা দেখে

শয়তান তাদেরকে ঐ সৎ ব্যক্তিদের মুর্তি বানিয়ে তাদের বসার স্থানগুলিতে স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিল এবং মুর্তিগুলিকে ঐ সৎব্যক্তিদের নামে নামকরণ করতে বলেছিল। শয়তানের পরামর্শে তারা তাই করেছিল। (অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় শয়তান নিজেই এই মুর্তিগুলি তৈরী করে দিয়েছিল)। তৈরীর পর এসব মুর্তি পুজা করা হয়নি, তৈরী কারকদের তিরোধাণের পর দ্বীনি শিক্ষা উঠে যাওয়ার ফলে তাদের পরবর্তী বংশধররা এগুলির পুজা শুরু করে। –ছহীহ বুখারী কিতাবুত তাফসীর হাদীছ নং ৪৯২০, তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৪২৭।

এভাবেই শিরকের প্রথম উদ্ভব ও প্রচলন শুরু হয়। যুগে যুগে এই শিরকের ব্যপ্তি ঘটে। আমাদের এই যুগ পর্যন্ত ছড়িয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

৫। তাওহীদের ব্যাপারে সোচ্চার ও সতর্ক করার জন্যই অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছেঃ

মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ

আর আমি প্রত্যেক উম্মতের ভিতর রসূল প্রেরণ করেছি (এটা জানিয়ে দেয়ার জন্য যে) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা) থেকে বিরত থাক। –সূরা নাহল ৩৬।

অন্যত্র বলেছেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِيۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ

আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি তাদেরকে এই অহীই করেছিলাম যে, আমি ব্যতীত সত্যিকার অর্থে আর কোন উপাস্য নেই, অতএব আমারই ইবাদত কর। –সূরা আম্বিয়া ২৫।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে কিছু কিছু নবীর নাম উল্লেখ করে তাদের তাওহীদ প্রচারের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। সূরা আ'রাফে একাধারে নুহ, হুদ, ছালেহ, ও শুআইব (আলাইহিমুস সালাম) এর দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন যে, সকলেই তারা নিজেরদের কওমকে বলেছিলেন:

يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ

হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। –সূরা আ'রাফ ৫৯,৬৬,৭৩,৮৫।

৬। তাওহীদই হলো ইহকাল ও পরকালের সার্বিক মুক্তির চাবিকাঠি

তাইতো রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার কাফির মুশরিকদের দৃঢ় আশ্বাস দান করেছিলেন এই বলে:

يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا - اخرجه أحمد و ابن حبان و هو صحيح على شرط الشيخين' رواتهم كلهم ثقات اثبات

হে জনমণ্ডলী! তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, ঘোষণা দাও সার্বিক মুক্তি লাভ করবে। – হাদীছটি ইমাম আহমাদ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর শর্তানুযায়ী ছহীহ, কারণ তার রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য মজবুত।

৭। এই তাওহীদের মাধ্যমেই শক্তি, বিজয়, নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতা লাভ করা সহজসাধ্য।

রাসূলুলাহ (সা.) মক্কার কুরাইশদেরকে এই ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন:

قولوا كلمة يدين لكم العجم وتسودوا بها العرب- سيرة بن هشام ص 88- باختلاف اللفظ

তোমরা একটি কথা বল। (এবং সে কথার চাহিদা ও দাবী পুরণ কর) অনারবরা তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং আরবদের উপর নেতৃত্ব দান করবে। আরবী বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

– মুসনাদে আহমাদ দ্বিতীয় খণ্ড হাদীছ নং ২০০৮, সীরাহ্ ইবনু হিশাম, ৮৮ পৃঃ।

এ কথারই সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে খন্দক খননের সময় মুজেযার মাধ্যমে।

روى الإمام أحمد والشيخان والنسائي والطبرانى وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والإمام أحمد بسند جيد عن البراء بن عازب' وابن سعد وابن جرير وابن ابي حاتم عن عمرو بن عوف وأبو نعيم عن أنس والحارث والطبراني عن ابن عمر والطبراني بسند جيد عن ابن عباس، والبيهقي وابو نعيم من طريقين عن ابن شهاب ومحمد بن عمر عن شيوخه' وابن اسحاق عن شيوخه :

أن المسلمين عرض لهم في بعض الخندق صخرة وفي لفظ كدية عظيمة شديدة بيضاء مدورة لا تأخذ فيها المعاول فكسرت حديدهم وشقت عليهم وفي حديث عمرو بن عوف أنه عرضت لسلمان وذكر محمد بن عمر أنها تعرضت لعمر بن الخطاب فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة تركية فقال: أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر من الجوع ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به ثم نضح من ذلك الماء عليها فيقول من حضرها : والذي بعثه بالحق إنها عادت كالكثيب المهيل ما ترد فأسا ولا مشحاة فأخذ المعول من سلمان وقال: {بسم الله} وضرب ضربة فكسر ثلثها، وبرقت برقة فخرج نور من قبل اليمن فأضاء ما بين لابتي المدينة حتي كأن مصباحا في جوف ليل مظلم، فكبر رسول الله وقال : {أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة، كأنها أنياب الكلاب}، ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا أخر وبرق منها برقة فخرج نور من قبل الروم فأضاء ما بين لابتي المدينة فكبر رسول الله وقال: {أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني الساعة}، ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر وبرق برقة من جهة فارس أضاءت ما بين لابتي المدينة فكبر رسول الله وقال: {أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب من مكاني هذا، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا بالنصر فاستسر المسلمون وقالوا الحمد لله موعد صادق، بأن وعدنا النصر بعد الحصر، وجعل يصف لسلمان فقال سلمان: صدقت يا رسول الله هذه صفته أشهد أنك رسول الله ثم قال رسول الله هذه فتوح يفتحها الله تعالي بعدي يا سلمان لتفتحن الشام ويهرب هرقل إلى أقصى مملكته وتظهرون على الشام فلا ينازعكم أحد ولتفتحن هذا المشرق ويقتل كسرى فلا يكون كسرى بعده

قال سلمان : فكل هذا قد رأيت

قال أبو هريرة - فيما رواه ابن اسحاق - حين فتحت هذه الأمصار زمان عمر وزمان عثمان ومن بعده : افتحوا ما بدالكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما فتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلي يوم القيامة إلا وقد أعطى الله تعالى محمدا مفاتيحها قبل ذلك - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للامام محمد بن يوسف الصالحي الشامي 4/367-368)

খন্দক খননের সময় মুসলমানগণ একটি শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়, যা সাদা রঙ্গের গোলাকৃতির ছিল। তাদের কর্তনযন্ত্র ভেঙ্গে অকৃতকার্য হয়ে গিয়েছিল। আমেরের হাদীছে উল্লেখ হয়েছে সেটি সালমান (রা.)এর সম্মুখে

পড়েছিল। মুহাম্মাদ বিন উমার (রা.) উল্লেখ করেন যে, সেটি উমার বিন খাত্তাবের সম্মুখে পড়েছিল।

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)এর নিকট সমস্যার কথা জানালেন। তিনি তখন তুর্কী তাবুর ভিতরে ছিলেন, তিনি বললেন, আমি খন্দকে অবতরণ করবো। এই বলে দাড়ালেন, ক্ষুধার তাড়নায় তার পেট মুবারকে পাথর বাধা ছিল। তার কারণ তিনদিন যাবত মুসলমানগণ কিছু খায়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) পানি নিয়ে ডাকলেন, পানি আনা হলে তাতে থু থু ফেলে আল্লাহর মর্জি অনুসারে কিছু দু'আ পড়লেন। সেই পানি দিয়ে ঐ পাথরে ছিটা মারা হলো। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ঐ যাতের শপথ যিনি তাকে হক্ব সহকারে প্রেরণ করেছেন– সেই শক্ত পাথর নরম বালুকা স্তুপের মত হয়ে গেল। ফলে কর্তন যন্ত্র আর অগ্রাহ্য করল না। রাসলুল্লাহ (সা.) সালমান ফারসী (রা.) এর নিকট থেকে কোদাল নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে আঘাত হানলে প্রথম আঘাতে এক তৃতীয়াংশ কেটে যায় এবং বিদ্যুতের মত চমকে উঠে–যাতে ইয়ামানের দিক থেকে আলোকরশ্মি বেরিয়ে সমগ্র মদীনা আলোকিত করে ফেলে। যেন আমাবস্যার গভীর অন্ধকারে প্রজ্জলিত বাতি। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহু আকবার ধ্বণি উচ্চারণ করে বললেন আমাকে ইয়ামানের চাবিকাঠি দান করা হলো। আমি এই মুহুর্তে এখান থেকে সানআ (ইয়ামানের রাজধানী)র প্রবেশ দরজাগুলি দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় আঘাত হানলে দুই তৃতীয়াংশ কেটে যায় এবং অনুরূপ বিদ্যুতের মত চমকে উঠে যাতে– রোম থেকে একটি আলোকরশ্মি বেরিয়ে সমগ্র মদীনা আলোকিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহু আকবার ধ্বণি উচ্চারণ করে বললেন আমাকে শামের (সিরিয়ার) চাবিকাঠি দান করা হলো। আল্লাহর শপথ আমি এখান থেকে এই মুহুর্তে শামের লাল লাল অট্টালিকাগুলো দেখতে পাচ্ছি। অত:পর তৃতীয় আঘাত হানলে অবশিষ্ট অংশও কেটে যায় এবং তা থেকে বিদ্যুত চমকে উঠে একটি আলোকরশ্মি পারস্য পর্যন্ত বিকশিত হয়ে সমগ্র মদীনা আলোকিত করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকবীর ধ্বণি দিয়ে বললেন আমাকে পারস্যের চাবিকাঠিও দেয়া হলো। আল্লাহর শপথ আমি এখান থেকে হীরার অট্টালিকাসমূহ ও কিসরার (পারস্যের) মাদায়েন শহর দেখতে পাচ্ছি, যেন তা কুকুরের দাঁতের ন্যায় বিকশিত। জিবরীল (আ.) আমাকে এই বলে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন যে, আমার উম্মত এই স্থান ও রাজ্যসমূহের

উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। অতএব তোমরা বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ কর। মুসলমানগণ সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হলেন এবং সকলে আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, এটা সত্য প্রতিশ্রুতি যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে অবরুদ্ধ থাকার পর বিজয়বার্তা শুনিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সালমান ফারসী(রা.) কে বিজয় বিবরণী শুনালেন। সালমান বললেন হে আল্লাহর রাসূল আপনি সত্যই বলেছেন। এইরূপই তাঁর বিবরণী, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ আমার উম্মতকে এ সমস্ত রাজ্যের বিজয় দান করবেন আমার তিরোধানের পর। শাম (সিরিয়া) বিজিত হবে; হেরাক্বল তার রাজ্যের শেষ প্রান্তে পলায়ন করবে আর তোমরা শামের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে, একজনও তোমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। এমনিভাবে এই পারস্যও বিজিত হবে। পারস্য নেতা (সম্রাট) নিহত হবে। তারপর আর কোন নেতা (সম্রাট) আসবে না। সালমান (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিটি ভবিষ্যতবাণীর বাস্তবতা আমি দেখেছি।

ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে উমার ও উছমানের যুগে যখন ঐ দেশগুলি বিজিত হয় তখন আবু হুরাইরা (রা.) বলেছিলেন: সেই যাতের কসম যার হাতে আমার জীবন রয়েছে তোমরা যেসব শহর বিজয় করেছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবে পূর্বেই এগুলির চাবিকাঠি মুহাম্মাদ (সা.)কে দেয়া হয়েছিল। – দেখুন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস-ছালিহী সংকলিত "সুবুলূল হুদা অর-রশাদ ফী সীরাতি খয়রিল ইবাদ" ৪/৩৬৭-৩৬৮। ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে।

৮। এ তাওহীদ হলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝের হক সমূহের সার সংক্ষেপ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معاذ هل تدري ماحق الله على عباده؟ وحق العباد على الله ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإن حق الله علي العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا - متفق عليه

রাসূলুলাহ (সা.) মুআয (রা.) কে বলেছিলেন: হে মুআয! তুমি কি জান বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক্ব ও আল্লাহর উপর বান্দাদের কি হক্ব? আমি (মুআয) বলেছিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ

(সা.) বললেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক্ব হলো এই যে, তারা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করবে না । আর বান্দাদের হক্ব হলো আল্লাহর উপর এই যে, তিনি যেন ঐ বান্দাদের শাস্তি না দেন যারা তার সাথে কোন বস্তুকে শরীক করবে না । – বোখারী ও মুসলিম ।

৯। এই তাওহীদের স্বীকারোক্তি দেয়ার পরই কোন কাফির বা মুশরিক ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় ও জানমালের নিরাপত্তা লাভ করে ।

পক্ষান্তরে তাওহীদ অস্বীকার করলে কিংবা এর পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে, কাফির কিংবা মুশরিকে পরিণত হয়, এবং তার জান-মালের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হয় । আল্লাহ বলেন:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

যদি তারা ঐ সব বিষয়ে উপর ঈমান আনে যে সব বিষয়ের উপর তোমরা ঈমান এনেছ তাহলে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে । আর যদি বিমুখ হয় তাহলে নিশ্চয়ই তারা বিরোধীতায় লিপ্ত রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনি অতি শ্রবণকারী ও অনুধাবনকারী ।

–সূরা বাকারাহ ১৩৭ ।

আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً

যে আল্লাহর (একত্ববাদের) ও তাঁর রাসূলের (রেসালাতের) উপর ঈমান না আনবে নিশ্চয় আমি সেই কাফিরদের জন্য প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে রেখেছি । –সূরা আল-ফাতহ ১৩ ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله - اخرجه مسلم في صحيحه

যে ব্যক্তি লা ই-লা-হা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই) বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্য অস্বীকার করবে তার

জানমাল (বিনষ্ট করা) হারাম হয়ে যাবে এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের হিসাব নিকাশ আলাহর উপর ন্যাস্ত। –সহীহ মুসলিম।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বললেন:

عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان
- رواه الهيثمي في مجمع الزوائد وابو يعلي في مسنده -- والطبراني في الكبير -

ইসলামের কড়া ও দ্বীনের ভিত হলো তিনটি যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত তার একটিও যে, পরিত্যাগ করবে সে কাফির, তার রক্তপাত হালাল। শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ প্রকৃত উপাস্য নেই এই সাক্ষ্য প্রদান করা। ফরয ছলাত, ও রামাযানের ছিয়াম। –হায়ছামী সংকলিত মাজমাউয যাওয়ায়েদ, মুসনাদ আবু ইয়ালা, ত্ববারণী সংকলিত মু'জামুল কাবীর, মুনযিরী সংকলিত আল-তারগীব ওয়াত তারহীব।

কোন কোন মুহাদ্দিছ (হাদীছ সমালোচক) পাঁচটির উল্লেখ না থাকার কারণে যঈফও বলেছেন। –সিলসিলায়ে যঈফা ১/১৩১-১৩২।

জ্ঞাতব্য: এ হাদীছে দীনের ভিত তিনটি বলার কারণ এই যে, ধনী-গরীব সকলের জন্য সমান ভাবে যে রুকনগুলো প্রযোজ্য সেগুলো হচ্ছে এই তিনটি। আর বাকী দু'টি (যাকাত ও হাজ্জ) শুধু ধনী শ্রেণীর উপর ফরয।

১০। তাওহীদ জানা এবং তা স্বীকার করাই হলো ইসলামের প্রথম ফরয।

আল্লাহ বলেন:

فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ

জেনে নাও যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই।
–সূরা মুহাম্মাদ ১৯।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن : إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم اطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم ----- بخاري ومسلم

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুআয (রা.)কে ইয়ামান পাঠানোর সময় বলেছিলেন- তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ (সর্বপ্রথম) তাদেরকে আল্লাহর

তাওহীদ বা একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদানের ও আমার রেসালাতের স্বীকৃতির দিকে আহবান করবে যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে.....অন্যান্য ফরযের কথা বলবে। –বুখারী ও মুসলিম।

১১। তাওহীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্যই মুসলমানদের তরবারী প্রসারিত হয়েছিল

عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله - متفق عليه

ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মানুষের সঙ্গে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য যে পর্যন্ত সাক্ষ্য না দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, ও মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, এবং ছলাত প্রতিষ্ঠা না করে, যাকাত আদায় না করে। তারা যখন এই কাজগুলি করবে তখন আমার থেকে তারা তাদের জান মালের নিরাপত্তা লাভ করবে, কিন্তু ইসলামের হক্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নয়, আর তাদের অন্তরের হিসাব নিকাশ আল্লাহর উপর ন্যাস্ত।

–বুখারী ও মুসলিম।

খয়বরের যুদ্ধে আলীকে সেনাপতি নিযুক্ত করে এই অছিয়তটিই করেছিলেন:

قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إلا إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله - رواه مسلم

তাদের সঙ্গে সেই পর্যন্ত যুদ্ধ কর যেই পর্যন্ত তারা এই সাক্ষ্য না দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আলাহর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ। যখন তারা এই সাক্ষ্য প্রদান করবে তখন তারা তোমার থেকে তাদের জান মালের নিরাপত্তা লাভ করবে, কিন্তু তার (সাক্ষ্যর) দাবী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্ষমা নেই। আর তাদের অন্তরের গোপণ খবরের হিসাব নিকাশের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত। –সহীহ মুসলিম।

১২। তাওহীদের মাধ্যমেই নির্ণিত হয় যে কোন ব্যক্তির চরম সফলতা ও চরম ব্যর্থতা বা বিফলতা

অর্থাৎ যে বক্তি এই তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মৃত্যু বরণ করবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাওহীদের পরিপন্থী কাজ অর্থাৎ শিরক করে মৃত্যু বরণ করবে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করে অনন্তকাল তাতে শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার বাসস্থান হলো অগ্নিকুণ্ড (হাজান্নাম) আর এ সকল যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী (বা সুপারিশকারী) থাকবে না। –সূরা মায়েদা -৭২।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার মত পাপ ক্ষমা করবে না কিন্তু এর চেয়ে নিম্ন (ছোট) ধরণের পাপ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। –সূরা নিসা –
৪৮।

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثنتان موجبتان قال رجل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة - رواه مسلم

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন দু'টি বিষয় অনিবার্যকারী: এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! অনিবার্যকারী বিষয় দু'টি কি? তিনি (সা.) বললেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরিক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক না করে মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। – মুসলিম।

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة - رواه مسلم

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো এমতাবস্থায় যে, সে জানতো আল্লাহ ব্যতীত কেউ প্রকৃত উপাস্য নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
– মুসলিম।

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار - رواه البخاري

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন বস্তুকে তার সমকক্ষ মনে করতো সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। –
বুখারী।

১৩। একমাত্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার ইবাদাত ও আমালের প্রচলন ও প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে।

যে সব ইবাদাত ও আমাল এই তাওহীদশুণ্য হবে সেসব ইবাদাত ও আমল শিরকের মত মহাপাপে রুপান্তারিত হবে। এর দলীলসহ আলোচনা ২নং উপ শিরোনামে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা : ১৮।

১৪। তাওহীদ এমন মুল্যবান বিষয় যে, জমীনের উপরস্থ বিশাল ফাকা স্থান যদি কোন বান্দার পাপে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এর ভিতর যদি শিরকের গুনাহ না থাকে তবে আলাহ এ পরিমাণ ক্ষমা দান করবেন

عن ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم لو عملت (وفي رواية : من لقيني بـ) قراب الارض خطايا ولم تشرك (لا يشرك) بي شيئا جعلت لك قراب الارض (لقيته بمثلها) مغفرة- رواه احمد 21208، و مسلم 2687، وابن ماجة 3821.

আবু যার গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন: হে আদম সন্তান যদি তুমি যমীনের উপরস্ত সমস্ত ফাকা স্থান পাপ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও অথচ আমার সাথে কিছুকে শিরক করনি তবে আমি তোমাকে জমীনের ফাকা স্থান পরিমাণ ক্ষমা দান করবো।

Ñnv`xQwU Bgvg Avngv` (nv`xQ bs 21208), gymwjg (2687) I Beby gvRvn (3821) eY©bv K‡i‡Qb|

فضائل الكلمة — لا إله إلا الله

লা ইলাহা ইলালাহ এর ফযীলত ও উপকারীতা

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله : لقد ظننت يا أباهريرة ! أن لا يسألني عن هذا الحديث

أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه - رواه البخاري

১। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভে কে বেশী ধন্য হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন আবু হুরাইরা তোমার হাদীছ জানার আগ্রহ দেখে আমার ধারণা ছিল যে, তোমার পূর্বে আমাকে এই হাদীছ সম্পর্কে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত লাভে ঐ ব্যক্তি অধিক ভাগ্যবান হবে যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই) বলবে অন্তরের নিষ্ঠার সাথে।

– বোখারী।

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الجنة على ما كان من عمل - زاد جنادة - من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء -

২। উবাদাহ বিন সামেত (রা.) রাসূলুল্লাহ (ছঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা (আ.) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং মারয়ামের নিকট প্রেরিত বাণী, তাঁর কর্তৃক প্রদত্ত রূহ, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক, এই ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার যতটুকুই আমল থাক না কেন। জুনাদাহ (রা.) এর রেওয়ায়েতে এটুকু বৃদ্ধি এসেছে যে, জান্নাতের আটটি দরজার যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করাবেন।

–বুখারী ও মুসলিম, তবে ভাষা-ভঙ্গি বোখারীর।

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله حرم الله عليه النار - رواه مسلم والترمذي

৩। উবাদাহ বিন সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রসূল। তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। – মুসলিম ও তিরমিযী।

وعن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك الجنة - رواه أحمد ومسلم' الترغيب والترهيب

৪। রিফাআহ্ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি আল্লাহর নিকট (অর্থাৎ তাঁকে হাজির নাজির জেনে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন বান্দা "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল" অন্তর থেকে সত্যিকার অর্থে এই সাক্ষ্য দিয়ে সঠিকভাবে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–মুসনাদ আহমাদ, মুসলিম, তারগীব ও তারহীব।

قال النبي صلى الله عليه وسلم : خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - أخرجه الترمذي وحسنه الألبانى

৫। নবী করীম (সা.) বলেছেন: উত্তম দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ এবং আমি ও আমার পূর্বের নবীগণ যত কথা বলেছি সবচেয়ে উত্তম কথা হলো: "লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহুলাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুলি-শাইয়িনক্বদীর" অর্থাৎ আলাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই অধিকারে সমস্ত রাজ্য, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। – তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী (র.) হাসান বলেছেন।

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله - رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد

৬। জাবির (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন উত্তম যিকর হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং উত্তম দু'আ হলো আল-হামদুলিলাহ। – ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম। এবং তিনি এর সনদকে ছহীহ বলেছেন।

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامنكم من أحد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء - رواه ابو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني

৭। উমার বিন খাত্তাব (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: যে কোন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে ওযু করে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খোলা হবে, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। ÑAvey `vD` I Avngv` Ges Avjevbx (i.) nv`xQwU mnxn e‡j‡Qb|

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب كتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتي يمسى ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك - صحيح البخاري

৮। আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি দিনে একশত বার " লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুলি-শাইয়িন ক্বদীর– অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব তারই অধিকারভূক্ত, তারই জন্য সকল প্রশংসা তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতা বান" বলবে। তার জন্য দশটি কৃতদাস স্বাধীন করার সমপরিমাণ ছাওয়াব লিখা হয়। এছাড়াও তার আমল নামায় একশত নেকী লেখা হয় ও একশত গুনাহ মোচন করা হয়। আর এই শব্দগুলি সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঠকারীকে শয়তান থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ষা করবে। কোন ব্যক্তিই এই ব্যক্তির চেয়ে অধিক আমল করতে পারবে না একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে ব্যক্তি এর চেয়েও বেশী পরিমাণ আমল করবে।
– বোখারী ও মুসলিম

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف الف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة –

رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الالباني في صحيح الترمذي

৯। উবনু উমার (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে বলবে– লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ূহঈ ওয়া ইয়ূমীতু ওয়াহুয়া হাইয়ূন লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লিশাইয়িন ক্বদীর– অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, সমগ্র রাজ্য তারই অধিনস্ত, সমস্ত প্রশংসা তারই জন্য, তিনি জীবন দান করেন তিনি মারেন, তিনি চিরঞ্জীব কখনো মরবেন না, তারই হাতে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি, আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আলাহ তার আমলনামায় দশ লক্ষ নেকী লিখেন এবং দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করেন এবং দশ লক্ষ তার স্তর বৃদ্ধি করেন। –হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাকিম, এবং আলবানী (র.) হাসান বলে আখ্যা দিয়েছেন।

عن عبد الله بن زيد الاسلمى عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد' فقال : والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى - رواه ابو داود والترمذي واللفظ له - وابن ماجه وأحمد وصححه الالباني -

১০। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আল–আসলামী তাঁর পিতা (যায়েদ আসলামী) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী (সা.) এক ব্যক্তিকে দু'আর মধ্যে বলতে শুনলেন, সে বলছিল "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদুললাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি এই অসীলায় তোমার নিকট চাচ্ছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তুমি এক, পরমুখাপেক্ষীহীন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তার সমকক্ষ কেউ নয় (এই তাওহীদি দুআ শুনে) নবী (সা.) বলেছিলেন, সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন এই ব্যক্তি আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আযম) এর অসীলায় চেয়েছে, যে নামের অসীলায় দু'আ করলে কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা প্রদান করেন।

–হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমাদ। আলবানী (র.) সহীহ বলেছেন।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به قال يا موسى قل: لا إله إلا الله' قال يا رب كل عبادك يقول هذا قال: قل: لا إله إلا الله' قال: إنما أريد شيئا تخصني به' قال: يا موسى' لو أن السموات السبع (عامرهن غيري) والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله –
روه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيحه والبغوي في شرح السنة

১১। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন যে, মুসা (আ.) বলেছিলেন হে রব্ব আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যার মাধ্যমে আমি আপনার যিকর করব ও আপনাকে আহবান করব। আল্লাহ বললেন, হে মুসা তুমি বল - "লা ইলাহা ইলাল্লাহু" তিনি বললেন হে আমার রব, এটা তো আপনার প্রতিটি বান্দাই বলে থাকে। আল্লাহ আবারও বললেন তুমি লা ইলাহা ইলাল্লাহ বলো, তিনি বললেন আমি চাই আমাকে বিশেষভাবে কিছু শিক্ষা দান করুন। আল্লাহ বললেন: হে মুসা যদি সপ্তাকাশ ও তাতে অবস্থিত সব কিছু ও সাত যমীন এক পালায় রাখা হয় এবং লা ইলাহ ইলাল্লাহু-কে এক পাল্লায় রাখা হয় তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লায়ই অধিক ভারী হয়ে যাবে। –হাদীছটি হাকিম বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী সমর্থন করেছেন ইবনু হিব্বান তার ছহীহ গ্রন্থে ও বাগাভী তার শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي علي رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب' فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا' يارب' فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول: أحضر وزنك' فيقول: يا رب' ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم' قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع إسم الله شيئ –

رواه أحمد (212) والترمذي (213) والحاكم (214) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبى والألباني (215)

১২। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সমস্ত মাখলুকাতের সম্মুখে আমার উম্মতের একজনকে নির্বাচন করবেন অত:পর

তার সম্মুখে নিরানব্বই খানা (গুনাহে পূর্ণ) বহি হবে, প্রতিটি বহি দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত। অত:পর আল্লাহ বলবেন: কি এগুলির কিছু অস্বীকার করতে পারবে? আমার সংরক্ষণকারী লেখকরা কি তোমার উপর অত্যাচার করেছে? সে বলবেঃ না। তিনি বলবেন তোমার কি কোন ওযর আপত্তি আছে? সে বলবেঃ নাই। আল্লাহ বলবেন হ্যাঁ, আমার নিকট তোমার একটি সৎ আমল আছে তোমার উপর আজ কোন অন্যায় করা হবে না। এই বলে একখানা পত্র (কার্ড) বের করা হবে যাতে "আশহাদু আলা- ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্" লিখিত থাকবে। আল্লাহ ওটাকে ওজন করার নির্দেশ দেয়ে তাকে বলবেন তোমার আমলের ওজনের সময় উপস্থিত হও, সে বলবে ওহে আমার প্রতিপালক, এই পত্রের আমল কি এ সমস্ত বহির সাথে টিকবে? আল্লাহ বলবেন তোমার উপর অত্যাচার করা হবে না। অত:পর বহিগুলিকে এক পাল্লায় ও পত্র (কার্ড) খানা এক পাল্লায় রাখা হবে, বহিগুলি হালকা হবে এব পত্রখানাই ভারী হবে। কারণ আল্লাহর নামের মুকাবেলায় কোন কিছুই ভারী হতে পারে না।

– হাদীছটি ইমাম আহমাদ (২১২), তিরমিযী (২১৩), হাকেম (২১৪), বর্ণনা করেছেন– তিনি বলেছেন মুসলিমের শর্ত অনুসারে হাদীছটি সনদের দিক থেকে ছহীহ এবং যাহাবী ও আলবানী তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة - رواه البخارى ومسلم واللفظ له

১৩। আবু যার (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে এর উপর মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। –বুখারী ও মুসলিম।

وفي رواية معاذ رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم :من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة - رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الالباني في صحيح ابي داود

১৪। অন্য সূত্রে মুআয (রা.) থেকে মারফূভাবে বর্ণিত, যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। –হাদীছটি আবু দাউদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী একাত্বতা ঘোষণা করেছেন, আলবানী (র.) ও সহীহ বলেছেন।

آثار تطبيق الكلمة

কালিমার প্রভাব ও পরিবেশ

কালিমার স্বীকৃতি ও ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে যদি শর্তসমূহ পূরণ করা হয় তবে ব্যক্তি ও সমাজে এর নিম্নোক্ত প্রভাব ও পরিবেশ অবশ্যই দেখা যাবে।

১। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। ফলে তারা সমস্ত অনৈসলামী শক্তির উপর বিজয় লাভ করে পূর্বের ন্যায় বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

২। মুসলিম সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩। পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মুসলিমদের হাতে এসে যাবে এবং সমস্ত বাত্বিল চিন্তাধারা ও মতবাদের বিপরীতে ইসলামের স্বচ্ছতাও প্রমাণিত হবে।

৪। মন মস্তিস্কের বিক্ষিপ্ততা থেকে মানুষ রেহাই পেয়ে যাবে। কারণ বহু প্রভুর অনুসরণ ও আনুগত্য ছেড়ে এক প্রভূর অনুসরণ করবে।

৫। লা ইলা-হা ইলাল্লাহ্পন্থীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান অর্জিত হবে।

৬। মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত সম্মানের সুরক্ষা মিলবে।

Ñ W. mvwjn web dvDhvb msKwjZ gvÕbv jv Bjv-nv Bj-vj-vn (ms‡¶cvwqZ c„: 40-47)|

الملاحظة المهمة حول معنى الكلمة ومدلولها

কালিমার অর্থ, মর্ম সম্পর্কে কিছু জরুরী কথা

কালিমার ফযীলত সম্পর্কীয় কোন কোন হাদীছে এসেছে যে, যে ব্যক্তি এই কালিমা মুখে উচ্চারণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে বা তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। এই সমস্ত হাদীছের আসল ব্যাখ্যা না জানার

কারণে এই হাদীছগুলির আলোকে অনেকে বলে থাকেন যে, কালিমা পাঠকারী ব্যক্তি কোন আমল না করলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ বলেন পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। এমন কি মোটা বিবেক সম্পন্ন এক সম্প্রদায় ঐ সাধারণ হাদীছগুলির আসল মর্ম না বোঝার কারণে শুধু কালিমার শাব্দিক বিভিন্ন অবস্থা নিয়েই ব্যস্ত। ফতোয়াও ছাড়ে যে, কালিমার যিকির বেশী পরিমাণ করলে নামায রোযা ও অন্যান্য আমলের প্রয়োজন নেই। ফলে কালিমার যিকিরের অভিনব ও রকমারি পদ্ধতি ও নাম আবিস্কার করে সাধারণ মানুষকেও শিখিয়ে থাকে। শুধু যিকির করলেই যথেষ্ট এই কথা সঠিক প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা দাবী তুলে থাকে যে, যিকিরের মাধ্যমে তারা আল্লাহকে পেয়ে যায় বা দেখে। পুরা ধর্মটাকে যিকিরে সীমাবদ্ধ করার ফলে তাদের নিকট এলেম তথা ধর্মীয় জ্ঞানের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই জন্যই দেখা যায় আরবী লাইনে অশিক্ষিত মূর্খরাও এদের নেতা ও অলী হয়ে ঐ পন্থীদেরকে ধোকা দিয়ে থাকে। নিজেদের বানানো কিছু নিয়ম পদ্ধতির মাধ্যমে ভাওতায় ফেলে শয়তানী কর্মকাণ্ড বা যাদু বিদ্যার মাধ্যমে আলৌকিক কিছু করে সেগুলোকে কেরামত নামে চালিয়ে সহজ সরল অসংখ্য মানুষকে ধোকার ভিতর নিপতিত করছে।

স্বার্থপরায়ণ ওলী বেশী এই শয়তানরা শয়তানী প্রক্রিয়ায় অসংখ্য সাধারণ মানুষকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে সংখ্যাধিক্যতা দিয়েও নিজেদের সঠিক প্রমাণ করতে চায়। সাধারণ মুসলিম সমাজ হাদিয়া, তোহফা-তাহায়েফ, পশু, নগদ টাকাসহ সব ধরণের মাল-সম্পদ এনে এই লোভী ধান্দাবাজ ওলীদের নিকট উৎসর্গ করে ঈমানকে কুরবাণী দিয়ে বেঈমান ও মুশরিক হয়ে বাড়ী ফেরৎ যায় অথচ ঘুণাক্ষরেও তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। এই সব অলীদের নিকট ধর্ম বলতে কালিমার/ যিকর যা আওড়ানোর জন্য লতীফা নামক বিদআতী ইলম আবিস্কার করে সুন্নাতী যিকর মুসলিম সমাজ থেকে উৎখাত করেছে। আরো চালু করেছে নিজেদের রচিত মুরিদদের জন্য দৈনন্দিন পালনীয় বিভিন্ন অযীফার ভাণ্ডার। আবার অনেকে যিকরের সাথে ঢোল-তবলা, গান-বাজনা, নাচ, মদ-গাঁজা ও নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ যোগ করে থাকে। এই কালিমাকে নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণে অত্র গ্রন্থে এর আমল ও সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার মনস্থ করছি।

যে সমস্ত হাদীছে কালিমার ফযীলতে পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশের কথা বা জাহান্নাম হারাম হওয়াার কথা পাওয়া যায় তা ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে পাঠকারী কালিমার দাবী অনুসারে আমল করার সুযোগ পায়নি। কিংবা ঐ সময়কাল পর্যন্ত এই হুকুম বলবৎ ছিল যে সময় শুধু কালিমা ছাড়া অন্য কোন ফরয ছিল না। প্রায় ১২ বৎসর নবী (সা.) শুধু কালিমার প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অত:পর হিজরতের ১ বছর পূর্বে মেরাজের রাত্রে দ্বিতীয় ফরয নামায প্রদত্ত হন। কিংবা কালিমা পড়ার পর দুরে অবস্থান করার জন্য বাকী ফরযগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে নি। যেমন বাদশাহ নাজ্জাশী। কিংবা ঐ কালিমা থেকে উদ্দেশ্য শুধু মুখের উচ্চারণ নয় বরং অন্তরে বিশ্বাস এবং তার দাবী ও শর্তানুসারে বাস্তবে আমল করাও উদ্দেশ্য। – আহমদ, বাযযার ও মাজমাউয যাওয়ায়িদ।

হাদীছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কে জান্নাতে চাবী বলা হয়েছে এবং তার দাবী অনুসারে আমলকে তার দাঁত বলা হয়েছে।

عن وهب بن منبه قيل له : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى’ ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك - رواه البخاري معلقا

ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে বর্নিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু" কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বলেছিলেন: হ্যাঁ, তা সত্য। কিন্তু কোন চাবি এমন হয় না যার দাঁত থাকে না। অতএব তুমি যদি দাঁত বিশিষ্ট চাবি (অর্থাৎ কালিমার দাবী অনুযায়ী আমল) নিয়ে আসো তাহলে জান্নাত খোলা হবে, অন্যথায় খোলা হবে না। ÑeyLvix gyAvj-vKfv‡e eY©bv K‡i‡Qb| wgkKvZ|

قيل للحسن البصري إن ناسا يقولون : من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة فقال : من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة’ وهو قول حق لأن المنافقين يقولونها وقد أخبر الله عنهم أنهم فى الدرك الاسفل من النار - أصول المنهج الاسلامي 27

হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল লোকেরা বলছে যে, যে ব্যক্তি "লা ইলাহ ইল্লল্লাহু" বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেছিলেন যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলবে অত:পর তার হক্ব ও ফরযসমূহ আদায় করবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটাই হল সঠিক কথা, কারণ

মুনাফিকরাও এই কালিমাহ বলতো কিন্তু তবুও আল্লাহ তাদের সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, তারা জাহান্নামের নিম্নদেশে অবস্থান করবে| Ñ W. mvwjn web dvDhvb msKwjZ gvÕbv jv Bjv-nv Bj-vj-vn (c„: 39) DQyj~j gvbnvR Avj-Bmjvgx 27c„t

ইবনে তাইমিয়াহ (রহ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কালিমা পাঠ করার পর এর শিক্ষা-দীক্ষার উপর বহাল থেকে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। আরো বলেছেন: বিভিন্ন হাদীছে প্রাপ্ত শর্ত সাপেক্ষে (৮টি শর্ত রয়েছে) কালিমাহ চর্চাকরলে জান্নাতে যাবে। Ñ W. mvwjn web dvDhvb msKwjZ gvÕbv jv Bjv-nv Bj-vj-vn (c„: 33)

এ সব শর্তাবলীর বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখুন।

كلام المنذرحول معنى الكلمة

কালিমার ব্যাপারে আল্লামাহ মুনযিরীর উদ্ধৃত উক্তি

قال المملى عبد العظيم: وقد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الإطلاقات التى وردت فيمن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة' أو حرم الله عليه النار' ونحو ذلك إنما كان في ابتداء الإسلام' حين كان الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد' فلما فرضت الفرائض' وحدت الحدود' نسخ ذلك' والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة ' وقد تقدم غير ما حديث يدل على ذلك في كتاب الصلاة' والزكاة' والصيام' والحج' ويأتى أحاديث أخر متفرقة إن شاء الله تعالى. وإلى هذا القول ذهب الضحاك' والزهرى' وسفيان الثورى وغيرهم وقالت طائفة: لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك' فإن كل ما هو من أركان الدين' وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين' وتتماته' فإذا أقر ثم امتنع عن شيء من الفرائض جحدا' أو تهاونا على تفصيل الخلاف فيه حكمنا عليه بالكفر' وعدم دخول الجنة' وهذا القول أيضا قريب' وقالت طائفة : التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضى دخول الجنة والنجاة من النار' بشرط أن يأتي بالفرائض' ويجتنب الكبائر' فإن لم يأت بالفرائض' ولم يجتنب الكبائر لم يمنعه التلفظ بكلمة التوحيد من دخول النار' وهذا قريب مما قبله' أو هو هو. وقد بسطنا الكلام على هذا' والخلاف فيه في غير ما موضع من كتبنا ' والله أعلم. (الترغيب والترهيب للمنذري)

মুনাযিরী (র.) উদ্ধৃত করেছেন যে, মুমলী আব্দুল আযীম (র.) বলেছেন: নির্ভরযোগ্য বিদ্যানগণের একদল এই মতাবলম্বী হয়েছেন যে, যে সমস্ত হাদীছে সাধারণ ভঙ্গিতে উল্লেখ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে বা তার জন্য জাহান্নাম হারাম অথবা এসব পর্যায়ের কোন ভঙ্গি। এগুলো ইসলামের প্রথম যুগের জন্য প্রযোজ্য যখন শুধু তাওহীদের দিকে আহবান করা অর্থাৎ তার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আহবান করা হতো। (আর তা ছিল ১২ বৎসর যাবত)। যখন فرائض ফরয ইবাদতসমূহ ফরয করা হয় ও (হারাম হালালের) বিভিন্ন সীমারেখা নির্ধারণ করা হয় তখন তা (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া অনিবার্য) রহিত হয়ে গেছে। এ কথার সমর্থনে ভুরি ভুরি পরস্পর সহযোগী দলীল প্রমাণ রয়েছে যা ছলাত, যাকাত, ছিয়াম ও হাজ্জ শীর্ষক আলোচনায় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এবং সম্মুখেও বিভিন্ন জায়গায় এই সম্পর্কে হাদীছ আসবে ইনশাআল্লাহ। এই কথার সমর্থন দিয়েছেন যাহহাক, যুহরী ও সুফিয়ান ছাওরী (রা.) প্রমুখ বিদ্যানগণ। বিদ্যানগণের আর এক সম্প্রদায় বলেন মানসূখ (রহিত) বলার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ দ্বীনের প্রতিটি রুকন ও ইসলামের প্রতিটি ফরয শাহাদাতাইন আলাহ একমাত্র উপাস্য হওয়া ও মুহাম্মাদ (সা.) একমাত্র অনুসরণীয় পুরুষ বা রাসূল ও তার বান্দা হওয়ার সাক্ষ্য) এর স্বীকৃতির সাথে ওতপ্রোৎভাবে সংশ্লিষ্ট ও পরিপূরক বিষয়। সুতরাং যদি কেউ শাহাদাতাইন এর স্বীকৃতি প্রদান করতঃ ইসলামের কোন ফরয অস্বীকার বা অবহেলা বশত: ত্যাগ করে তাহলে আমরা মতান্তরে তার উপর কাফির হওয়ার বিধান সাব্যস্ত করবো ও জান্নাতে প্রবেশের অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে বলবো। একথাও সঠিক। বিদ্যানগণের আর এক সম্প্রদায় বলেছেন: তাওহীদের কালিমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) উচ্চারণ বা মৌখিক স্বীকৃতি জান্নাতের প্রবেশের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার (প্রথম)কারণ বা অসীলা এই শর্তে যে, ফরয ইবাদত করতে হবে এবং কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি ফরয ইবাদত গুলি পালন না করে কিংবা কবীরা গুনাহ থেকে বিরত না থাকে তাহলে তাওহীদী কালিমায় শুধু মৌখিক স্বীকৃতি বা উচ্চারণ জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাধা দিতে পারবে না। আমাদের অন্যান্য কিতাবে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ভাবে মতভেদ সহ উল্লেখ করেছি। আল্লাহু আ'লাম।

–তারগীব ও তারহীব, মুনযিরী প্রণীত ২/১৯০-১৯১ পৃষ্ঠা।

পাঠকবৃন্দ এতক্ষণ ধরে আপনারা ইসলামের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মনীষীগণের কথা জানলেন এবার স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) কি বলেছেন তা দেখুন:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى قالوا: يا رسول الله! انا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام’ وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر’ فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة’ وسألوه عن الأشربة. فأمرهم بأربع’ ونهاهم عن أربع: أمرهم بالايمان بالله وحده’ قال: أتدرون ماالإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال: شهادة أن لا إلا الله وأن محمدا رسول الله ’ وإقام الصلاة’ وإيتاء الزكاة’ وصيام رمضان’ وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع:عن الحنتم’والدباء’ والنقير’ والمرفت قال: احفظوهن وأخبروابهن من وراءكم .متفق عليه.ولفظه للبخاري.

ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন অফদে আব্দুল কায়েস (কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল) নবী (সা.) এর নিকট এসেছিল রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: তোমরা কোন সম্প্রদায় বা তোমরা কোন প্রতিনিধি? তারা বলেছিল: আমরা রাবীআহ গোত্রের প্রতিনিধি। তিনি (সা.) বললেন: স্বাগতম প্রতিনিধিমণ্ডলীকে বা সম্প্রদায়কে, কোন প্রকার ইতস্তত বা অপমানবোধ করার কারণ নেই। তারা বলেছিল, আমরা আপনার নিকট সম্মানীত মাসগুলি ছাড়া আসতে পারি না বা পারব না। কেননা আমাদের ও আপনার মাঝে মুযার গোত্রের কাফিররা অন্তরায় হয়ে রয়েছে। অতএব আমাদেরকে সমাধানমুলক কিছু নির্দেশ দিন যা আমাদের পশ্চাদস্থ লোকদেরকেও জানাবো এবং যার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তারা তাকে পানীয় বস্তু সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেছিল। রাসূল (সা.) তাদেরকে চারটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং চারটি কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করেছিলেন। চারটি কাজের নির্দেশ দেয়ার পূর্বে সেগুলোর উৎস কি প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে অবহিত করেছেন) তাদেরকে (৪টি বিষয়ের উৎস) একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং নিজেই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমরা কি জানো একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান কিভাবে আনতে হয়? তারা বলেছিল, আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, (১) আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ (সা.) আলাহ্র রাসূল (মৌখিক ও আন্তরিকভাবে) এই সাক্ষ্য প্রদান করা, (২) ছলাত প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) রামাযানের ছিয়াম পালন করা। আর গণীমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) এক পঞ্চমাংশ প্রদান করবে।

আর যে চারটি জিনিষ নিষেধ করেছিলেন তাহলো এই: সবুজ কলস, কদুর পাত্র, খেজুরের গাছের গোড়া কুঁরে যে পাত্র বানানো হয় ও আলকাতরা দিয়ে রংকৃত পাত্র। অত:পর বলেছিলেন: যা বলা হলো সংরক্ষণ কর এবং তোমাদের পিছনে (অঞ্চলে) যারা রয়েছে তাদেরকে এই বিষয়গুলি জানিয়ে দাও। – ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন কিন্তু ভাষা বোখারীর।[৩]

অত্র হাদীছে ছলাত, যাকাত, ছাওম ও গণীমতের এক পঞ্চমাংশ আদায় করাকে একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর উপাদান– যা ছাড়া কালিমার নিষ্ক্রিয় ও অকেজো হওয়া বুঝানো হয়েছে।

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, শুধুমাত্র কালিমার যিকির করে বা ঐ সাধারণ হাদীছগুলির উপর ভরসা করে কারো জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়া ও জান্নাতের (আগে কিংবা পরে) আশা করা অরণ্যে রোদন ও নিষ্ফল আকাংখা ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ কালিমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া ও জান্নাতে যাওয়া (আগে কিংবা পরে) অনিবার্য যে কালিমা

---

[৩] টীকা: এ সমস্ত পাত্র এ জন্য নিষেধ করেছিলেন যে, এগুলোতে তাড়াতাড়ি মদ তৈরী হতো যার জন্য এগুলির ব্যাপকভাবে ব্যবহার চলতো, মদ হারাম ঘোষণা দেয়ার পর তা তৈরী করার পাত্রগুলিও হারাম করে দেন যাতে সমাজ থেকে মদ একেবারে উঠে যায়। যখন মানুষেরা মদ ত্যাগ করে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন পাত্রগুলির ব্যবহারও বৈধ হয়ে যায় তবে মদ তৈরীর জন্য নয় অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য। দেখুন এ সম্পর্কে ছহীহ বুখারী কিতাবুল আশরিবাহতে (باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الاوعية والظروف بعد النهي (كتاب الأشربة)) কতিপয় পাত্র ও বাসন নিষিদ্ধ ঘোষণার পর আবার নবী (সা.) কর্তৃক তার ব্যবহার অনুমোদন শীর্ষক পরিচ্ছদ ও বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা ফতহুল বারী।

ছলাত, যাকাত, ছওম, হাজ্জ নামের উপাদানগুলির সমন্বয়ে অনুশিলিত হয়েছে ।

معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু এর ব্যাখ্যা

এটাই ইসলামী বাণী বা তাওহীদী বাণী, এই কালিমা পড়ে ও তার অর্থ ও মর্ম সম্মক ভাবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তদানুযায়ী আমল করলে মু'মিন বা মুসলিম হওয়া যায় । একেই বলা হয় ঈমান বা বিশ্বাস ।

উক্ত কালিমার অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল ।

কালিমাটির দু'টি অংশ একটি লা ইলাহা ইলাল্লাহু অপরটি মুহাম্মাদুন আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহ ।

প্রথম অংশ: لا إله إلا الله লা ইলাহা ইলাল্লাহ এর ব্যাখ্যামূলক অর্থ:

আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য আর কেউ নেই । বাহ্যিকভাবে যে সমস্ত উপাস্য দেখা যায়, যেমন হিন্দুদের প্রতিমা ও দেবতা পুজা, অগ্নিপুজকদের আগুনের পুজা, খ্রীষ্টানদের যিশুখ্রীষ্টের ও ক্রুস পুজা, জাহিলী ও ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে কা'বা গৃহের ৩৬০ মুর্তির পুজা বর্তমান যুগে মাজার, দরবার-দরগাহ, নেতা-নেত্রী ও শহীদদের ভাস্কর্য (মুর্তি) ও সৌধ পুঁজা, ও পীর ফকীর পুজা এগুলো সবই মিথ্যা উপাস্য । আল্লাহ বলেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَـٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ

তা এই জন্য যে, আল্লাহই হলেন প্রকৃত সত্য আর তারা আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করে থাকে তা বাতিল । –সূরা লুকমান ৩০ ।

লক্ষণীয় যে অত্র কালিমার দু'টি রুকন রয়েছে:

একটি হলো ইতিবাচক, অপরটি হলো নেতিবাচক ।

নেতিবাচক অংশটুকু হলোঃ

لا إله লা ইলাহা যার মর্ম হলো এই যে, কোন ইবাদতই কারো জন্য করা চলবে না, কারো সার্বভৌমত্ব ও শক্তি স্বীকার করা চলবে না, কারো বিধান ও আইন কানুন মানা চলবে না, কোন কিছুতেই কারো প্রভূত্ব স্বীকার করা চলবে না। ওসবের কোন একটিতে কারো বিন্দুমাত্র শরীক স্থাপন করা চলবে না।

ইতিবাচক:

إلا الله ইল্লাল্লাহঃ যার মর্ম হলো এই যে, শুধু আল্লাহই সকল প্রকার ইবাদতের প্রকৃত হকদার। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তারই বিধান ও আইনকানুন বান্দার উপর প্রযোজ্য ও প্রয়োগ হবে। সবকিছুতেই তার প্রভূত্ব রয়েছে। এবং এ সমস্ত ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র শরীক নেই। না কোন ফেরেশতার না কোন নবীর না কোন অলীর না কোন জ্বীন-শয়তানের না কোন জড়বৃক্ষের না কোন মুর্তির, না কোন কবর মাযারের, না কোন ওলী-দরবেশ ও পীর-ফকীরের। যে ব্যক্তি কালিমার এই দু'টি রুকনের অর্থ ও মর্ম সম্মকভাবে বুঝে মেনে চলতে পারবে তার জন্য এই কালিমার ফযীলত ও উপকার লাভ করা সম্ভব, নচেৎ নয়।

المعنى الخاطئي والصحيح ل ''الكلمة''
কালিমার বেঠিক ও সঠিক অর্থ ও মর্ম

উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার বিভিন্ন ধরণের শির্কের বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ হল কালিমার সঠিক অর্থ না জানা। অনেকেই এমন অর্থ করেন যা আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা.) এর উদ্দেশ্যের বিপরীত। এরূপ কয়েকটি অর্থ উদ্ধৃত হল:

(ক) অনেকে لا إله إلا الله এর অর্থ করেছে لا موجود إلا الله সমগ্র জগতে আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সর্বেশ্বরবাদ সাব্যস্ত হয় এ অর্থের মাধ্যমে। গায়রুল্লাহ বলতে কিছুই থাকে না। গায়রুল্লাহ বা আলাহ ছাড়া অন্য কিছু তো আছেই যেমন তার অসংখ্য মাখলুক। কিন্তু কোন মাখলুক কোন কিছুতেই আল্লাহর সদৃশ্য বা সমকক্ষ নয়। এমনকি

আল্লাহ কুরআনেই অনেক বাত্বিল ইলাহের উল্লেখ করে তাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন ।

(খ) অনেকে অর্থ করে لا خالق إلا الله অর্থাৎ আলাহ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই । অতএব আমল-ইবাদাতে শির্ক করলেও তাওহীদ ঠিক থাকে । যেহেতু সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে মানলেই তাওহীদবাদী হওয়া যায় । এতে করে জাহেলী যুগের কাফির-মুশরিকদের মত তাওহীদ বিশ্বাস করা হয় । তার চেয়ে বেশী নয় । কেননা তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিজগতের পরিচালনাকারী বিশ্বাস করতো । এমনকি তারা আবরী ভাষী হওয়ায় لا إله إلا الله এই কালিমার সঠিক অর্থও বুঝেছিল ।

(গ) আবার কেউ কেউ ধারণা করে যে কালিমার মর্ম হল সমস্ত সৃষ্টিজগতের উপর ইয়াক্বীন বিশ্বাস ত্যাগ করে কেবল তা আল্লাহর সত্ত্বার সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলা । এ অর্থ ভ্রান্ত কারণ, এ অর্থ বাস্তবতার পরিপন্থী । আল্লাহর প্রতি তো যথাযোগ্য ইয়াক্বীন থাকবেই । আর অন্যান্য বিষয়বস্তুর প্রতিও যেভাবে প্রযোজ্য ইয়াক্বীন রাখবে ।

(ঘ) لا حاكم إلا الله আল্লাহ ছাড়া কেউ বিধানদাতা নেই । এটা কালিমার মৌলিক অর্থ নয় । কালিমার এ অর্থ নতুন আবিস্কৃত, খারিজীরা এ অর্থ করে একেই প্রাধান্য দিয়ে ও এর উপর অটল থেকে হকচ্যুত- বক্রপন্থী হয়েছিল এবং আজও হচ্ছে । এটি সংকীর্ণ অর্থবোধক শব্দ । ইলাহ إله এর সকল অর্থ শামিল করে না । الحكم لله আলাহর বিধান আলাহর ألوهية উলুহিয়াতের অংশ বিশেষ মাত্র । – দেখুন হায়াতুল ক্বলুব (কিয়দংশ) ৩৭ ও সাময়িকী " আল-কালামুস সালাফী" তৃতীয় সংখ্যা সফর, ১৪২০ হিজরী ।

المعنى الصحيح للكلمة
কালিমার সঠিক অর্থ

সঠিক অর্থ হল لا معبود بحق إلا الله আলাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইবাদতের (উপাসনার) উপযোগী নেই । ইলাহ إله শব্দের আরবদের নিকট অর্থ হল: معبود বা উপাস্য । হক্ব বাতিল উভয় প্রকার উপাস্যকেই তারা إله মা'বুদ নামে অভিহিত করতো । যখন নবী (সা.) তাদেরকে কালিমাহ لا إله إلا الله এর দাওযাত দিলেন তখন এ বাক্যটিকে তারা আলাহ ছাড়া আরো

যত সব إله ইলাহের উপাসনা করতো সে সবের অস্বীকৃতি জ্ঞাপক বাক্য বলে বুঝল এবং আশ্চর্যম্বিত হল। তাদের জন্য কঠিন হয়ে গেল এ বাক্য উচ্চারণ করা। আর তারা এটাই বললঃ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب সে কি সমস্ত ইলাহকে এক উপাস্যে সীমাবদ্ধ করে ফেল, অবশ্যই এটা আশ্চর্যজনক বিষয়। বর্ত্তমান যুগের লোকেরা (নামে মুসলমানেরা) কি করেছে জানেন?

তারা তাদের নাবী, কথিত অলী, নেতা, কবর, মাযার, শহীদ মিনার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইলাহ إله শব্দের শাব্দিক প্রয়োগ বা ব্যবহার বাদ দিয়ে এ সমস্ত অর্থ সাব্যস্ত করে যা জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের বাত্বিল ইলাহদের জন্য সাব্যস্ত করতো। কথা ও কাজ তথা আচার-আচরণ উভয় দ্বারা। তাদেরকে আল্লাহর মত বা তার চেয়ে বেশী ভক্তি সম্মান প্রদর্শন, তাদের নিকট প্রার্থনা, তাদের প্রতি আশা-ভরসা, তাদেরকে ভয় ও আশংকা, আল্লাহর মত করে বা তার চেয়ে বিনয়াবনত হওয়া, কুর্ণিশ ও সাজদাহ করা, বিপদাপদে ফরিয়াদ করা, তাদের উদ্দেশ্যে মান্নত করা, তাদের উদ্দেশ্যে বা সম্মানার্থে ও স্মরণার্থে পশু জবাই করে খানা বা শির্নি দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে গায়রুল্লাহকে অর্থগত ভাবে ইলাহ মানারই নামান্তর।

– দেখুন হায়াতুল কুলূব পৃষ্ঠা ৩৮।

مقتضات لا إله إلا الله

লা ইলাহা ইলাল্লাহু এর দাবী ও চাহিদা সমূহ:

কালিমাটির দাবী হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনা।

প্রথমত: আল্লাহর উপর ঈমান বা বিশ্বাস ঃ

আর তাঁর উপর ঈমান আনতে হবে ৪টি বিষয়ের সমন্বয়ে।

(১) তার অস্তিত্বের উপর,

(২) তার প্রভূত্বের উপর,

(৩) তার দাসত্বের উপর ও

(৪) তার নামসমূহ ও গুণাবলীর উপর।

ঈমানের বাণী বা কালেমা হলোঃ

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله

আল্লাহ ব্যতীত উপাস্যের যোগ্য বা হক্বদার কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল ।

تعريف الإيمان

ঈমানের সংজ্ঞাঃ

এই সাক্ষ্য বাণী মুখে উচ্চারণ করে, তার অর্থ ও মর্মকে অন্তরে গভীর ভাবে বিশ্বাস করে, উপলব্ধ মর্মের দাবী হিসাবে সকল ফরয সুন্নাত ইবাদত পালন করাকে ঈমান বলে । এ সংজ্ঞার দলীল হলো আল্লাহর রাসূলের হাদীসঃ

অফদে আব্দুল কায়েসকে ৪টি বস্তু থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেনঃ এবং ৪টি বিষয় পালন করতে বলেছিলেন। পালনীয় বিষয়গুলিকে ঈমান বলে আক্ষা দিয়েছিলেন। উক্ত কথার সত্যতা আরো পোক্তা ভাবে বুঝা যায় এই জন্য যে, আল্লাহর রাসূল ঐ চারটি বলা আরম্ভ করেছিলেন ঈমান দিয়ে । এই কথা বলার পরপরই নিজেই তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন তোমরা কি জান ঈমান কাকে বলে? অত:পর ঈমানের বাণীটি উচ্চারণ করে নামায (ছলাত), যাকাত, রোযা (ছিয়াম), ও গণীমতের এক পঞ্চমাংশ আদায় করার (এই ৪টি) হুকুম করেন । – বোখারী ও মুসলিম ।

أركان الإيمان الستة

ঈমানের রুকন সমূহঃ

ঈমানের ছয়টি রুকন বা মুল অঙ্গঃ

১ । আলাহর প্রতি ঈমান ।

২ । ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান ।

৩ । আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ।

৪ ।সকল নবী ও রাসূল (সা.) গণের প্রতি ঈমান ।

৫। পরকালে বা আখেরাতের প্রতি ঈমান।

৬। ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি ঈমান।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এই ছয়টি রুকনের উল্লেখ এসেছে। আল্লাহ্ বলেন:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ

পূর্ব ও পশ্চিম অভিমুখে মুখমণ্ডল ফিরানোই সৎ কাজ নয়, বরং সৎকর্মশীল ঐ যে, ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফিরিশতাগণের প্রতি, কিতাবের প্রতি, ও নবীগণের প্রতি। –সূরা বাকারাহ ১৭৭।

আল্লাহ আরো বলেন:

.إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

আমি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি ভাগ্য সহ। {ভাগ্য অর্থ এমন নির্দিষ্ট ও অকাট্য সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা যা অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হবে। আর তাতে কোন হেরফের হবে না।} – সূরা কামার : ৪৯।

হাদীছে আল্লাহর রাসূল (সা.) জিবরীল (আ.) এর প্রশ্নের (ঈমান সম্পর্কে বলূন?) উত্তরে বলেছিলেন:

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره – رواه مسلم

ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি ও তার নির্ধারিত ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি। –মুসলিম।

شرح الأركان الستة
প্রতিটি রূকনের উপর বিশদ আলোচনা:

الركن الأول: الإيمان بالله تعالى
প্রথমত: আলাহ্র উপর ঈমান:

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ৪টি ক্ষেত্র রয়েছে (তাঁর অস্তিত্বের প্রতি, তাঁর প্রভুত্বের প্রতি, তাঁর দাসত্বের প্রতি ও তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনা)

الإيمان بوجود الله تعالى

১। আলাহর অস্তিত্বের উপর ঈমান অর্থাৎ আল্লাহ বা স্রষ্টা বলতে একজন আছেন এই বিশ্বাস রাখা।

আর তা পূর্ণ হবে আল্লাহর সকল প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার ও মানার মাধ্যমে। যারা আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে তাদেরকে আস্তিক বলে আর যারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাদেরকে নাস্তিক বলে। যারা আলাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না এমন কাফিরদের সংখ্যা পৃথিবীতে অত্যন্ত কম। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়াও অধিকাংশ ধর্মাবলম্বী (অমুসলিম) আলাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে। ফলে তারা অমুসলিম আস্তিক। তবে তারা আলাহর অস্তিত্বের সকল দিক বা প্রকার স্বীকার করে না, তাই তারা অপূর্ণ আস্তিক। মুসলিম সম্প্রদায়েরও অনেকেই আল্লাহর সকল প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এ দিক থেকে এ ধরণের মুসলিমদেরকে অপূর্ণ আস্তিক বা অপূর্ণ নাস্তিক বলা যায়। এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রকারভেদের ব্যাখ্যার সময়।

أنواع وجود الله تعالى

আলাহর অস্তিত্বের প্রকার ভেদ :

আলাহর অস্তিত্ব দুই প্রকার।

(ক) প্রভাবগত বা সৃষ্টিগত অস্তিত্ব : আরবীতে বলা হয় وجود الله الفعلي الخلقي এ বিশাল সৃষ্টিজগত, আসমান-জমীন, পাহাড়-পর্ব্বত, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ–নক্ষত্র, উপগ্রহ-গ্রহাণু তথা সৌরজগত, গ্যালাক্সি প্রভৃতি জ্যোতিস্ক, বিশাল মহাকাশে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ সব জ্যোতিস্কের ঘুর্ণন, এদের মহাকর্ষ শক্তি, এদের উজ্জ্বলতা ও এদের পরিণতি নির্ধারণ এবং পৃথিবীর

আলো, বাতাস, জ্বীন-মানুষ, পশু-পাখি, বন-বৃক্ষ, গাছ-পালা, অসংখ্য জীব-জন্তু, এসব কিছু নিজে নিজে তৈরী হয়নি। বরং এ সবের একজন সৃষ্টিকর্তা আছে।

এ বিভিন্নধর্মী সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার যে অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় একেই বলে আল্লাহর প্রভাবগত বা সৃষ্টিগত অস্তিত্ব।

আলাহর এ প্রকার অস্তিত্ব নাস্তিক ছাড়া সকল ধর্মের অনুসারীরাই স্বীকার করে। জাহিলী যুগের কাফিররাও স্বীকার করতো। বর্তমান মুসলিম সমাজের বিশেষভাবে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মুসলিম শুধু আল্লাহর সৃষ্টিগত বা প্রভাবগত অস্তিত্বই স্বীকার করে। অপর প্রকার অস্তিত্ব তথা আলাহর সত্ত্বাগত অস্তিত্ব যাকে আরবীতে الوجود الذاتي একে ছুরাত বা আকৃতিগত অস্তিত্বও বলা হয় – তা স্বীকার করে না।

(খ) আলাহর সত্ত্বাগত অস্তিত্ব (وجود الله الذاتي) : আলাহর সত্ত্বাগত অস্তিত্ব বা আকৃতিগত অস্তিত্ব অর্থাৎ আল্লাহর দর্শন ও দিদার যোগ্য সত্ত্বা রয়েছে যার লোভ আল্লাহ তায়ালা মুসলিম সম্প্রদায়কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দেখিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

অতএব যে ব্যক্তি, তার রবের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ আমল করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। –সূরা কাহাফ: **১১১**।

এ প্রকার অস্তিত্ব ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মাবলম্বী স্বীকার করে না। এমনকি আক্বীদাহগত ও তাওহীদী জ্ঞানের প্রচণ্ড অভাবের কারণে এবং ছূফীবাদীদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কারণে ভারতবর্ষের অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম তো দূরের কথা অধিকাংশ (৯০% মুসলিম) আলিম বলে পরিচিতরাও আলাহর এ প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহর যাত বা সত্ত্বাগত অস্তিত্বের অবস্থান বা স্থান সৃষ্টিগত অস্তিত্বের পূর্বে। সত্তাগত অস্তিত্ব ছাড়া প্রভাবগত অস্তিত্বের কল্পনাই করা যায় না। যার সত্ত্বাই নেই তিনি কীভাবে সৃষ্টি করবেন বা সৃষ্টিকর্তা হবেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে এ সব মুসলিম সত্তাগত অস্তিত্ব অমান্য ও অস্বীকার করার কারণে এক ধরণের নাস্তিকই রয়ে গেছে। এ নাস্তিকতার ঘোষণা বা স্বীকৃতি দেয়া হয়, আল্লাহকে নিরাকার বলার মাধ্যমে। আল্লাহ নিরাকার এটা হিন্দু ও শিখ ধর্মাবলম্বীদের

বিশ্বাস।[4] আল্লাহকে নিরাকার বলার মধ্যমে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহর সত্তাগত যত গুণাবলী রয়েছে তা অস্বীকার করা হয় বা এর অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি করা হয়। অথচ কুরআন ও ছহীহ কোন হাদীছে আল্লাহ নিরাকার বলা হয়নি। বরং নিরাকারবাদী কোন আলিমই কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে আলাহ্ নিরাকার হাওয়ার কোন দলীল বা প্রমাণ দেখাতে পারবে না।

دلائل وجود الله تعالى

আলাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণাদি :

আলাহ্র অস্তিত্বের অনেক প্রমাণাদী আছে যা এক এক করে বর্ণনা করতে গেলে হাজার হাজার হবে। এসব দলীলকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। **(ক) স্বভাগত প্রমাণ:** কুরআন হাদীছের ভাষায় যাকে فطرت ফিতরাত বলা হয়। ফিতরাত এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

الجبلة المتهيئة لقبول الدين الحق

অর্থাৎ এমন স্বভাব যা সঠিক দ্বীন (ধর্ম) গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত।

আল্লাহ বলেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا

অতএব (হে রাসুল বা হে মুমিন) তুমি নিজকে একনিষ্টভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই হলো আল্লাহর (প্রদত্ত) স্বভাব যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। – সূরা রূম ৩০।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: হাদীছে কুদসীতে রয়েছে:

خلقت عبادى حنفاء فاجتالهم الشياطين – رواه مسلم

---

[4] **টীকা ঃ** মাধ্যমিক হিন্দু ধর্ম শিক্ষা চতুর্থ পাঠ "ঈশ্বরবাদ" ২৩-২৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "ব্রক্ষ ঈশ্বর, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনি নিরাকার ও সর্বব্যাপী।" হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের অনুরূপ কথাই লিখা হয়েছে নবম-দশম শ্রেণীর "ইসলাম শিক্ষা" বইয়ে। উভয় ধর্মের বিশ্বাস সম্পর্কে লিখিত কথার সাদৃশ্যতা দেখে মনে হয় হিন্দু ধর্মের লোকেই দুই ধর্মের বিশ্বাস সম্পর্কে লিখেছেন। সেখানে লেখা হয়েছে প্রথম অধ্যায় "আকাইদ" পৃষ্ঠা নং ২" আল্লাহ তিনি অদৃশ্য নিরাকার অথচ সর্বত্র বিরাজমান।"

আল্লাহ বলেন, আমি বান্দাদেরকে একনিষ্ঠভাবে (তাওহীদবাদী করে) সৃষ্টি করেছিলাম, অত:পর শয়তান তাদেরকে বিচ্যুত করে ফেলে। –মুসলিম।

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه - رواه البخاري

প্রত্যেক শিশু ফিতরাত এর উপর ভুমিষ্ট হয়, অত:পর তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদী বানায়, খ্রীষ্টান বানায়, ও অগ্নিপুজক বানায়। –বোখারী।

অনেক সময় পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার বেড়াজালে চাপা পড়েও কারো ফিতরাত অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা শক্তিশালী হয়ে পারিপার্শ্বিকতার জাল ছিড়ে ঈমান আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতুলনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বিজয় হয়ে যায়। এর ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে।

(খ) বিবেকগত প্রমাণঃ

এই যে, বিভিন্ন ধর্মী অসংখ্য সৃষ্টিজীব ও বস্তু এর একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন। কারণ কোন বস্তু নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা অস্তিত্বের পূর্বে তো সে নিজেই শুণ্য ছিল। এমনিভাবে কোন বস্তু আপনা আপনিও সৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই বিবেক একথা বলতে বাধ্য যে, অবশ্যই এই সমস্ত সৃষ্ট জীব ও বস্তুর স্রষ্টা আছে। বিবেকগত প্রমাণের দ্বারা আলাহর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তাই কাফিরদের এই দলীলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছেঃ

أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ

তারা কি বিনা সৃষ্টিকর্তায় সৃষ্টি হয়েছে? নাকি নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? –সূরা তুর ৫৩।

জুবাইর বিন মুত্বইম (তৎকালীন মক্কার একজন কাফির) আলাহর রাসূলের কণ্ঠে উক্ত আয়াত শুনে তার কি ভাব হয়েছিল মুসলমান হয়ে ব্যক্ত করেছিলেনঃ আমার চৈতন্যময় আত্মা উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই দিনই প্রথম আমার অন্তরে ঈমান স্থাপিত হয়। – বোখারী।

(গ) শরীয়তগত প্রমাণঃ

আসমান হতে অহীর মারফতে বিভিন্ন নবীর ও রাসূলের উপর অবতারিত কিতাব ও ছহীফা সমূহে বিভিন্নভাবে মানবজাতির নিকট আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তার মাঝে লিপিব্ধ বান্দার কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ইবাদাত, নিয়মকানুন, হুকুম-আহকাম, চরিত্র-শিষ্টাচার ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। যিনি সৃষ্টির শৃংখলার জন্য এসব নাজিল করেছেন। এমনিভাবে এ সমস্ত গ্রন্থে বিশ্বজগত সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক যুগে যার সত্যতা ও বাস্তবতা পাওয়া যাচ্ছে, এতেও প্রমাণ হয় যে, এর অবতীর্ণ কারী, তথ্যদানকারী একজন সত্তা অবশ্যই রয়েছেন।

(ঘ) বাস্তব অনুভূতিগত প্রমাণঃ

আল্লাহর নিকট প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা কবুল বিপদগ্রস্থদের বিপদে সাহায্য চাওয়ায় অদৃশ্য সাহায্য লাভ ইত্যাদি দ্বারা অনুভর করা যায় যে, একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। নবী ও রাসূল (আ.) এবং বিভিন্ন পরহেজগার বান্দাদের দুআ কবুল এর জ্বাজল্যমান প্রমাণ।

নুহ (আ.) এর দু'আ ও তার ফলাফল সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে এসেছে।

وَنُوحاً إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَـ ٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ.
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.

ইতিপূর্বে নুহ আমাকে আহবান করেছিল ফলে আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম, তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে বিরাট বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। এভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলাম, সম্প্রদায়ের উপর যারা আমার নির্দশনসমূহকে মিথ্যা জেনেছিল, বস্তুত তারা ছিল অসৎজাতি, তাই তাদের সকলকে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলাম। – আল-আম্বিয়া ৭৬-৭৭।

বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহর রাসূল (সা.) আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়েছিলেন। আল্লাহ সাড়া দিয়ে বলেছিলেনঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلاۤئِكَةِ مُرْدِفِينَ.

যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য চেয়েছিলে অত:পর তিনি কবুলও করেছিলেন, (আমি বলেছিলাম) তোমাদের সাহায্যে

পরস্পরাগত এক হাজার ফিরিশতা পাঠিয়ে দেব। – আনফাল-৯।

বাস্তবেও মুসলমানগণ এক হাজার ফিরিশতার মাধ্যমে সাহায্য লাভ করেছিলেন। রাসূল (সা.)ও মুসলমানগণ এমনকি কাফিররাও স্বচক্ষে দেখেছিল। – ছহীহ বুখারী।

জুমআর খুৎবায় জনৈক সাহাবীর মুখে অনাবৃষ্টির খবর শুনে ও তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইস্তিস্কার দু'আ পড়ে আল্লাহর নিকট পানি চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ সৃষ্টি হয়ে খুৎবারত অবস্থাতেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সকলে বাড়ী ফেরৎ যায়। এক সপ্তাহ ব্যাপী বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় মানুষের জীবন যাত্রা বিঘ্নিত হয় ফলে পরবর্তী জুমুআয় আবার ঐ ব্যক্তির কিংবা অন্য ব্যক্তির আবেদনে পানি বন্ধের জন্য দু'আ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়।

–হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন।

আজও খাঁটি পরহেজগার বান্দারা একাগ্রচিত্তে আল্লাহর নিকট দু'আ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার ওয়াদা অব্যাহত থাকবে।

নবীগণের মু'জিযাহসমূহও আল্লাহর অস্তিত্বের উপর বড় প্রমাণ: মুসা, ঈসা, মুহাম্মাদ (সা.) এর মু'জিযাসমূহ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ বলতে অবশ্যই একজন আছেন যিনি তাঁর রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণের জন্য এসব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। এই সমস্ত মু'জিযা দেখে বহু কাফির মুশরিক আল্লাহর উপর ঈমান আনতে বাধ্য হয়েছিল। কুরআন ও হাদীছে এর ভুরিভুরি বর্ণনা এসেছে।

এমনিভাবে সাধারণ মু'মিনদের কাউকে কাউকে কারামাত দানের মাধ্যমেও আল্লাহর অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

الإيمان بربوبية الله – وهو توحيد الربوبية

২– আল্লাহর প্রভূত্বের উপর ঈমান:

قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ

বলুন, আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি একক পরাক্রমশালী। – সূরা আর-র'দ : ১৬।

এটাকেই আরবী আক্বীদার পরিভাষায় توحيد الربوبية তাওহীদুর রুবুবিয়াহও বলা হয়

সংজ্ঞা : সকল সৃষ্টিজীব ও বস্তুর একচ্ছত্র প্রভু ও স্রষ্টা এবং মালিক ও পরিচলনাকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ এই বিশ্বাসকেই বলা হয় আল্লাহর প্রভূত্বের উপর ঈমান বা তার প্রভূত্বের ক্ষেত্রে একত্বের ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান।

সংক্ষেপে: আল্লাহর কৃতকর্মে তিনি একক তার কোন শরীক নেই এই বিশ্বাস রাখা। আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-পালা, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজীর একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ, এসবে আর কারও বিন্দুমাত্র শরীক নেই। তিনিই আইন কানুন ও বিধানদাতা, আর কেউ নয়। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ ٱلشَّمْسَ وَ ٱلْقَمَرَ وَ ٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ

নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অত:পর রাত্র দিয়ে দিনকে আবৃত করেন, ফলে দ্রুতগতি তাকে অনুসরণ করে, আরো সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ, এ সমস্তই তাঁর নির্দেশাধীন, জেনে রাখ সকল সৃষ্টিজীব, ও বস্তু এবং নির্দেশ (বা বিধান দানের অধিকার কেবল) তারই, আল্লাহ বরকতময় ও সমগ্র জগতের প্রতিপালক। – সূরা আ'রাফ ৫৪।

قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ.

বলুন: তোমরা তাদেরকে ডাকো, যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য মনে করতে। তারা আসমান ও যমীনের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতদোভয়ে তাদের কোন শরীক নেই এবং তাদের কেউ তার পৃষ্ঠপোষকও নয়। – সূরা সাবা: ২২।

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً.

বলুন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সার্বভৌমত্বে কোন শরীক নেই এবং দুর্দশাগ্রস্থ নন যার ফলে তার কোন সাহায্যকারী প্রয়োজন নেই। অতএব, আপনি তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।
– সুরা ইসরা: ১১১।

*** তাঁরই হাতে আসমান-যমীনের চাবিকাঠি:**

لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْض

তাঁরই নিকটে রয়েছে আসমান যমীনের ভাণ্ডার ও চাবি।
–সূরা যুমার ৬৩, সূরা শুরা ১২।

تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বরকতময় সেই সত্তা যার হাতে রয়েছে সমগ্র জগত। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। – সূরা মুলক ১।

*** তিনিই সকল সৃষ্টিজীবের রিযিকদাতা:**

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

নিশ্চয়ই আলাহই হলেন রিযিকদাতা ও পরম ক্ষমতাবান। Ñm~iv hvwiqvZ 58|

*** তার হুকুম ব্যতীত কোন কিছুই হয় না, আর যা কিছুই ঘটে সবই তাঁর জানার ভিতর :**

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

তাঁরই নিকট রয়েছে গায়েবের চাবি-কাঠি, (আর কারো কাছে নয়) তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না, জলে স্থলে যা কিছু রয়েছে তিনি তা জানেন, গাছের একটি পাতাও পড়ে না, তাঁর জানার বাইরে, যমীনের অন্ধকারে শুস্ক ও তরল দানা ওসবই স্পষ্ট কিতাবের ভিতর লিপিবদ্ধ রয়েছে। – সূরা আনআম ৫৯।

*** তিনিই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন:**

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অত:পর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনিই সকল বিষয় ও কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। – সূরা ইউনুস ৩।

* তিনি হায়াত ও মওত সৃষ্টি করেছেন:

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

তিনি হায়াত ও মওতকে সৃষ্টি করেছেন এই পরীক্ষার জন্য যে, কে সর্বোত্তম আমল করে। – মুলক ২।

لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِـٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই তিনিই জীবিত করেন ও মারেন অতএব ঈমান আনো আল্লাহর উপর ও তাঁর উম্মী (লেখাপড়া বিহীন) নবীর উপর যিনি নিজেও আল্লাহর উপর ও তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান রাখেন। আর তাঁরই অনুসরণ কর, অবশ্যই হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। Ñ m~iv AvÕivd 158|

* তিনিই সন্তান দিয়ে থাকেন আবার কাউকে নি:সন্তান করেন

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব কেবল আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান, আবার কাউকে কন্যা ও পুত্র উভয়টিই দান করেন, আবার কাউকে বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী ও ক্ষমতাবান। – সূরা শুরা- ৪৯-৫০।

* তিনিই বিপদ-আপদ দিয়ে থাকেন আবার তিনিই উদ্ধার করে থাকেন:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদ আসে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর (খাঁটিভাবে) ঈমান আনবে তিনি তার হৃদয়কে হিদায়াত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন, তিনি সব কিছুই জানেন। – সূরা তাগাবুন -১১।

قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِّن ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَـٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ.

হে নবী বলুন কে তোমাদেরকে রক্ষা করে জল ও স্থলের অন্ধকার থেকে? তোমরা তো তাঁকেই (আল্লাহকেই) আহবান করো গোপনে বিনয়ের সাথে এই বলে যে, যদি এই বিপদ থেকে তিনি মুক্তি দান করেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হব। আপনি বলুন আলাহই তা থেকে এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকেন। কিন্তু তা সত্বেও তোমরা তার সাথে শরীক করে থাক। – সূরা আন'আম ৬৩-৬৪।

*** একমাত্র আল্লাহই হিদায়াত করতে পারেন: তিনি খাদ্য পানীয় দান করেন তিনি রোগের আরোগ্য দান করেন, তিনিই মরার পর পুনরায় উত্থান করবেন।**

আলাহর বাণী:

ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ * وَٱلَّذِيۤ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيۤئَتِي يَوْمَ ٱلدِينِ

(নবী ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন) যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই হিদায়াত দান করবেন। তিনিই খাদ্য ও পানীয় দান করবেন। যখন রুগ্ন হব তিনিই আরোগ্য দান করবেন, তিনি মৃত্যুর পর আবার জীবিত করবেন। তার নিকট আশা রাখি যে, তিনি কিয়ামতের দিন আমার পাপ মোচন করে দিবেন। – সূরা শুআরা ৭৮-৮১।

*** তিনি রাজত্ব ও ইজ্জত দান করেন আবার কারো নিকট থেকে তা হরণও করে থাকেন:**

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيتَ مِنَ ٱلْحَي وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

বলুন হে আল্লাহ! রাজাধিরাজ, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব হরণ করে নেন, যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন, যাকে ইচ্ছা অসম্মান করেন, আপনার হাতেই সকল কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনি

সর্ববিষয়ে পরম ক্ষমতাবান। আপনি রাত্রিকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাত্রিতে আপনিই জীবিতকে মৃত থেকে ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন, যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন। Ñ m~iv Avjy-Bgivb 26,27|

আইন কানুন ও বিধি বিধান দাতা একমাত্র আল্লাহ, এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ করা আল্লাহর প্রভুত্বের উপর ঈমান না আনার শামেল, আর এই হস্তক্ষেপ কারী আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী মুশরিক বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ বলেন: إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

আল্লাহর বিধান ব্যতীত আর কোন বিধান চলবে না। Ñ m~iv BDmyd 40|

আল্লাহ আরো বলেন:

مَا لَهُم من دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً

আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তাদের অভিভাবক নেই এবং তার বিধানের ক্ষেত্রে কেউই শরীক নেই। – সূরা কাহাফ - ২৬।

***তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস :**

জনগণ বা পার্লামেন্ট নয় যেমন পাশ্চাত্যের ধ্বজাধারী মস্তিস্ক বিকৃত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কিছু রাজনীতিবিদরা আউড়িয়ে থাকে।

আল্লাহ বলেন: وأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً

আর সকল ক্ষমতা একমাত্র আলাহরই। – সূরা বাক্বারাহ ১৬৫।

الكلمة المهمة حول ربوبية الله

আল্লাহর প্রভুত্বের উপর জরুরী আলোচনা :

আল্লাহর প্রভুত্বের উপর ঈমান বা তাওহীদে রুবুবিয়াহর স্বীকৃতি প্রদান করতো তৎকালীন মক্কার কাফির মুশরিকরাও। এমনকি তারা আংশিক ভাবে উলুহিয়াহ এবং আসমা ও সিফাতেও বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তাদের এই ঈমান ও স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেনি। উক্ত ঈমান থাকা সত্বেও আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) তাদেরকে কাফির ও মুশরিক বলেই আখ্যা দিয়েছেন। তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাদের রক্তপাত ও সম্পদ হালাল মনে করেছেন। তাদের নারীদের বন্দী করে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করা হালাল মনে করেছেন। কারণ তারা তাওহীদে উলুহিয়াহ ও আসমা ও সিফাত আংশিকভাবে মানলেও ভেজাল মিশ্রিত করে মানতো কিংবা এক সময় খাঁটি ভাবে মানলেও অন্য সময়ে ভেজাল মিশ্রিত করে মানতো।

আল্লাহর প্রভুত্বে তাদের ঈমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতগুলি থেকে:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

হে নবী! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। Ñ m~iv jyKgvb 25|

অন্যত্র বলেছেন :

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ

তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন কে আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তারা অবশ্যই বলবে ওসবই সৃষ্টি করেছেন সেই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আলাহ। – সূরা যুখরুফ ৯।

অন্যত্র বলেন:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ*

যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ, অত:পর তারা (তাঁর ইবাদত থেকে) কোথায় ফিরে যাচ্ছে? – সূরা যুখরুফ ৮৭।

অন্যত্র আরো বলেছেন:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم منَ ٱلسَّمَآءِ وَ ٱلأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ و ٱلأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيتَ مِنَ ٱلْحَي وَمَن يُدَبرُ ٱلأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ *

বলুন, কে তোমাদের রিযিক দিয়ে থাকে আসমান ও যমীন থেকে, কে কর্ণ ও চক্ষু সমূহের মালিক, কে জীবিতকে মৃত থেকে ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন, কে সমস্ত কার্য পরিচালনা করে থাকে? তারা একথাই বলবে, আল্লাহ। তাদের বলুন এরপরেও কি তোমরা তাকে ভয় করবে না?
– সূরা ইউনুস ৩১।

قُل لمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ * قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُ ل شَيْءٍ وَهُوَ يُجْيِرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ *

বলুন, যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, এসব কার, যদি জ্ঞান থেকে থাকে? তারা বলবে আল্লাহর। বলুন এর পরও কেন উপদেশ গ্রহণ কর না? বলূন, সাত আসমান ও বিশাল আরশের মালিক কে? তারা বলবে ওসব আলাহর মালিকানাধীন। বলূন, এরপরও কেন তোমরা তাকে ভয় কর না? বলুন, কার হাতে সব কিছুর রাজত্ব রয়েছে, তিনি আশ্রয় দিয়ে থাকেন অথচ তার বিরুদ্ধে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমাদের জ্ঞান থেকে থাকে। তারা অচিরেই বলবে সে সবই আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। তবে কি করে প্রতারিত হচ্ছ (সেই আল্লাহর একত্ববাদ থেকে) যাদু প্রভাবিতের ন্যায়। – সূরা মু'মিনুন ৮৪-৮৯।

আংশিকভাবে তাঁর (আল্লাহর) দাসত্বেও (উবুদিয়াতে) বিশ্বাসী ছিল:

কুরআন ও হাদীছে পাওয়া যায় তারা বিপদ-আপদে পড়লে আল্লাহর নিকট দু'আ করত, হজ্জ করত, তাওয়াফ করত, নযর নিয়াজও করত। আল্লাহ বলেন:

فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَر إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ *

যখন তারা (নদীগর্ভে) নৌকায় চড়ত আল্লাহকেই আহবান করতো তার জন্য দ্বীনকে খালেছ করতঃ। অত:পর যখন (নদীগর্ভ থেকে মুক্তি পেয়ে) স্থলে এসে উঠতো আবার তারা শরীক স্থাপন করত। – সূরা আনকাবুত ৬৫।

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

আর যখন মেঘস্তুপ বরাবর ঢেউ তাদেরকে গ্রাস করার উপক্রম হত, তখন তারা আল্লাহকে আহবান করত তার জন্য দ্বীনকে খাঁটি করত: অত:পর যখন স্থলে এসে উঠত তখন তাদের মধ্যে কেউ মধ্যমপন্থী হত, আর আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে একমাত্র তারা যারা অকৃতজ্ঞ গাদ্দার তারাই ।
– সূরা লোকমান ৩২ ।

তারা হজ্ব করার সময় তালবিয়া পাঠ করতো এই বলে:

لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك

(ابن كثير 317/2' وتطهير الاعتقاد 21)

তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, তোমার কোন শরীক নেই, কেবল ঐ শরীক ছাড়া যেটা তোমারই তুমি তারও মালিক এবং সে যেটার মালিক সেটারও । – ইবনে কাছীর ২/৩১৭ তাত্বহীরুল ই'তিহাকাদ ২১ ।

এমনকি তারা নবীর (ছঃ) এর বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট চ্যালেঞ্জিং দু'আও করেছিল:

وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً منَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ *

আর যখন তারা বলেছিল, হে আল্লাহ যদি এটাই তোমার নিকট হতে আনীত হক হয় তবে আসমান থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষাও কিংবা কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান কর । – সূরা আনফাল -৩২ ।

এই দু'আ করেছিল আবু জাহল । – বুখারী ও ইবনে কাছীর ।

কেউ কেউ বলেছে নাযর বিন হারিছ বিন কিলদাহ । ÑBeby KvQxi I dvZûj evix|

الإيمان بألوهية الله – وهو توحيد الألوهية

৩ । আলাহর ইবাদাত বা দাসত্বের প্রতি ঈমান:

আল্লাহর দাসত্বের প্রতি ঈমান এটাই হলো توحيد الالوهية তাওহীদুল উলুহিয়াহ ।

উলুহিয়াহ অর্থ ইবাদত: ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হলো বিনম্র হওয়া ও বশ্যতা স্বীকার করা। ইসলামী পবিভাষায় নবী ও রাসূল গণের মাধ্যমে দেয়া আদেশ-নিষেধ পালন করার মাধ্যমে আলাহর আনুগত্য করা। এই সংজ্ঞা দিয়েছেন প্রখ্যাত ইসলামী গবেষখ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র.)। তিনি আরো বলেছেন: যে কোন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ যার মাধ্যমে আল্লাহর মুহাব্বাত ও সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তাকেই ইবাদত বলে।

আরো বলা যেতে পারে যে, শরীয়ত সম্মত সমস্ত কথা ও কাজ যার মাধ্যমে আল্লাহর মহানত্ব, ও বড়ত্ব প্রকাশ করা হয় তাকেই ইবাদত বলা হয়। আরো বলা হয়েছে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর যাবতীয় আদেশ পালন ও যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকাকেই ইবাদত বলে।

أنواع العبادة

ইবাদতের প্রকার ভেদ:

ইবাদত অনেক ধরণের রয়েছে।

মোটামোটি ৪ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১। অন্তরের ইবাদত: ঈমানের ছয়টি রূকন মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, ইখলাস ও শুদ্ধ নিয়ত, আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা, মনে মনে আল্লাহর যিকির করা, ভয় করা, আকাঙ্খা রাখা, আল্লাহর মাখলুকাত নিয়ে চিন্তা করা, ভালবাসা, ঘৃণা করা, ইসলামকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বলে বিশ্বাস করা, ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম ও মতবাদকে বাত্বিল বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

২। শব্দ দ্বারা ইবাদত: كلمة التوحيد তাওহীদী বাণী উচ্চারণ করা, কুরআন তেলাওয়াত করা বা শিক্ষা দেয়া, বিভিন্ন প্রকার ও অবস্থা বিশেষে দু'আ পড়া, আযান দেয়া, ইকামাত দেয়া, তালবিয়া পাঠ করা, ওয়াজ করা ইত্যাদি।

৩। দৈহিক ইবাদত : নামায বা ছলাত পড়া, তার মধ্যে ক্বিয়াম, রুকু, সিজদা, উঠা-বসা করা, রোযা বা ছিয়াম পালন করা, হজ্জের বিভিন্ন কাজ করা, তাওয়াফ করা, উমরাহ করা এবং পিতা-মাতার সেবা করা ইত্যাদি।

৪ । ইবাদতে মালিয়া বা আর্থিক ইবাদত: যেমন যাকাত প্রদান করা, ছদাকাহ দেয়া, মান্নত করা, বা নযর-নিয়ায করা, কুরবাণী বা পশু জবাই করা বিভিন্ন আমল-ইবাদাতে সম্পদ খরচ করা এবং মসজিদ–মাদরাসা নির্মাণ করা ইত্যাদি ।

৫ । উপরোক্ত ৪ প্রকারের সমন্বিত ইবাদাত যেমন হজ্জ । এটি মনের ইখলাছ, সম্পদ ব্যয়, শরীরের কষ্ট, মুখে তালবিয়া পাঠসহ অন্যান্য দু'আ দরূদ ইত্যাদির সমন্বয়ে হজ্জ নামক ইবাদাতটি পালন করা হয় ।

বি.দ্র. ইবাদত কবুল ও সংক্ষণের শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয় (অধ্যায়ের) শেষে দেখুন ।

উপরোল্লিখিত সমস্ত প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে শরিকহীন ভাবে পালন করাকে আলাহর দাসত্বের প্রতি ঈমান আনা বলা হয় বা দাসত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা সাব্যস্ত হয় । আলাহ বলেন:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدَا

হে নবী বলুন, শুধু মাত্র আমি তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার নিকট ওহী প্রেরিত হয় । তোমাদের উপাস্য শুধুমাত্র একজন । সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎ আমল করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতের সাথে আর কাউকেও শরীক না করে ।

–সূরা কাহফ -১১০ ।

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَب ٱلْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

বলুন আমার ছলাত, আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য । তাঁর কোন শরীক নেই, এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে, আর আমি মুসলিমগণের প্রথমজন । Ñ m~iv AvbÕAvg 163|

অত্র আয়াতে নির্দেশ হলো মুসলিম ব্যক্তির নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত কুরবাণীসহ জীবনের প্রতিটি কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র কোন বস্তু ও ব্যক্তিকে শরীক সাব্যস্ত করা যাবে না ।

لعن الله من ذبح لغير الله

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে যবাই করে তার উপর আলাহর লা'নত। – হাদীছটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

দু'আ ও ইবাদত :

وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً *

আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ একমাত্র আলাহর জন্য অতএব আলাহর সাথে কাউকেও আহবান করো না। –সূরা আল-জ্বীন: ১৮|

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً منَ ٱلظَّالِمِينَ

আর আল্লাহ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কাউকে আহবাণ যে তোমার কোন উপকার ও অপকার করতে পারে না। আর যদি এমনটি কর তবে নিঃসন্দেহে যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে। – সূরা ইউনুস: ১০৬।

রুকু সিজদা হলো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত তা কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করতে হবে। আর অন্য কোন কবর মাযার পীর-ফকির, অলি-দরবেশ, পিতা-মাতা, ওস্তাদ-গুরুজন, নবী-রাসূল, জ্বীন-ফিরিশতা, পাথর-মুর্তি, এক কথায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য করা হারাম তথা বড় শিরক।

وَقَالَ رَبُّكُمْ ٱدْعُونِيۤ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: তোমরা আমাকে আহবাণ কর, আমি সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদাত থেকে অহংকার পোষণ করবে। শীঘ্রই সে অপমানজনকভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। –সূরা গাফির: ৬০।

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَ ٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *

হে মুমিনগণ! রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর। আর কল্যাণের কাজ কর, অবশ্যই সফলকাম হতে পারবে। – সূরা হাজ্ব ৭৭।

وَمِنْ آيَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ *

আলাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত হলো রাত্রি, দিন, সূর্য, চন্দ্র। খবরদার সুর্য চন্দ্রকে সিজদা করো না, সিজদা কর তার জন্য যিনি ওগুলো

সৃষ্টি করেছেন– যদি শুধু তারই ইবাদত করে থাক| –সূরা ফুসসিলাত ৩৭।

عن قيس ابن سعد قال: اتيت الحيرة بلدة قرب الكوفة - فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق ان يسجد له' فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان الفارس الشجاع المقدم علي القوم دون الملك- فأنت أحق بان يسجد لك' فقال لي: ارأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ فقلت: لا' فقال: لا تفعلوا' لو كنت آمراً احدا أن يسجد لاحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق - رواه أبو داود

কাইস বিন সা'আদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি কুফাহ নগরীর নিকটস্থ "হীরাহ" একালায় এসেছিলাম। সেখানের লোকদেরকে দেখলাম তাদের নেতাদের উদ্দেশ্যে সাজদাহ করছে। এ দেখে আমি মনে মনে বললাম আল্লাহর রাসূল (ছঃ) এদের চেয়ে অধিক সাজদাহ পাওয়ার যোগ্য। অতঃপর দেখেছি বাদশাহর নিম্নস্তরের নেতা সেনাবাহিনী প্রধানদেরকেই সাজদাহ করছে। আপনি তো তাদের চেয়েও সাজদাহ পাওয়ার অধিকযোগ্য। তিনি বললেন, তুমি যদি আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম কর তবে তুমি তাকে সাজদাহ করবে? আমি বললাম: না। তিনি বললেন তাহলে কখনই এমনটি করবেন না। আমি যদি কাউকে কারো উদ্দেশ্যে সাজদাহ করতে বলতাম তাহলে মহিলাদেরকে তাদের স্বামীদের উদ্দেশ্যে সাজদাহ করতে বলতাম। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের উপর বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। – আবু দাউদ হাদীছ নং ২১৪০। আলবানী ছহীহ বলেছেন। তিরমিযী হাদীছ নং ১১৫৯, ইবনু মাজাহ হাদীছ নং ১৮৫৩।

নাসাঈতে এসেছে। আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,

لا يصح لبشر ان يسجد لبشر

কোন মানুষের জন্য কোন মানুষকে সাজদাহ করা ঠিক বা বৈধ নয়। –মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৯/৪

নযর নিয়ায ও তাওয়াফ করাও ইবাদত:

তাই এটাও একমাত্র আলাহর উদ্দেশ্যে ও তারই নামে হতে হবে। তাওয়াফ কেবল মাত্র আল্লাহর ঘর কা'বা গৃহেই করতে হবে অন্য কোন জায়গায় করলে বড় শিরক হবে। আল্লাহ বলেন:

وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

তারা (মুমিনগণ) যেন তাদের নযর পূর্ণ করে আর সম্মানীত পুরাতন ঘরের (কা'বা গৃহের) তাওয়াফ করে। –সূরা হজ্জ ২৯।

আল্লাহ বলেন:

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

যা কিছু তোমরা খরচ কর কিংবা যা কিছু তোমরা নযর মান আল্লাহ তা ভালই জানেন। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।

–সূরা বাক্বারাহ : ২৭০।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه (رواه البخاري)

যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন আনুগত্যের কাজ করার নযর মানে সে যেন তা পুরণ করে আর যে আল্লাহর কোন নাফারমানীর কাজ করার নযর মানে সে যেন তা পূর্ণ না করে। –বোখারী।

হানাফী মাযহাবের ফিকার ভিতরেও এগুলির হারাম হওয়ার ফাতওয়া পাওয়া যায়: الاجماع على حرمة نذر المخلوق (بحر الرائق)

কোন মাখলুকের নামে (অলি, পীর, ফকিরের নামে) নযর মানা সকলের ঐক্যমতে হারাম। –বাহরুর রায়েক।

النذر لغير الله حرام وحرام المنذور لغير الله (فتاوى عبد الحى اللكهنوي)

আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নামে নযর (মানত) মানা হারাম এবং ঐ মান্নতকৃত বস্তুও হারাম। – আব্দুল হাই লক্ষৌভীর ফাতওয়া গ্রন্থ।

واعلم ان النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام ومايؤخذ من الدرهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالاجماع باطل حرام (در المختار)

জেনে রাখা উচিত, মুর্খ সমাজ কর্তৃক মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এবং অলি-পীরের নামে যে মান্নত দেয়া হয় এবং যে সমস্ত টাকা পয়সা, মোমবাতি, তৈল ইত্যাদি অলীদের মাযারে তাদের নৈকট্য লাভের জন্য দেয়া হয় সকলের ঐক্যমতে তা বাত্বিল এবং হারাম। – দুররুল মুখতার।

আল্লাহর নামে শপথ করাও ইবাদত:

কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ করবে সে শিরক করবে।

من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন যে আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নামে শপথ করবে সে কুফরী করল কিংবা শিরক করল। –ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ও হাসান বলেছেন, ইমাম হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

সাহায্য চাওয়াও আল্লাহ ইবাদত:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য কামনা করি।

– সূরা ফাতিহা – ৪।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন

إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله (رواه الترمذي)

যখন কিছু চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে এবং যখন সাহায্য চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।

–হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর রহমাতের আশা করা এবং তার আযাবকে ভয় করাও ইবাদাত

আল্লাহ বলেন:

أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَحْذُوراً

যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের জন্য অসীলাহ (মাধ্যম) তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমাতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। – সূরা ইমরান : ৮৭।

আল্লাহকে ভয় করা তাঁর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করাও ইবাদত:

কাজেই অন্য কোন ব্যক্তি ব বস্তুকে ভয় করাও শির্ক হবে।

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

তারা কেবল শয়তান যে তার বন্ধুদের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করে। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করোনা। বরং আমাকেই ভয় কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। – সূরা আলে-ইমরান ১৭৫।

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে (সংকট মুহূর্তে) তিনি তার জন্য নিস্কৃতির পথ বের করে দিন এবং তাকে তিনি এমন খাত (ক্ষেত্র) থেকে রিযিক দান করেন যা তার ধারণাতীত এবং যে আল্লাহর প্রতি ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। – সূরা আত-ত্বলাক ২-৩।

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আর তোমরা কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। – সূরা মায়েদাহ ২৩।

شروط قبول العمل وصيانته

আমাল-ইবাদাত ক্ববুল ও সংরক্ষণের শর্তাবলী ঃ

সকল মুসলিম ভাই-ভগ্নিদের জানা উচিত যে, যে কোন ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য অবশ্যই কিছু শর্তা-শারায়েত রয়েছে। যা পালন না করা হলে ইবাদাত কবুল হয় না। তবে সকল শর্ত সম মর্যাদা ও সমমানের নয়, শর্তগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। এমন শর্ত, যা পূরণ না করলে কোন ইবাদাত বা আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

২। এমন শর্ত, যার কারণে আমল গৃহীত হবে কিন্তু ঝুলন্ত অবস্থায় বা বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকবে, সে শর্ত নিজে কিংবা অন্য কেউ পুরণ করলে তা গৃহীত হয়ে যাবে।

৩। এমন শর্ত, যা পুরণ না করলে ইবাদাত কবুল হওয়ার ব্যাপারে বাধা বা অন্তরায় নয়, কিন্তু তার ঘাটতি হতে হতে অবশিষ্ট নাও থাকতে পারে।

প্রথমত ঃ ঐ সকল শর্ত যা পূর্ণ না করলে ইবাদাত ছহীহ বা কবুল হবে না ।

আর এ ধরণের শর্ত পাঁচটি ঃ

এক ঃ সকল প্রকার শির্ক আকবর (বড় শির্ক) আছগার (ছোট শির্ক), বিদআত, কুফরী, মুনাফিক্বী থেকে তাওবাহ করতে হবে ।

শির্কে আকবার হলো– আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে সকল ইবাদাত পালন করা হয় তার কোন একটি ইবাদাত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা ।

আর ইবাদাত বলা হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কণ্ঠে প্রচারিত আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করাকে । আরো বলা হয়েছে– ঐ সমস্ত কথা ও কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন বলে ক্বুরআন ও হাদীছে ঘোষিত হয়েছে সেই কথা ও কাজগুলিরই নাম ইবাদাত । আর এই ইবাদাত আদায় করা যায় অন্তর, মুখ, মাল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ।

– দেখুন তাইসীরুল আযীয শারহু কিতাবুত তাওহীদ - ৪৬ পৃষ্ঠা

অন্তরের ইবাদাত ঃ আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর নিকট আশা-আকাঙ্খা করা, আল্লাহর উপর ভরসা রাখা, আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসা । আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করা, মনে মনে আল্লাহর যিকির করা, মান্নত করা, কোন সৎ কাজের ইচ্ছা বা কল্পনা করা ।

মুখের ইবাদাত ঃ দু'আ করা, মুখে উচ্চারণ করে যিকির করা, বিপদ ও রোগ মুক্তি চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা । আল্লাহর গুণগান বর্ণনা করা, ওয়াজ-নসীহত করা, আযান ও ইক্বামাত দেওয়া, হজ্জে তালবিয়াহ পাঠ করা ইত্যাদি ।

বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা ইবাদাত ঃ রোযা, রুকু-সিজদা, হজ্জ, জিহাদ, পিতা-মাতার খিদমত, সাধারণ মানুষের উপকার ও সহযোগীতা করা, আল্লাহা উদ্দেশ্যে পশু জবাই বা কুরবাণী করা ইত্যাদি ।

মালের ইবাদাত ঃ যাকাত, ছদাকাহ, ফিত্বরাহ, জিহাদে খরচ করা, পরিবার পরিজনদের খোরপোষের জন্য ব্যয় করা ইত্যাদি ।

যেহেতু উপরোক্ত কাজগুলিতে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ রয়েছে এবং ঐ কাজগুলি আল্লাহ পছন্দ করেন, এই জন্য তা ইবাদাত । তাই তার কোন

একটি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করলে শির্কে আকবার হয়ে যাবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ উপরোক্ত ইবাদাতগুলির অনেক ইবাদাতই মাজার, ক্ববর, দরগাহ, পীর-ওলী ও পাগল ফক্বীরদের জন্য সাব্যস্ত করা হচ্ছে। সেখানে রুকু-সিজদাহ, সাহায্য ভিক্ষা, বিপদ ও রোগ মুক্তির জন্য দু'আ, বিভিন্ন ধরণের মান্নত-মানসা, বিভিন্ন ধরণের পশু নিয়ে সেখানে জবাই করা হচ্ছে। সেই মৃত ও জীবিত অলীদের জন্য এমন ক্ষমতা ও শক্তির ঘোষণা দেয়া হয়, যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে এগুলি সবই বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বিপুল জনগোষ্ঠী এই সমস্ত বড় শির্কে লিপ্ত থেকে দাবী করছে তারা মু'মিন। এ ধরণের দাবীদার মু'মিনদের সম্পর্কে কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُونَ

তারা অধিকাংশ মু'মিন নয়, বরং তারা মুশরিকই রয়ে গেছে। এই ধরণের বড় শির্ক থেকে তাওবাহ না করলে কোন ইবাদাতই আল্লাহর নিকট ছহীহ বা কবুল হবে না। – সূরা ইউসুফ : ১০৬।

আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের উদ্দেশ্যে শির্কের ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ* بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ *

আর নিশ্চয় আপনার নিকট ও আপনার পূর্ববর্তী নবীদের নিকট ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, যদি শরীক করেন (আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে) অবশ্যই আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন। অতএব শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হোন। – যুমার– ৬৫,৬৬।

অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

আর যদি তাঁরাও অর্থাৎ নবীগণও শরীক করতেন তাহলে তাঁদেরও সকল আমল ধ্বংস হয়ে যেত। – সূরা আনআম – ৮৮।

কুফরী, মুনাফেক্বী, থেকেও তাওবাহ্ না করলে যাই আমল করা হবে বাত্বিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

মুশরিকদের আদৌ উচিত নয় বা শোভা পায় না, আল্লাহর মসজিদসমূহ বানানো এমতাবস্থায় যে, (কার্যকলাপের মাধ্যমে) নিজেরাই নিজেদের কাফির হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, এরা তো তারা যাদের আমলসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা।

– সূরা তাওবাহ – ১৭।

এমনিভাবে সূরা তাওবাহর ৫৩ ও ৫৪ আয়াাতেও বলা হয়েছে। সূরা হুদের ১৫ ও ১৬ আয়াতেও বলা হয়েছে।

ছোট শির্ক সমূহ থেকেও বিরত থাকতে হবে ঃ

ছোট শির্ক দুই প্রকার। (১) গোপণ ও (২) বাহ্যিক।

১। গোপণ শির্ক হলো এই যে, নির্দিষ্ট ফরয-সুন্নাত ইবাদাত করতে যেয়ে নিয়তের ভিতরে গোলমাল বা ত্রুটি করে ফেলা। ঐ সকল ইবাদাতের মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার স্থলে সুনাম অর্জন, শ্রুতি অর্জন বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে কোন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য কিংবা লজ্জা ঢাকার জন্য ইবাদাত করা এগুলি সবই শির্কে আছগার বা ছোট শির্ক। কিন্তু কোন কোন ও কারো কারো ক্ষেত্রে এগুলিও বড় শির্কেও পরিণত হতে পারে।

কোন আমল বা ইবাদাতে এই শির্ক বিজড়িত হলে ঐ আমল ও ইবাদাত আর পূণ্যের কাজ হয়ে থাকে না। বরং তা শির্কের মত জঘণ্যতম পাপে রুপান্তরিত হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীছে কুদসীতে বলেছেন ঃ

من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه – رواه مسلم

যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে আমি তাকে ও তার শির্ককে পরিত্যাগ করবো। Ñ gymwjg|

লক্ষণীয় হাদীছের শেষে যেই আমলের মধ্যে শরীক করা হয় সেই আমলকে শির্ক বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য হাদীছে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك – (رواه أحمد)

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ছলাত আদায় করে সে (ছলাত নয়) শির্ক করে, যে লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখে সে শির্ক করে, যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য ছাদাকাহ করে সে শির্ক করে।

– হাদীছটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

এই ধরণের ছোট শির্ক থেকে রক্ষা পাওয়া বিরাট কঠিন ব্যাপার, যার জন্য রসূলুল্লাহ (সা.) ছাহাবাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، (رواه أحمد، والطبراني)

তোমাদের উপর সবচাইতে যে পাপটিকে ভয় করি সেটা হলো ছোট শির্ক, জিজ্ঞাসা করা হলো, তা কি? আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন আমল করা।

– হাদীছটি আহমাদ ও ত্ববারণী বর্ণনা করেছেন।

এই শির্ক থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে দু'আ করতেন এবং এর মাধ্যমে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন।

اللهم إنى أعوذبك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم (رواه ابن حبان)

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জেনে-শুনে শির্ক করা থেকে এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাই ঐ সব শির্ক থেকে যা আমি জানি না।

–ইবনু হিব্বান।

হজ্জ পালনের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন ঃ

اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، رواه البيهقى والضياء وهو صحيح

হে আল্লাহ আমাকে সেই হজ্জ করার তৌফিক দান কর, যার ভিতর কোন প্রকার রিয়া (লোক দেখানোর) বা সুমআহ (লোককে শুনানোর

প্রবণতা) না থাকে। হাদীছটি বায়হাকী ও আদ-দিয়া বর্ণনা করেছেন। আর তা ছহীহ।

এই আলোচনায় আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম যে, যারা হাজী বা আল-হাজ্জ উপাধি অর্জন করার জন্য কিংবা লোকের নিকট এই উপাধী দ্বারা ভালোর প্রতীক হওয়ার বা আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হজ্জ করে তাদের হজ্জ হয় না বরং তাদের অর্থ ও শ্রম সবই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। আল্লাহ আমাদের বিশুদ্ধ ও খাঁটি আমল করার তৌফিক দান করুন।

২। বাহ্যিক ছোট শির্ক ঃ আর তা কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমেই হতে পারে।

কথার মাধ্যমেঃ

যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা। যথা পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে কোন সম্মানীত বস্তু ও স্থান ইত্যাদির শপথ করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ، رواه أحمد وأبو داود

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর শপথ করে সে কুফরী বা শির্ক করে। –হাদীছটি আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

এমনিভাবে একথাও ছোট শির্কের অন্তর্ভূক্ত – আল্লাহ ও আপনি যদি চান তাহলে আমার একাজ হয়ে যাবে। হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে উদ্দেশ্য করে এক ব্যক্তি বলেছিল ঃ

ما شاء الله وشئت فقال: أجعلتني لله نداً' قل: ما شاء الله وحده، رواه النسائى

আল্লাহ ও আপনি যা চাইবেন– রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে,বরং তুমি বল একমাত্র আল্লাহ যা চাইবে। অবশ্য অন্য হাদীছে এই ধরণের কথা বাক–ভঙ্গির কিছু পরিবর্তন করে বলার বৈধতা এসেছে তা হচ্ছে واو এর পরিবর্তে ثم ব্যবহার করে। অর্থাৎ আলাহ অতঃপর আপনি চাইলে।

– আবু দাউদ এই মর্মে ছহীহ সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

কাজের মাধ্যমে এই ধরণের শির্ক চর্চা করা হয় ঃ

যেমন বিপদ বা রোগ মুক্তির জন্য তাবিজ-কবজ , লোহা ও তামার আংটি বা চুড়ি ও বালা ধারণ করা, তাগা বা সুতা ব্যবহার করা, এগুলো সবই শির্কের অন্তর্ভূক্ত। মানুষ তো দূরের কথা পশুতে ব্যবহার করলেও শির্ক হবে। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود

নিশ্চয় ঝাড়–ফুঁক, তাবিজ-কবজ, ও তিওলাহ (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য ক্রিয়া বিশেষ) শির্ক।

– হাদীছটি আহমাদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

তাওহীদী যে কোন কথা দ্বারা ঝাড়-ফুক করার বৈধতা অন্যান্য হাদীছেও পাওয়া যায়। (১) সুতরাং এই হাদীছে যেই ঝাড়–ফুঁককে শির্ক বলা হয়েছে তা উল্লেখিত ঝাড়–ফুঁক ব্যতীরেকে শেরেকী ও বিদআতী বাজে কথা দ্বারা ঝাড়–ফুঁক বুঝানো হয়েছে।

এমনিভাবে রোগ ও বিপদ মুক্তির জন্য তামার চুড়ি বা আংটি ব্যবহার করা শির্ক। এই মর্মে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও মুনযিরী। – তায়সীরুল আযীযুল হামীদ পৃঃ ১৫৬।

এমনিভাবে রোগ মুক্তির জন্য তাগা ও সুতা ব্যবহার করাও শির্ক। চাই তা মানুষের শরীরে ব্যবহার করা হোক, চাই কোন পশুর শরীরে। হাদীছটি বুখারী, মুসলিমে বর্ণনা করেছেন। – তায়সীর ১৬২ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত কাজগুলি লোক বিশেষে ও বিশ্বাস বিশেষে বড় শির্ক ও ছোট শির্ক উভয়টাই হতে পারে।

দুই ঃ ফরয ছলাত সহ অন্যান্য ফরয ইবাদাত ঠিকমত আদায় করতে হবে ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، (رواه مسلم)

মুসলিম ব্যক্তি ও কাফির মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো ছলাত পরিত্যাগ করা। – মুসলিম।

অন্য হাদীছে এসেছেঃ

العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، (رواه أحمد وأصحاب السنن)

আমাদের মাঝে ও তাদের (কাফির ও মুশরিকদের) মাঝে চুক্তি হলো ছলাত, যে তা পরিত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে। – হাদীছটি আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

যাকাত সম্পর্কে কুরআনে এসেছে ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ

আর মুশরিকদের জন্য ধ্বংস যারা যাকাত আদায় করে না।

–সূরা ফুছছিলাত ৬,৭।

তিন ঃ সকল প্রকার ইবাদাত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রদর্শিত নিয়ম অনুযায়ী বিশুদ্ধ হতে হবে ঃ

অর্থাৎ তিনি যেই আমল, যেই নিয়মে পালন বা আদায় করেছেন ঠিক তার অনুসরণ করে ঐ নিয়মে আদায় করতে হবে। অন্যথায় তা বিদআত বা বাত্বিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ *

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর (বিধি–বিধানের) অনুসরণ কর, এবং অনুসরণ কর তাঁর রাসূলের আর আমলগুলিকে বাত্বিল করো না।

–সূরা মুহাম্মাদ ৩৩।

এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ ৪টি আমল নষ্টকারী পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে বিষয়ের সাথে অধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ তাফসীর এইঃ

قال مقاتل : يقول الله تعالى: إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم، (تفسير القرطبي – 355/16)

মুক্বাতিল বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধাচরণ ও নাফারমানী করবে – (যা অনুসরণের বিপরীত) তখনি আমলসমূহ বাত্বিল করে দিবে।

Ñ Zvdmxi"j KyiZ¡yex 16/355 c„ôv|

তাবারীতেও পুর্বানুরূপ বা তার চেয়ে আরো স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে –

يقول الله تعالى ذكره ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فى أمرهما ونهيهما ولا تبطلوا أعمالكم بمعصيتكم إياهما

আল্লাহ বলেন হে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর তাঁদের আদেশ ও নিষেধে। খবরদার তাঁদের নাফরমানী তথা বিরুদ্ধাচরণ করে তোমাদের আমলগুলিকে ধ্বংস করে দিও না। Ñ 11-(26) 39 c„ôv|

অনুসরণ অর্থ হলো কথায়-কাজে অনুসরণীয়র সাথে মিল দেয়া, মিল না পড়লে তাকে অনুসরণ বলা যাবে না বরং তাকে বিরুদ্ধাচরণ বা নাফরমানী বলা হবে। আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) ক্ষেত্রে এমন আচরণ ইবাদাত ও আমল ধ্বংসকারী পাপ- যেমনটি উপরোক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল। সূরা হুজরাতের প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বর আয়াতেরও মর্ম তাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفى رواية من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (متفق عليه)

যে ব্যক্তি কোন আমল করল যা করার ব্যাপারে আ্মাদের কোন নির্দেশ নেই তা পরিত্যাজ্য। অন্য বর্ণনায় এসছে যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের ভিতর (দ্বীনের কাজ বা হাসানাহ নামে) নতুন কিছু আবিস্কার করবে যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। Ñ eyLvix I gymwjg|

তাই তো নবী (সা.) বলেছেন: صلوا كما رأيتمونى أصلى

তোমরা ঐভাবে ছলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে ছলাত আদায় করতে দেখ। ÑQnxn eyLvix|

এ জন্য হজ্জ পালন করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর অনুসরণে হজ্জ করার প্রতি তাকিদ দিয়ে সকলকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

خذوا عنى مناسككم (رواه مسلم)

তোমরা তোমাদের হজ্জের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন আমার থেকে গ্রহণ কর। –মুসলিম।

এ সুযোগে একটি কথা বলে রাখা ভাল, আর তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণের দু'টি দিক রয়েছে, একটি ইতিবাচক ও অপরটি নেতিবাচক।

ইতিবাচক অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আনুসাঙ্গিক ভাবে তাঁর ছাহাবাগণ যা করেছেন, বলেছেন ও সমর্থন করেছেন রাসূলূল্লাহ (সা.) এর সাথে খাছ প্রমাণিত বিষয়গুলি ব্যতীত আমরাও সেগুলি করবো, বলবো ও সমর্থন করবো। আর এই অনুসরণের রূপরেখা হল এই যে, কোনরূপ কম ও বেশী না করে যে কারণে যেভাবে যেস্থানে যে সংখ্যায় যে জাতীয় ইবাদাত বা আমল করতেন ও দু'আ কালাম পড়তেন আমরাও তাই করবো। উপরোক্ত দিকগুলির কোন একটি দিক থেকে অসতর্ক হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণ ক্ষুন্ন হবে। আর যখনই কোন ইবাদাত বা আমলে উপরোক্ত দিকগুলির একটিও বাদ পড়বে তখন তা ইবাদাত ও আমল না থেকে বিদআতে রুপান্তরিত হবে। যদিও তা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ছদাকাহ, দু'আ, যিকর ইত্যাদি হোক না কেন। উল্লেখ্য এ ধরণের অনুসরণের আওতায় যা পাওয়া যাবে তাই খাঁটি দ্বীন।

নেতিবাচক অনুসরণের অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আনুসঙ্গিক ভাবে তাঁর ছাহাবাগণ যা করেননি, বলেননি ও সমর্থন করেননি অথবা নিষেধ করেছেন তাঁদের অনুসরণ করে ঐ সকল বিষয়ের ধারে কাছে না যাওয়া। এই অনুসরণের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ছয়টি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এদিক গুলোর ব্যাখ্যা সামনে আসছে পৃষ্ঠা ১৪৯।

অনুসরণের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখলেও নেতিবাচক দিকসম্পর্কে আমাদের দেশে অধিকাংশ আলেমগণ একেবারে অজ্ঞান থাকার ফলশ্রুতিতে আজ মুসলিম সমাজে বিদআতের ছড়াছড়ি দেখা যায়।

চার ঃ ইসলাম বিনষ্ট ও ধ্বংসকারী পাপগুলি থেকে মুক্ত থাকতে হবে

নামায, ওজু, রোজা ও বিবাহ ভঙ্গের যেমন ব্যতিক্রমধর্মী নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, তেমনি ইসলাম ভঙ্গেরও কারণ রয়েছে। যে কোন বিষয়ের অস্তিত্ব লাভের যেমন উপায় ও কারণ থাকে তেমনি তার বিলুপ্ত হওয়ারও কারণ থাকে।

ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলিকে পাপ বলে আখ্যা দেয়াই যুক্তিসঙ্গত। আমরা যদি কুরআন ও হাদীছ তন্নতন্ন করে তালাশ করি তবে এ ধরণের ১০টি (দশ) পাপের সন্ধান পাই।

نواقض الإسلام العشرة

ইসলাম ভঙ্গের পাপগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। আল্লাহর প্রভূত্ব, দাসত্ব এবং নাম ও গুণাবলীল ক্ষেত্রে অন্য কিছুকে শরীক মনে করা।

২। আলাহ্ ও বান্দার মাঝে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মাধ্যমরূপে খাড়া করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য তার ইবাদত করা।

৩। কাফির ও মুশরিকদের কাফির মনে না করা কিংবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করা। তাদের ধর্মকে সঠিক বলে মন্তব্য করা তাদের কাফির মনে না করারই শামিল।

৪। রাসূলুলাহ্ (সা.)এর হিদায়াত ও নির্দেশনা অপেক্ষা অন্যের নির্দেশনা পরিপূর্ণ বা তাঁর ফায়সালা ও বিধান অপেক্ষা অন্যের বিধান উৎকৃষ্ট বলে বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহদ্রোহীদের শাসনকে উত্তম মনে করা।

৫। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ও সমর্থিত কোন বস্তুকে ঘৃণা করা, এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ফরয-নফলের কোন ভেদাভেদ নেই।

৬। ইসলামের কোন বিষয়কে নিয়ে বিদ্রুপ বা ঠাট্টা করা।

৭। যাদু টোনা চর্চা করা বা তার আশ্রয় গ্রহণ করা।

৮। মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা।

৯। এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, কোন ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শরীয়তের বহির্ভূত জীবন-যাপন সিদ্ধ যেমনটি সিদ্ধ ছিল খিজর (আ.) এর জন্য মুসার শরীয়তের বহির্ভূত থাকা।

১০। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া। আর তার পরিচয় হলো তা সম্পর্কে না জানা এবং তা অনুযায়ী আমল না করা।

এগুলির বিশদ ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

পাঁচ ঃ সকল প্রকার ইবাদাত ছহীহ ও গ্রহণীয় হওয়ার জন্য শর্ত হলোঃ

সর্বক্ষেত্রে হালাল সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই হালাল মালের হতে হবে। ব্যবসায় ঠকানো, চুরি-ডাকাতি, আত্মসাৎ, সুদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, যুলুম–শোষণ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দ্বারা হজ্জ করা হলে তা ছহীহ ও গৃহীত হবে না। শুধু হজ্জই নয় কোন ইবাদতই কবুল হবে না, বিশেষভাবে দুআ। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.)এর হাদীছ পড়ুনঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمربه المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم، (سورة المؤمنون – 51) وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم' (سورة البقرة - 172) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ (رواه مسلم والترمذي)

রাসূলুলাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু পছন্দ করেন না, আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যেই নির্দেশ রাসূলগনকে দিয়েছেন–তিনি বলেছেন রাসূলগণ তোমরা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ কর এবং সৎ আমল কর, তোমরা যা আমল কর তার সম্পর্কে নিশ্চয় আমি অতি জ্ঞানবান। –সূরা মু'মিনুন–৫১। আরো বলেছেন : হে মুমিনগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত পবিত্র রিযিক ভক্ষণ কর।– সূরা বাকারাহ–১৭২। অতঃপর এমন ব্যক্তির (উদাহরণ) উল্লেখ করলেন, যে ব্যক্তি (হজ্জ, উমরাহ পালনের লক্ষ্যে সফর করে) বিক্ষিপ্ত কেশে ধুলা-বালি মিশ্রিত অবস্থায় আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি বলে দু'আ করে, অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারা প্রতিপালিত; এমতাবস্থায় কি করে এই লোকের দু'আ গৃহীত হতে পারে?

– হাদীছটি মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় – (ثانيا) : এমন শর্ত যা পুরণ না করলে ইবাদাত বা আমল গ্রহণীয়, কিন্তু তার কার্যকরীতা বা বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা হয়। আর তা হচ্ছে **ঋণ**। মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

হজ্জে গমণেচ্ছু ব্যক্তির জন্য বাড়ী থেকে বের হওয়ার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। জীবদ্দশায় সুযোগ না পেলে ও মাল থাকলে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে পরিশোধের দায়িত্ব দিয়ে যাবে এবং ঋণ দাতার সাথেও বুঝা-পড়া করে নিবে। যদি হজ্জের জন্য সম্পদ খরচ করে ফেললে ঋণ পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব মনে হয় তবে সেই ব্যক্তির জন্য হজ্জ ফরয নয় এবং এমতাবস্থায় তার হজ্জে যাওয়াও উচিত নয়। ঋণ এমনই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, এর জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেও তা মাফ হয় না। হাদীছে এসেছে শহীদ ব্যক্তির শরীর থেকে প্রথম ফোটা রক্ত নির্গত হওয়ার সাথে সাথে তার জীবনের সমস্ত পাপ মাফ (মোচন) হয়ে যায়, কিন্তু ঋণ মোচন হয় না। Ñ Avng`, wZiwghx I Beby gvRvn|

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ

يغفر الله للشهيد كل شيئ إلا الدين، وفى رواية : القتل فى سبيل الله يكفر كل شيئ إلا الدين – (رواه مسلم)

আলাহ শহীদ ব্যক্তির সমস্ত পাপরাশি মোচন করে দেন শুধু মাত্র ঋণ ছাড়া, অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেয় শুধুমাত্র ঋণ ছাড়া। – মুসলিম|

একটি হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি মনে করেন যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তাহলে আমার পাপসমূহ মোচন করা হবে?

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأنت صابر ومحتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لى ذلك – (رواه مسلم)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, পুণ্যাকাংখী, অগ্রগামী হও, পিছ পাঁ না হও, কিন্তু ঋণ ব্যতীত, কারণ জিব্রীল (আ.) এ কথা বলে গেলেন। –মুসলিম।

তৃতীয় (ثالثا) ঃ এমন শর্ত যা পূরণ না করলে ইবাদাত ও আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে বাধা বা অন্তরায় নয়, কিন্তু পুরণ না করার কারণে গৃহীত আমল ও ইবাদাত বিয়োগ বা ঘাটতি হতে হতে অবশিষ্ট নাও থাকতে পারে। আর তা হচ্ছে এই যে, কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে থাকলে,

তার হক্ব নষ্ট করে থাকলে, তার উপর কোন যুলুম অত্যাচার করে থাকলে, তাকে অপমান করে থাকলে, যে কোন মূল্যে তাকে রাযী-খুশী করে তার দাবীদাবা থেকে মুক্ত হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيئ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمة وإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه – (رواه البخارى)

কারো উপর যদি তার ভাই কর্তৃক ইযযত বা অন্য কোন ব্যাপারে অত্যাচারের অভিযোগ থাকে তবে সে যেন আজই তার নিকট থেকে মুক্ত হয়ে যায় সেই দিনের পূর্বে যে দিন দীনার দিরহাম (পয়সা কড়ি) কিছুই থাকবে না। তার কোন সৎ আমল থাকলে অত্যাচারের পরিমাণ হিসাবে সেই আমল থেকে নেয়া হবে। আর যদি সৎ আমল না থাকে তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর পাপারাশি উঠিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। –বুখারী।

অন্য হাদীছে এসেছে ঃ

إن رسول الله قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من امتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار– (رواه مسلم)

রাসূলুলাহ (সা.) একদিন ছাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব কে? তাঁরা বললেন, আমাদের মাঝে তো নিঃস্ব সেই যার দিরহাম (টাকা পয়সা) নেই, কোন সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন– আমার উম্মতের ভিতর ঐ ব্যক্তি নিঃস্ব যে, কেয়ামতের দিন নামায, রোযা, ও যাকাতের মত আমল নিয়ে আসবে কিন্তু আসবে এমতাবস্থায় যে, (দুনিয়াতে) কাকে গালি দিয়েছিল, কাকে অপবাদ দিয়েছিল, কার মাল অন্যায়ভাবে খেয়েছিল, কার রক্তপাত করেছিল, কাকে প্রহার করেছিল, অতঃপর তার নেকীসমূহ থেকে একে দেয়া হবে, ওকে দেয়া হবে। যদি সকলকে পরিশোধ করার পূর্বে তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে অবশিষ্ট অভিযোগকারীদের পাপগুলি নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সেই পাপের কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। – মুসলিম।

الإيمان بأسماء الله وصفاته – وهو توحيد الأسماء والصفات

৪ । আলাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান:

এটাই হলো توحيد الاسماء والصفات তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে নিজের জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন কিংবা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) হাদীছে সাব্যস্ত করেছেন তা ঠিক ঐভাবে অবিকৃতভাবে, বিলুপ্তি ও বিকৃতি না ঘটিয়ে উপমাহীনভাবে সাব্যস্ত করা। এবং তাতে কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করা। এমনিভাবে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন সে সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ * ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

বলুন সেই আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি জনক নন, জাতও নন, আর কেউই তার সমকক্ষ নয়। – সূরা ইখলাস।

আল্লাহ আরো বলেন:

وَلِلَّهِ ٱلأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيۤ أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

আল্লাহ অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সেগুলির অসীলায় তাকে আহবান কর। আর পরিত্যাগ কর ওদেরকে যারা তার নামের বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা করেছে। অচিরেই তারা তাদের এই কর্মের ফল ভোগ করবে।
– সূরা আ'রাফ ১৮০।

وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

আর আল্লাহর জন্যই সুমহান দৃষ্টান্ত রয়েছে আর তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। – সূরা নাহ্ল ৬০।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

তার অনুরূপ কোন কিছুই নয় আর তিনি অতি শ্রবণকারী ও দর্শণকারী। – সূরা শুরা ১১।

الكلمة المهة حول أسماء الله وصفاته

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর জরুরী আলোচনা :

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে। জাহমিয়া সম্প্রদায় যারা জাহম বিন ছফওয়ানের অনুসারী তাদের আক্বীদাহ হলো الحي চিরঞ্জীব القيوم চিরস্থায়ী বা সর্বনিয়ন্ত্রক। এই দু'টি নাম ও গুণ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করা। এরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সকল ওলামাদের মতে কাফির।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আক্বীদাহ হলো। আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে কিন্তু গুণাবলী বলতে কিছু নেই। তাদের এই আক্বীদাহ অনুযায়ী الحي হাইইয়ু, এটা আলাহর নাম। তিনি জীবন বিশিষ্ট তা নয়। العليم আলীম আলাহর নাম, তিনি মহাজ্ঞানী তা নয়। السميع সামী' আলাহর নাম, শ্রবণকারী নয়। القدير ক্বাদীর আলাহর নাম, মহা শক্তিশালী বা ক্ষমতাবান তা নয়। البصير বাসীর আলাহর নাম, অতি শ্রবণকারী নন। এইভাবে সমস্ত নামের ব্যাপারে বলে থাকে।

এই দুই আক্বীদার মাঝামাঝি আরো দু'টি দল রয়েছে أشاعرة ও ماتريدية আশাইরাহ ও মাতুরিদিয়াহ নামে। তাদের ভিতর অনেক যোগ্য যোগ্য আলিমও আবির্ভাব হয়েছে। তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সব স্বীকার করে কিন্তু সেগুলি তা'বীল বা অপব্যাখ্যা করে। যেমন তারা বলে থাকে আল্লাহর মুহাব্বত অর্থ দান, তার নযর দৃষ্টি অর্থ রহমত। আল্লাহর হাত অর্থ তার কুদরত বা নেআমাত করে থাকে। শেষ রাত্রে বা এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা অর্থ আল্লাহর রহমত প্রেরণ করা বুঝায়। এ সমস্ত অপব্যাখ্যার কারণই হলো এই যে, তাদের নিকট আল্লাহর কোন সত্তা বা আকার আকৃতি নেই, আর ঐ সমস্ত গুণাবলীর নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর একটা নির্দিষ্ট আকার আকৃতি বুঝা যায়। আর এক সম্প্রদায় এ সমস্ত গুণাবলীর তুলনা ও উপমা সাব্যস্ত করে। এদেরকে মুশাব্বিহাহ বলা হয়।

খাঁটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট আল্লাহর নামগুলি যেমন তাঁর সত্তার প্রতি নির্দেশ করে তেমনি তাঁর গুণাবলীর প্রতিও নির্দেশ করে।

কোন অপব্যাখ্যা, তুলনা, উপমা ও ধরণ-পদ্ধতি সাব্যস্ত করা ছাড়া, ঠিক যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) বলেছেন ঐভাবে সাব্যস্ত করাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহ ।

আল্লাহর গুণাবলী দু'ভাগে বিভক্তঃ সিফাত ফে'লী সিফাতে যাতি ।

প্রথমঃ সিফাতে ফে'লী অর্থাৎ কার্যগত গুণ । তিনি কি কি করেন ও কি কি করেন না এগুলো যে সমস্ত গুণ দ্বারা বুঝা যায় তাকে সিফাতে ফে'লী বলা হয় । এগুলোও দু'প্রকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক ।

(ক) ইতিবাচক ফে'লী সিফাতঃ অর্থাৎ যে সমস্ত গুণের মাধ্যমে কিছু করা বুঝায় ।

১ । আল্লাহ কথা বলেনঃ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً

আর আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন । – সূরা নিসা-১৬৪ ।

সূরা আ'রাফের ১৪২/১৪৩ নম্বর আয়াতে ঘটনা উল্লেখপূর্বক আল্লাহর মুসার সাথে সরাসরি কথা বলার উল্লেখ এসেছে ।

২ । আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেনঃ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তাই করেন । – সূরা হাজ্জ ১৪ ।

তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে শুধু কুন كن শব্দ বললেই তা হয়ে যায় ঃ إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

তার কাজতো এভাবেই সম্পাদিত হয়- যখন কোন জিনিস করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন কুন, তখনই হয়ে যায় । – সূরা ইয়াসীন ৮২ ।

৩ । আরশের উপর সমুন্নত হওয়া,

অর্থাৎ আরশের উপর অবস্থান করা

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ যিনি আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে । অত:পর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন ।
–সূরা আ'রাফ ৫৪ ।

এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন সূরায় এসেছে, দেখুন সূরা ইউনুস-৩, সূরা রা'দ-২, সূরা সিজদাহ-৪, সূরা হাদীদ-৪, সূরা ত্ব-হা-৫ আয়াতসমূহ ।

অন্যান্য আয়াতে পরোক্ষভাবে এসেছে আল্লাহ আসমানে আছেন। সূরা মূলকে আল্লাহ বলেছেন:

أَأَمِنتُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُمْ من فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

তোমরা কি নিরাপদ ঐ সত্ত্বা হতে যিনি আসমানে রয়েছেন। তিনি তো তোমাদের সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন ফলে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা কি নিরাপদ সেই সত্ত্বা হতে যিনি আসমানে রয়েছেন, তিনি তোমাদের উপর শিলাময় ঝটিকা প্রেরণ করতে পারেন। অত:পর বুঝবে কেমন তার ভীতি প্রদর্শন। – সূরা মুলক ১৬ ও ১৭।

এই আয়াতেও পরোক্ষভাবে আল্লাহর আরশে থাকা বুঝানো হয়েছে, কারণ আরশ হলো সপ্তাকাশের উপর। আর আরশের উপর আল্লাহ তাআলা সমুন্নত।

এ সমস্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যারা বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান রয়েছেন কিংবা আল্লাহ মু'মিন বান্দার কলবের ভিতর রয়েছেন তারা নিতান্ত ভুল ও ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত। আল্লাহ তা'আলা সেই আসমান বা আরশ থেকে সমস্ত কার্য পরিচালনা ও সমস্ত কিছু দেখাশুনা করে থাকেন। আল্লাহ বলেন:

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ من دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ * يُدَبِرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ

আল্লাহ সেই সত্ত্বা যিনি আসমান সমূহ ও যমীন এবং এতদোভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি ছাড়া কেউ তো তোমাদের অবিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনিই আসমান থেকে যমীনের সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। – সূরা সিজদাহ ৪ ও ৫ নম্বর আয়াত।

এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী বান্দাদেরকে দেখা শুনা ও বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার আসমানের উপর থেকেই করে থাকেন। এর জন্য আল্লাহর সত্তাগত ভাবে বান্দার সাথে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত আয়াতে

আল্লাহর বান্দার সাথে থাকার কথা উল্লেখ এসেছে উপরোক্ত কথাগুলিই হলো সঠিক ব্যাখ্যা ।

আল্লাহর সঙ্গে থাকা দুই প্রকারঃ

১। সাধারণ সঙ্গঃ আয়ত্ত, জ্ঞান, ক্ষমতা, পরিচালনা ও কর্তৃত্বের দিক দিয়ে মু'মিন, কাফির, ফাসিক, ফাজির সবার সঙ্গেই রয়েছেন ।

মুমিনদের জন্য এই প্রকার সাথে থাকা আল্লাহকে সর্বক্ষণ হাজির নাজির জানা অনিবার্য করে। নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ উত্তম ঈমান হলো এই জ্ঞান করা যে, তুমি যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমার সাথেই রয়েছেন । এই প্রকারের উদারহণ স্বরূপ আল্লাহর বাণীঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে যেখানেই থাক না কেন? আর আল্লাহ দেখে থাকেন যা তোমরা কর । – সূরা হাদীদ ৪ ।

২। খাছ বা বিশেষ ধরণের সঙ্গে থাকা : যার দাবী হলো মু'মিনদের সাহায্য সহযোগীতা করা। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন । – সূরা বাক্বারাহ ১৫৩ ।

এমনিভাবে কুরব قرب ও مع মাআ দিয়ে যেখানেই মু'মিনদের সঙ্গে বা নিকটে থাকা বোঝানো হয়েছে একই ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য ।

আল্লাহর বান্দার قرب কুরব ও مع মাআ'র অর্থ হলো শ্রবণ, দর্শণ ও মহযোগিতার মাধ্যমে পার্শ্বে বা সহযোগীতার মাধ্যমে সাথে থাকা যা আরশ থেকেই সম্পাদন করে থাকেন। একথা মহান আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেনঃ

قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

আল্লাহ বলেন; তোমরা দু'জন (মুসা ও হারুন) ভয় পেওনা। নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, শ্রবণ করব ও দেখবো । – সূরা ত্বহা ৪৬ ।

অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গে রয়েছি শ্রবণ ও দর্শণের মাধ্যমে, স্বশরীরে নয় । যেমন তথাকথিত অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করমূলক কিছু বোকা পণ্ডিতেরা বলে থাকেন । আল্লাহ তাদের সঠিক জ্ঞান ও হিদায়াত দান করুন ।

কখনো কখনো নিযুক্ত ফিরিশতাদের মাধ্যমে সাথে থাকাও বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ* إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

আর আমরা তার ঘাড়ের ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। যখন দুই ফিরিশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।

– সূরা ক্বফ: ১৬: ১৮।

৩। প্রতি রাত্রে মধ্যরাতে বা শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহর যমীনস্থ আসমানে নেমে আসা :

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন:

ينزل الله عزوجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعونى فاستجيب له؟ ومن يسألنى فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفرله

রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তাআ'লা দুনিযার নিকটস্থ আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন কে আমার নিকট দু'আ করবে আমি তাঁর দু'আ কবুল করব? কে আমার নিকট কিছু চাও আমি তাকে দান করব? কে আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট অবতীর্ণ বা নেমে আসার বলতে যা বুঝায় তা-ই। কিন্তু কিভাবে আসেন এটা প্রশ্নও করা যাবে না এবং বলাও যাবে না বরং বলতে হবে যেভাবে তার শানে (ক্ষেত্রে) প্রযোজ্য হয় ঐভাবে।

৪। আল্লাহ দেখেন, শ্রবণ করেন, ও সব কিছুই জানেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّـهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

আলাহর আশ্রয় কামনা কর নিশ্চয় তিনি অতি শ্রবণকারী ও দর্শণকারী। – সুরা গাফির ৫৬।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

তার সাদৃশ কোন কিছুই নেই, অথচ তিনি অতি শ্রবণকারী ও দর্শণকারী।   – সুরা শুরা ১।

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ

সে কি জানেনা যে অবশ্যই আল্লাহ দেখেন।   – সূরা আলাক- ১৪।

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

আল্লাহ শুনে নিয়েছেন ঐ মহিলার কথা যে তোমার সাথে বিতর্ক করতেছে তার স্বামীর ব্যাপারে এবং আল্লাহর নিকট তাঁর সমস্যা তুলে ধরছে, আর আল্লাহ তোমাদের উভয়েরই বাক বিতণ্ডা শ্রবণ করেছেন। নিশ্চয় আলাহ অতি শ্রবণকারী ও দর্শণকারী।   – সূরা মুজাদালাহ- ১।

أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت تبارك الذى وسع سمعه كل شيئ إني لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهى تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أكل شبابى ونثرت له بطنى حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدي ظاهرمنى' اللهم إنى أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهولاء الكلمات (قد سمع الله قول التى تجادلك --- وتشتكى إلى الله) (لباب النقول في أسباب النزول 275)

ইমাম হাকিম ছহীহ বলে উদ্ধৃত করেছেন। আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বরকতময় তিনি যার শ্রবণশক্তি সকল কিছুকে শামিল করে। আমি খাওলাহ বিনতু ছা'লাবাহর কিছু কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। আর কিছু পাচ্ছিলাম না। নবী (ছঃ) এর নিকট সে তার স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করছিল এবং বলছিল: হে আল্লাহর রসূল সেআমার যৌবন শেষ করে দিয়েছে অর্থাৎ যা সন্তান হবার ছিল হয়ে গেছে। এখন আমার বয়স ভারী হয়ে গেছে, সন্তান হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় সে আমার সাথে যিহার করল। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভিযোগ পেশ করছি। ইত্যবসরে জিবরীল (আঃ) এসব শব্দাবলী তথা "ক্বদ সামিআলাহ".... আয়াতগুলো নিয়ে নাযিল হলেন।

– দেখুন লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবিন নুযুল পৃঃ ২৭৫।

{খ} নেতিবাচক গুণাবলী:

১। আল্লাহ ঘুমান না, বা তন্দ্রাচ্ছন্নও হন নাঃ

ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, তন্দ্রা ও ঘুম তাকে স্পর্শ করে না। – সূরা বাকারাহ ২৫৫।

২। তার জন্য কোন কিছুই ভারী বা কঠিন নয়ঃ

وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

তার (আসমান যমীনের) হিফাযাত করা তার জন্য কঠিন বা ভারী নয়।

৩। তিনি ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত হননা

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ

আমি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ে যা কিছু রয়েছে সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে তাতে আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। – সূরা ক্বাফ ৩৮।

৪। তিনি কারো উপর যুলুম বা অত্যাচার করেন নাঃ

وَمَآ أَنَاْ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ

আমি বান্দার উপর সামান্যতম জুলুম করি না। –সূরা ক্বফ ২৯।

৫। তিনি কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেন নি এবং তিনি কাউকে জন্ম দেন নি বা কাউকে সন্তান রূপে গ্রহণ করেন নি। তার কোন শরীক বা সঙ্গী নেই। তার সমকক্ষ কেউ নেই।

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ * ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

বলুন সেই আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি জনক নন জাতও নন। আর তার কোন সমকক্ষ নেই। – সূরা ইখলাস।

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً

বলুন সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি কোন সন্তানগ্রহণ করেননি, রাজত্বে তার কোন শরীক নেই, অপারগ হেতু তার কোন সহযোগীও নেই। অতএব তার মহানত্ব বর্ণনা কর। – সূরা ইসরা ১১১।

দ্বিতীয়ত: সিফাতে যাতী অর্থাৎ আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলী:

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাতের (সত্তার) বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা যেভাবে কুরআনে ও হাদীছে সাব্যস্ত হয়েছে ঐভাবে সাব্যস্ত করাই হলো আল্লাহর যাতের উপর ঈমান।

তার কোন রূপ অপব্যাখ্যা, ধরণ, উপমা ও তুলনা না করা। আলাহর যাতের ক্ষেত্রে যেমন হওয়া উচিত ঐভাবে আছে বিশ্বাস করা।

১। আল্লাহর যাতের (সত্তার) অস্তিত্বের প্রমাণ:

নবী (ছঃ) এর হাদীছ :

لم يكذب ابراهيم قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله : إنى سقيم' وقوله: بل فعله كبيرهم هذا' وواحد في شأن سارة: إنك اختى - متفق عليه

ইব্রাহীম (আ.) তিনটি মিথ্যা কথা ছাড়া আর কখনো কোন মিথ্যা কথা বলেননি। দু'টি বলেছিলেন আল্লাহর যাতের উদ্দেশ্যে। বলেছিলেন, আমি অসুস্থ, আর অপরটি ছিল: বরং এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের বড়জন। আর একটি তার স্ত্রী সারাহকে কেন্দ্র করে–তুমি আমার বোন। – বোখারী ও মুসলিম।

সাহাবী খুবাইবের কবিতা

ولست ابالى حين أقتل مسلما * على أي جنب كان فى الله مصرعي

وذلك فى ذات الاله وإن يشأ * يبارك فى أوصال شلو ممزع

যখন আমি মুসলিম অবস্থায় নিহত হচ্ছি

তখন আমার কোন পরোয়া নেই

যে কাত হয়েই পড়ুক না কেন আমার লাশ,

এ নিহত তো উপাস্যের যাতকে কেন্দ্র করেই,

তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন

অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বরকত দিতে পারেন।

– ছহীহ বোখারী।

عن ابن عباس قال: تفكروا فى كل شيئ ولا تفكروا فى ذات الله

(كتاب الأسماء والصفات ص 360)

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে চিন্তা ফিকির কর, কিন্তু আল্লাহর যাতের (সত্তার) ব্যাপারে চিন্তা করো না ।
– কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাক্বী প্রণীত ৩৬০ পৃ: ।

২ । আল্লাহর নফস বা অন্তর রয়েছে তার প্রমাণ:

যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.)কে প্রশ্ন করবেন তুমি কি মানুষকে (খ্রীষ্টানদেরকে) তোমার ও তোমার মাতার ইবাদত করতে বলেছিলে? উত্তরে তিনি বলবেন:

إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ ٱلْغُيُوبِ

যদি আমি বলে থাকি তবেতো আপনি জানেন, আপনি তো আমার অন্তরে যা রয়েছে তাও জানেন কিন্তু আপনার অন্তরে যা রয়েছে তা আমি জানি না, আপনিই গায়েব সম্পর্কে অধিক জানেন । – সূরা মায়েদাহ ১১৬ ।

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عزوجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ....

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পার্শ্বে রয়েছি । যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে থাকি । যদি সে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি, আর যদি সে আমাকে কোন দলের ভিতর স্মরণ করে আমিও তাকে তার চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে স্মরণ করি । –বুখারী ও মুসলিম ।

৩ । আল্লাহর নির্দিষ্ট আকার আকৃতি আছে তার প্রমাণ:

يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر' ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك' هذا مكاننا حتي يأتى ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة (وفي رواية : في صورته) التى يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا - رواه البخارى 453/11 رقم 6573 وفضل السجود بدون ذكر الصورة، كتاب التوحيد 430/13، الرقم 7437، 7439)

কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, বলা হবে যে যার ইবাদত করতে তার অনুসরণ কর। ফলে যারা সুর্যের পুজা করত তারা সূর্যের অনুসরণ করবে, আর যারা চন্দ্রের পুজা করত তারা চন্দ্রের অনুসরণ করবে। যারা ত্বাগুতসমূহের ইবাদত করতো তারা তাদের অনুসরণ করবে। অত:পর আল্লাহর ইবাদতকারীরা অবশিষ্ট থাকবে তাদের মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় আকৃতি ব্যতীত অন্য আকৃতিতে তাদের নিকট আসবেন যা তারা চিনে না অত:পর বলবেন আমি তোমাদের প্রতিপালক, মু'মিনগণ বলবেন আপনার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আমরা এখানেই অবস্থান করব, আমাদের প্রতিপালক না আসা পর্যন্ত। যখন আমাদের রব আসবেন তখন আমরা তাঁকে চিনে নিবো। অত:পর আল্লাহ তাঁর স্বীয় আকৃতিতে আসবেন যেটা তাদের নিকট পরিচিত। অত:পর বলবেন আমি তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রতিপালক। – বুখারী, হাদীছ নং ৬৫৭৩, ৭৫৩৭,৭৪৩৯।

৪। আল্লাহর চেহারা রয়েছে তার প্রমাণ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ

আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু আপনার প্রতিপালকের সম্মানীত চেহারা।

– সূরা রহমান ২৭।

وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهاً آخَرَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আল্লাহর সাথে আর কাউকে উপাস্য হিসাবে ডেক না, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সব কিছু ধ্বংসশীল একমাত্র তাঁর চেহারা ব্যতীত, তারই জন্য বিধান প্রনয়ণের অধিকার সংরক্ষিত। তার নিকটই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। – সূরা ক্বাছাছ ৮৮।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عزوجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن

দু'টি রৌপ্য নির্মিত জান্নাত রয়েছে যার পাত্র ও অভ্যন্তরীণ বস্তুও রৌপ্য নির্মিত। আর দু'টি জান্নাত স্বর্ণনির্মিত রয়েছে যার পাত্র ও আভ্যন্তরীণ বস্তুও স্বর্ণনির্মিত। আদন জান্নাতে মু'মিন সম্প্রদায় ও তাদের প্রতিপালকের দর্শনের মাঝে শুধু বিদ্যমান থাকবে তাঁর চেহারার উপর অহঙ্কারের চাদর।

عن عمار بن ياسر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه ... وازقنى لذة النظر إلى وجهك (كتاب الاسماء والصفات 388 للبيهقي)

আম্মার বিন ইয়াসির হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (সা.) তার দু'আর মাঝে একথা বলতেন: হে আল্লাহ আপনার চেহারা দর্শনের স্বাদ লাভ করার ভাগ্য নসীব করিও। – কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত (৩৩৮)।

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينبغى لأحد أن يسأل بوجه الله شيئا إلا الجنة (أخرجه أبوداود والبيهقي فى الاسماء والصفات)

জাবের (রা.) বলেন আল্লাহর নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন: কারো জন্য আদৌ উচিত নয় আল্লাহর চেহারার অসীলায় জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া।

– আবু দাউদ ও বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত।

৫। আল্লাহর চক্ষু আছে তার প্রমাণ:

আল্লাহ বলেন: وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مني وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ

আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার উপর মুহাব্বত দান করেছিলাম আর যাতে তুমি আমার দৃষ্টিগোচরে পালিত হও। – সূরা ত্বহা ৩৯।

وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

আর তুমি নৌকা বানাও, আমাদের চোখের সামনে ও অহীর নির্দেশ অনুযায়ী আর যারা অত্যাচারী তাদের ব্যাপারে আমাকে সম্বোধন করে কিছু বলনা, নিশ্চয় তারা ডুবে ধ্বংস হবে। – সূরা হুদ ৩৭।

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

আর আপনি আপনার প্রতিপালকের বিধানের উপর অবিচল থাকুন, কারণ আপনি তো আমাদের চক্ষুগোচরেই রয়েছেন। – সূরা তুর ৪৮।

আলাহর রাসুল (সা.) আলাহ হওয়ার দাবীদার দাজ্জাল ও আলাহর মাঝে একটা মোটা পার্থক্যের সংবাদ দিয়ে গেছেন এই বলে:

إن الله ليس بأعور إلا ان المسيح الدجال أعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية (رواه البخاري)

আলাহ অন্ধ নন, কিন্তু মসীহুদ দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ হবে, তার (অন্ধ) চক্ষুটা সামনের দিকে আঙ্গুরের মত বেড়ে থাকবে। – বুখারী।

৬। আলাহর হাত আছে তার প্রমাণ;

কুরআন ও হাদীছে কখনো এক বচনে কখনো দ্বিবচনে অর্থাৎ কখনো একহাত কখনো দুই হাতের উল্লেখ এসেছে। আবার কখনও ডান হাত ও বাম হাতের কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন– ৭নং উপশিরোনামে রয়েছে।

এক হাতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বরকতময় সেই সত্ত্বা যার হাতে রয়েছে সমগ্র রাজ্য আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। – সূরা মুলক ১।

দু’ হাতের উল্লেখ : আল্লাহ বলেন :

يَٰإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

এই ইবলীস! কোন বস্তু তোকে বাধা দিল তাকে সিজদা করা থেকে যাকে আমি আমার দু’হাত দিয়ে তৈরী করেছি। – সূরা হুদ ৭৫।

অন্যত্র বলেছেন:

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ

আর ইয়াহুদরা বলেছিল আল্লাহর হাত গুটানো রয়েছে, তাদের হাত গুটিয়ে যাক। এ কথার জন্য তাদের উপর অভিশম্পাত করা হয়েছে, বরং আল্লাহর দু’খানা হাতই প্রসারিত যেভাবে ইচ্ছা খরচ করেন। – মায়িদাহ ৬৪।

রাসুলুলাহ (সা.) বলেছেন: কিয়ামতের দিন যখন মানুষ দুর্বিষহ মর্মান্তিক অবস্থায় পড়বে তখন সমস্ত মানুষ সেই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সুপারিশকারীর মাধ্যম খুঁজে রেড়াবে, সর্বপ্রথম আদম (আ.) এর নিকট আসবে

فياتون آدم فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا.... (رواه البخاري ومسلم)

তারা বলবে আপনি আদম আপনাকে আল্লাহ নিজের হাতে তৈরী করে ফিরিশ্তাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন ও সমস্ত কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন। অতএব আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন, যাতে আমাদেরকে এই মর্মান্তিক অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেন। – বোখারী ও মুসলিম।

৭। আল্লাহর হাতের মুঠো ও পাঞ্জা রয়েছে তার প্রমাণ:

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আর তারা আল্লাহর যথা যোগ্য মর্যাদা দান করেনি। কিয়ামতের দিন সমগ্র যমীন তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে, আর আসমানসমূহ পল্টানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। তিনি অতি পাক পবিত্র এবং শরীক কারীদের শরীক হতে অনেক উর্ধ্বে। – সূরা যুমার ৬৭।

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري

আবু হুরাইরা (রা.) আল্লাহর নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যমীনকে মুঠোর মধ্যে ধারণ করবেন এবং আসমানকে পল্টিয়ে ডান হাতে ধরবেন অত:পর বলবেন: আমি বাদশা কোথায় যমীনের বাদশারা। – বোখারী।

মুসলিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে:

يطوي الله السموات يوم القيامة : ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين يأخذهن- قال ابن العلاء- بيده الأخرى وفى رواية يطوى الأرضين بشماله ثم يقول: انا الملك أين الجبارون

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমান সমূহকে পল্টাবেন অতঃপর তার ডান হাতে ধারণ করবেন অতঃপর বলবেন আমিই একমাত্র বাদশাহ। কোথায় দুনিয়ার প্রতাপশালীরা? কোথায় অহংকারকারীরা? অতঃপর

যমীনকেও পল্টাবেন এবং অন্য হস্তে তথা বাম হস্তে পল্টানো অবস্থায় ধারণ করে বলবেন: আমি একমাত্র বাদশাহ। কোথায় প্রতাপশালীরা।

৮। আল্লাহর আঙ্গুল রয়েছে তার প্রমাণ:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا ابا القاسم أبلغك أن الله عزوجل يحمل السموات على أصبع والأرضين على اصبع والشجر على أصبع والثرى على اصبع والخلائق على اصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه' وأنزل الله وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه (رواه مسلم)

আব্দুল্লাহিবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদিন আহলুল কিতাবের (ইহুদী) একজন লোক নবী (সা.) এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আপনি কি জানেন আল্লাহ (কেয়ামতের দিন) আসমানসমূহ এক আঙ্গুলের উপর ওঠাবেন ও যমীনসমূহকে অন্য আঙ্গুলে, গাছপালা এক আঙ্গুলের উপর যমীনের নিম্নের জগত (পাতাল) এক আঙ্গুলের উপর এবং সমস্ত মাখলুকাত এক আঙ্গুলের উপর? লোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) হেসে দিয়েছিলেন:যাতে তার দুই পার্শ্বস্থ দাতগুলি বিকশিত হয়ে গিয়েছিল। আর এ কারণেই অমা-ক্বদারুল্লাহ.... আয়াত অবতীর্ণ হয়। – মুসলিম।

৯। আল্লাহর বাহু ও হাত (আঙ্গুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত) আছে তার প্রমাণ:

আবুল আহওয়াছ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যে তার পিতা বললেন, আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট আলু থালু অবস্থায় এসেছিলাম তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমার মাল সম্পদ আছে কি? আমি বলেছিলাম জি হ্যাঁ, আছে। বলেছিলেন: কি কি মাল আছে? আমি বলেছিলাম: সব ধরণের– উট, ঘোড়া, দাস, ছাগল। তিনি বলেন যখন তোমাকে আল্লাহ ওসব দান করেছেন তার আলামতও যেন দেখা যায়। তোমার নিকট।

তিনি বললেন: ঐ সব কথার পর আবার অন্য কথায় আসলেন। তিনি বললেন তোমার গোত্রের উঁটগুলি ত্রুটিমুক্ত ভাবে জন্মলাভ করে অত:পর তোমরা ক্ষুর দিয়ে সেগুলোর কান কেটে দিয়ে দেবদেবীর নামে ছেড়ে দাও, এমনিভাবে কান চিরে দিয়ে কিংবা চামড়া চিরে দিয়ে বল যে তা হারাম হয়ে

গেছে, এই বলে তোমার জন্য ও তোমার পরিবারের জন্য তা হারাম করে দাও, তাই কিনা? আমি বললাম জি হ্যাঁ তা আমরা করি। নবী (সা.) বললেন:

فكل ما أتاك الله لك حل وساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك (كتاب الاسماء والصفات 431)

সুতরাং যে সম্পদ আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন তার সবই তোমার জন্য হালাল। আর জেনে রাখ আল্লাহর বাহু তোমার বাহুর চেয়ে মজবুত। আর তার ক্ষুর (কাটার যন্ত্র) তোমার কাটার যন্ত্রের চেয়েও ধারালো। – এই হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী তার কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত গ্রন্থে ৪৩১ পৃঃ উল্লেখ করেছেন।

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غلظ جلد الكافر اثنان واربعون ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد (البيهقي 431)

আবু হুরায়রা (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন কাফিরের চামড়ার ঘনত্ব হবে জাব্বার (আধিপত্যশালী আল্লাহর) হাতের ৪২গজ আর তার দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান। – প্রাগুক্ত।

আরো দেখুন ছহীহ মুসলিম, মুনসাদে আহমাদ, তিরমিযী, মুসতাদরাক ও মুসনাদে বাযযার এর উদ্ধৃতি সহকারে। (মূল: ছহীহাহ হাদীছ নং ১১০৫ ও ছহীহুল জামি' আছ-ছগীর হাদীছ নং ৩৮৮৮)।

১০। আল্লাহর সাক্ব বা পিণ্ডলী (গোছা) আছে তার প্রমাণ:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ

যেদিন পিণ্ডলী (গোছা) খুলে দেয়া হবে এবং সিজদার জন্য ডাকা হবে সেদিন তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। – সূরা ক্বলাম ৪২।

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة' ويبقي من كان يسجد فى الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি আমাদের প্রতিপালক পিণ্ডলী প্রকাশ করবেন তখন প্রত্যেক মু'মিন নর-নারী তাকে সিজদা করবে, শুধু বাকী থাকবে তারা যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও শ্রুতি অর্জনের জন্য সিজদা করতো। তারা

সিজদা করতে গেলে তাদের পৃষ্ঠদেশের জোড়া সমান হয়ে তক্তায় পরিণত হবে। – বুখারী।

১১। আল্লাহর পা আছে তার প্রমাণ:

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفى رواية فيقول قط قط وعزتك ويزوي بعضها إلى بعض ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه فضول الجنة' رواه البخاري وسلم

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: জাহান্নামের ভিতর জাহান্নামীদের নিক্ষেপ করার পরও সে বলতে থাকবে আরো চাই। পরিশেষে আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা রেখে দিবেন তার ভিতর তখন সে বলবে আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর তার এক অংশ অপর অংশের সাথে জড়িয়ে (গুটিয়ে) যাবে। অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে জান্নাতেও শুণ্যস্থান থেকে যাবে অত:পর আল্লাহ তাআলা সেই শূণ্যস্থান পুরণের জন্য কিছু অধিবাসী তৈরী করবেন। – বুখারী ও মুসলিম।

هل الله عزوجل معدوم الصورة والشكل فلا يرى -

আল্লাহ স্বাকার না নিরাকার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিস্কার বুঝা গেল যে, আল্লাহ নিরাকার নয় যেমনটি সঠিক ইসলাম থেকে বিচ্যুত ভ্রষ্টদলগুলো বলে থাকে এবং যারা তাদের কিতাবপত্র (কাশশাফ, জালালাইন ও বায়যাবী) পড়ে ও পড়িয়ে তাঁদের মত মস্তিস্ক তৈরী করেছেন তাঁরা বলে থাকেন। নিরাকার বলার ফলে উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্ট দলীলের অপব্যাখ্যা করে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর বিকৃতি ঘটিয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম সেগুলোর অসীলায় তাঁকে ডাক এবং পরিত্যাগ কর তাদেরকে যারা তাঁর নামের ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন করে, অচিরেই তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে যা তারা করতো।

আল্লাহর আসমা ওয়াস সিফাতের ব্যাপারে বিখ্যাত মুহাদ্দিছ سفيان بن عيينة সুফিয়ান বিন উ'ইয়ায়নাহ এর এ কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত ।

قال اسحاق : سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما وصف الله تبارك وتعالى بنفسه فى كتابه فقراءته تفسيره' ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية (الاسماء والصفات 397)

ইসহাক বলেন, আমি সুফইয়ান বিন উয়াইনাহকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ যেভাবে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন কিতাব (কুরআন) এর ভিতর তার পঠনই হলো তার তাফসীর, কারো উচিত নয় ঐ সমস্ত শব্দের নতুন করে আরবী কিংবা ফারসীতে তাফসীর করা ।

– আল-আসমা ওয়াস সিফাত ৩৯৭ পৃষ্ঠা ।

আলাহর বাণী: لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎকাজ করবে তাদের জন্য সৎ পুরস্কার রয়েছে আরো অতিরিক্ত কিছু দান করা হবে । – সূরা ইউনুস: ২৬ ।

এর তফসীরে নবী (ছঃ) যা বলেছেন ঃ

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الاية (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه' فيقولون: وماهو؟ الم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا' ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه' فوالله ما اعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لاعينهم -(رواه مسلم)

নবী (ছঃ) এ আয়াতটি (যারা সৎকাজ করবে তাদের জন্য সুন্দরতম পুরস্কার রয়েছে এবং আরো অতিরিক্ত কিছু দান করা হবে) পাঠ করেন এবং বলেন: যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং নরকবাসীরা নরকে প্রবেশ করবে তখন একজন আহবানকারী আহবান করবে এ বলে যে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদের জন্য আল্লাহর একটি ওয়াদাহ (প্রতিশ্রুতি) রয়েছে তিনি (এখন) তা পূর্ণ করতে চাচ্ছেন । তারা বলবে সেটা আবার কি? তিনি কি আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী করেননি? আমাদের চেহারাগুলোকে উজ্জ্বল করেননি? এবং আমাদেরকে নরক থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? এরপর তাদের সম্মুখ থেকে পর্দা উম্মুক্ত করা হলে তারা আল্লাহর

দিকে দেখতে থাকবে। আল্লাহর শপথ তাদের নিকট আল্লাহর দর্শণ অপেক্ষা জান্নাতে এত চমৎকার ও চক্ষুশীতলকারী আর কিছুই দেয়া হয়নি।

আল্লাহর আকার বিশিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এ হাদীছটিই যথেষ্ট।

الركن الثانى: الإيمان بالملائكة
দ্বিতীয় রুক্‌ন
ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস*

ঈমানের দ্বিতীয় রুকনটি হচ্ছে ফেরেশতাগণ এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। ফেরেশতাগণ হচ্ছেন আল্লাহর এমন এক সৃষ্টি যা সাধারণ ভাবে মানুষ দেখতে পায় না। তাদের আলো থেকে তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু তাদের আকৃতি ও দেহ রয়েছে। তারা হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং তাদের ভিতর রব বা উপাস্যের কোন গুণাবলী নেই। তারা আল্লাহর আদেশের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদি এবং তারা কখনোই তাঁর আদেশ পালন করা থেকে বিমুখ হন না।

আহমাদ সালাম এই ব্যাপারে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, কোন ব্যক্তি যদি ফেরেশতায় বিশ্বাস না করে, তাহলে সে রাসূল (সা.) এঁর কাছে অহী আসার ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে যে একজন ফেরেশতা, জিবরীল (আ.), রাসূল (সা.) এঁর কাছে কুর'আন নিয়ে এসেছিলেন। যদি না সে যে ফেরেশতায় বিশ্বাস করে, সেটা নিশ্চিত করা যায়। এই বিশ্বাস একটা জাতি হিসেবে সাধারণ ভাবে ফেরেশতাকুলে বিশ্বাস এবং বিশেষভাবে জিবরীল (আ) এর বিশ্বাসের সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে- যিনি রাসূল (সা.) এঁর কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন।

শেখ ইবনু উসাইমীনের মতে, ফেরেশ্‌তায় সঠিক বিশ্বাস ৪টি বিষয়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ হয়। যথা–

প্রথমত ঃ তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে।

*বি.দ্র. দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ রুকন পর্যন্ত তথ্যগুলো সম্মানীত শাইখ মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আল-উছাইমীন (রহ.)এর রাসায়িল ফিল আক্বীদাহ ও আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাহ গ্রন্থদ্বয় হতে এবং ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) এর শিফাউল আলীল থেকে সংকলনের মনস্থ ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জামাল জারাবযোর লিখিত ও বন্ধুবর ইঞ্জিনিয়ার মোঃ এনামুল হক অনূদিত " ইনি হলেন জিবরীল তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে

দ্বিতীয়ত ঃ সাধারণভাবে ফেরেশতাকুলে বিশ্বাস করতে হবে, কিন্তু এর সাথে তাকে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বা সুন্নাহয় স্পষ্টাবে উল্লিখিত নামধারী ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ফেরেশতার নাম হচ্ছে, জিবরীল। যিনি রাসূল (আ)-গণের কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন।

তৃতীয়ত ঃ তাদের ঐ সব গুণসমূহে বিশ্বাস করতে হবে, যে সব গুণ কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) জিবরীল (আ)-কে গোটা দিগন্ত জুড়ে দেখেছেন এবং তার ৬০০ ডানা ছিলো। এটা প্রতীয়মান করে যে, আল্লাহর সৃষ্ট এই প্রজাতি হচ্ছে বিস্ময়কর ও চমৎকার এক সৃষ্টি। আমরা আরো জানি যে, ফেরেশতারা বিভিন্ন চেহারা ধারণ করতে পারেন, যেমন ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়– মানুষের চেহারায় জিবরীল (আ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ থেকে আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে আমরা এটা ধারণা লাভ করতে পারি যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

চতুর্থত ঃ কুরআন এবং সহীহ হাদীসে তাদের যেসব কার্যকলাপ বর্ণিত রয়েছে, কোন বিশ্বাসীকে অবশ্যই সে সবে বিশ্বাস করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করেন এবং আল্লাহর গুণগান গেয়ে থাকেন। এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, নির্দিষ্ট ফেরেশতাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য রয়েছে। জিবরীল (আ.) হচ্ছেন, 'অন্তরের বা প্রাণের' (বা রূহের) দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কথাটা আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত অহীর বেলায় বলা হয়ে থাকে। ইস্রাফিল হচ্ছেন ঐ সিঙ্গার দায়িত্বপ্রাপ্ত, যা বেজে উঠলে শেষ বিচারের দিনে দেহগুলো পুনরুত্থিত হবে। সুতরাং পুনরুত্থান দিবসের বা

পুনরুজ্জীবনের সাথে তিনি সম্পৃক্ত। মিকাইলের দায়িত্ব হচ্ছে বৃষ্টিপাত ও চাষাবাদের ব্যাপারগুলো।

পঞ্চমত ঃ ফেরেশতায় কারো বিশ্বাসের শর্ত পালনের আরেকটা বিষয় হচ্ছে– আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য এবং তারা যেভাবে আল্লাহর ইবাত করে থাকে– সেজন্য তাদের প্রতি (আমাদের) গভীর ভালোবাসা থাকা চাই। উপরন্তু, তারা আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করেন এবং তাঁর আদেশ পালন করে থাকেন। আল্লাহতে সত্যিকারভাবে যারা বিশ্বাস করেন, তাদের প্রতিও তাদের গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্য রয়েছে। তারা মুমিনদের পক্ষ অবলম্বন করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। ফেরেশতারা মুমিনদের এই জীবন এবং আখিরাতে সাহায্য করে থাকেন। ফেরেশতায় ঈমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এটা যে, প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, তার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন, যারা তার কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করে চলেছেন। নিম্নলিখিত আয়াতগুলো ঐ ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করেঃ

إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"মনে রেখো 'দুই গ্রহণকারী' ফেরেশতা, তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।" –সূরা ক্বাফ, ৫০ঃ১৭-১৮।

ফেরেশতায় সঠিক বিশ্বাস পোষণ করার কতিপয় সুফল

ক. এদের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর বিশালত্ব এবং তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। ফেরেশতা বলে পরিচিত এই সৃষ্টি আসলে তাদের সৃষ্টিকর্তার বিরাটত্বের এক নিদর্শন।

খ. মানুষের প্রতি আল্লাহর অসাধারণ যত্ন ও খেয়ালের কারণে যে কারো উচিত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করা। তিনি মু'মিনদের সমর্থন যোগানোর জন্য, তাদের সুরক্ষা করার জন্য, তাদের কার্যকলাপ

লিপিবদ্ধ করার জন্য এবং বিশ্বাসীদের অন্যান্য মঙ্গলের জন্য ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন।

الركن الثانى: الإيمان بالكتب
তৃতীয় রুক্ন
কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহর কিতাবসমূহে বিশ্বাস হচ্ছে হাদীছে জিবরীলে বর্ণিত ঈমানের তৃতীয় রুক্ন। পার্থিব এই জীবনে সফলতার দিকে এবং আখিরাতে সুখ ও শান্তির দিকে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য দিক নির্দেশনা দিতে, আল্লাহর দয়া ও হিদায়াত হিসেবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের কাছে যেসব অহী পাঠিয়েছেন– কিতাব বলতে– সে সবের কথা উদ্দেশ্য। তবে বিশেষভাবে যা বুঝায় তা হচ্ছে আল কুরআন। যা কিনা আল্লাহর নাযিলকৃত শেষ বাণী বা গ্রন্থ। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর বাণী বা বক্তব্য– যা সৃষ্ট নয় বরং আল্লাহর সিফাতের অংশ।

ইবনু উসাইমিন উল্লেখ করেন যে, আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস ৪টি বিষয়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ হয়। যথাঃ

১. যে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে যে, ঐ কিতাবগুলো সত্যি সত্যিই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।

২. যে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কুরআন ও সুন্নাহয় উল্লেখিত কিতাবগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে নাবী (স)-এর কাছে নাযিলকৃত আল-কুরআন, মূসা (আ.)-এর কাছে নাযিলকৃত তাওরাহ, ঈসা (আ.)-এর কাছে নাযিলকৃত ইঞ্জিল, এবং দাউদ (আ.)-এর কাছে নাযিলকৃত যাবুর (Psalm)। এছাড়া কুরআনে ইবরাহীম (আ.) ও মূসা (আ.) এঁর কাছে নাযিলকৃত ছুহুফ্ তথা 'পৃষ্ঠাসমূহের' কথা রয়েছে। আজকের ইহুদী ও খৃস্টানদের কাছে যেসব পুস্তকাদি রয়েছে– যেগুলোকে তারা তাওরাহ, বাইবেল বা Psalm বলে থাকে সেগুলোতে কিছু প্রকৃত অহী থাকলেও, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সেগুলো বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং কোন মুসলিম তাওরাহতে বিশ্বাস করে–একথার অর্থ এই নয় যে, সে পুরাতন নিয়ম বা Old

Testament- এর প্রথম পাঁচটি পুস্তকে বিশ্বাস করে। পুস্তকগুলো ভিন্ন (অর্থাৎ আদি বা প্রকৃত তাওরাহ এবং বাইবেলে সংযুক্ত পঞ্চ-গ্রন্থ) যদিও বাইবেলে সংযোজিত তাওরাহতে আদি তাওরাতের কিছু অংশ থেকে থাকতে পারে।

৩. যে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআনে যা কিছু নাযিল করেছেন, তার সবটুকুতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে– তাতে যা রয়েছে তার বেলায় যেমন প্রযোজ্য তেমনি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে যা রয়েছে, তার বেলায়ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ, কুরআন যদি কিছু বলে, তাহলে মুসলিমদের অবশ্যই তা বিশ্বাস করতে হবে। এ ব্যাপারে তার কোন স্বাধীনতা নেই যে, সে বিশ্বাস করবে কি করবে না। সে যদি এর কোন বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে আল্লাহর কিতাবে তার বিশ্বাসকে অস্বীকার করলো। আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“.....তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং, তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামাতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।” – সূরা আল-বাক্বারা– ২:৮৫।

৪. যে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বাতিল না হয়ে যাওয়া অহী– যা কিনা কুরআন; সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কুরআন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং এর কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। ঐ ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণভাবে কোন আদেশ বা বক্তব্যের পেছনে কি প্রজ্ঞা রয়েছে তা নাও বোঝে, তবু তাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ Ki‡Z n‡e|

আলাহর সকল পূর্ববর্তী অহী বা কিতাবসমূহ, কুরআনের আগমনের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে গেছে। তাই কোন মুসলিমের জন্যই কোন বিষয়ে জানতে এখন আর পূর্ববর্তী কোন কিতাবের অবশিষ্টাংশের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন নেই। দিকনির্দেশনার জন্য তার যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই

কুরআনে ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সুন্নায়– রয়েছে। আর আল্লাহ কুরআনে তা বলেও দিয়েছেন ঃ

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ

"আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে ।...." – সূরা আল-মায়িদাহ– ৫:৪৮ ।

এই আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনু উসাইমীন বলেন ঃ "এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর শাসকস্বরূপ। সুতরাং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোন নিয়ম বা অনুশাসন অনুযায়ী কাজ করা অনুমোদিত নয়– যদি না তা কুরআন দ্বারা সত্যায়িত ও গ্রহণযোগ্য প্রাণিত হয় ।"

আল্লাহ যে মানবজাতির জন্য অহী নাযিল করেছেন– সেটা হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর আশীর্বাদসমূহের বৃহত্তম একটি। মানুষ যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট– এই অহীসমূহ তাকে সে পথে পরিচালিত করে।

জাফর শেখ ইদ্রিস এ বিষয়ে বলেন ঃ

"আল্লাহ মানুষকে তৈরী করেছেন, যেন তারা তাঁর ইবাদাত করে। সে যে আল্লাহর বান্দা, সেটাই হচ্ছে মানব সত্তার মূল কথা। মানুষ তাই সত্যিকার অর্থে মানবতা সম্পন্ন হয় না এবং সে মানসিক শান্তিও লাভ করতে পারে না– যতক্ষণ না তাকে কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে তা উপলব্ধি করতে না পারে। কিন্তু সে তা কি করে উপলব্ধি করবে? আল্লাহ তাঁর দয়া ও সুবিচারবশত তাকে অনেকভাবে সাহায্য করেছেন [যাতে সে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারে]। তিনি তাকে একটা জন্মগত সুন্দর প্রকৃতি বা স্বভাব দান করেছেন– যার কিনা তার সত্যিকার প্রতিপালককে জানবার এবং তাঁর ইবাদাত করার স্বাভাকি প্রবণতা রয়েছে। তিনি তাকে একটা মন দিয়েছেন, যার মাঝে একটা স্বাভাবিক নৈতিকতা বোধ রয়েছে এবং যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। তিনি গোটা মহাবিশ্বকে এক প্রাকৃতি পুস্তক স্বরূপ তৈরী করেছেন, যা এমন নিদর্শনে পরিপূর্ণ, যা কিনা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু সব কিছুকে আরো নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে এবং মানুষকে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে আরো বিস্তারিভাবে পথ দেখিয়ে দিতে– আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে নির্ধারি তাঁর নাবীদের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে তাঁর মৌখিক বাণী পাঠিয়েছেন।

সেজন্যই কুরআনে এইসব বাণীকে পথ-নির্দেশনা (বা হিদায়াত), আলো, নিদর্শন, সতর্কবাণী ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়েছে। (দেখুনঃ Page# 18-19, The Pillars of Faith- Jaafar Sheikh Idris.)

আসলে তিনি যে মানুষের জন্য কেবল অহী নাযিল করেছেন তাই নয়, বরং প্রয়োজনে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন অহী নাযিল করেছেন। এটা হচ্ছে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর অসীম করুণার আরেকটি নিদর্শন। কুরআন নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া জারী ছিল– যাতে কিনা নাবী মুহাম্মাদ (স)-এর সময় থেকে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল দিক নির্দেশনা সংযোতি রয়েছে। পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সকল সময়ের জন্য যেহেতু এর পথ-নির্দেশনা প্রযোজ্য, সেহেতু অন্য কিতাবসমূহের বিপরীতে আল্লাহ কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন– সকল পরিবর্তন, ভুল ও বিকৃতিকরণ থেকে। আল্লাহ বলেছেন ঃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

"আমিই এই যিকির অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক।" – সূরা আল-হিজর– ১৫:৯।

الركن الثانى: الإيمان بالرسل
চতুর্থ রুকন
রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

রাসূল হচ্ছেন এমন যে কোন একজন মানুষ, যাকে আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে প্রেরিত অহী লাভ করার জন্য বেছে নিয়েছেন এবং যাকে সেই অহী অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলদের ভিতর প্রথম হচ্ছেন নূহ (আ) প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে এবং এই সব রাসূলগণ একই মৌলিক শিক্ষা প্রচার করতে এসেছিলেন; যেমনটা কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ

"আল্লাহর ইবাদাত করার এবং তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমরাে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।....."

–সূরা আন-নাহাল– ১৬:৩৬।

শেষ নাবী ও রাসূল হচ্ছেন নাবী মুহাম্মাদ (স)। আল্লাহ বলেছেন ঃ

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয় বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নাবী...... ।" –সূরা আল-আহযাব–৪০।

এটা গুরুত্ব সহকারে খেয়াল করার বিষয় যে, এই সব নাবী ও রাসূলগণের সবাই কেবলই রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন। তাঁদের কোন প্রভূত্বের মর্যাদা বা গুণাগুণ ছিলো না। কেবল আল্লাহ তাঁদের কাছে অহী মারফত যা প্রেরণ করেছিরেন, তা ছাড়া গায়েব সম্বন্ধে তাঁদের কোন জ্ঞান ছিল না। তাঁদের জন্য সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গুণ হচ্ছে এই যে, তাঁরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা। কুরআনে আল্লাহ তাঁদের সেভাবেই বর্ণনা করেনে। আসলে নাবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের বড় বড় তিনটি উপলক্ষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আল্লাহ তাঁকে তার বান্দা হিসেবে সম্বোধন করেন।

–২৫:১, ১৭:১, ৭২:১১৯।

রাসূলগণে সঠিক বিশ্বাসের চারটি দিক রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ যে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে যে, সকল রাসূলের বাণীসমূহ আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য। কুরআনে অথবা সহীহ হাদীসে সত্যায়িত যে কোন একজন রাসূলকেও যদি কেউ অস্বীকার করে, তবে সে আসলে তাদের সকলকেই অস্বীকার করলো। নূহ (আ)-এর জাতি সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন ঃ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ

"নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।"

– সূরা শুয়ারা– ২৬:১০৫।

অথচ আমরা জানি, নূহ (আ.) ছিলেন আল্লাহর প্রেরি প্রথম রাসূল। এ থেকে বোঝা যায় যে, কেউ যদি কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করে, তাহলে সে আসলে সকল রাসূলকেই অস্বীকার করলো। কেননা, তাদের নিয়ে আসা বাণীর সারকথা একই।

সুতরাং ঈসা (আ.) ও মূসা (আ.)-এর তথাকথিত অনুসারীদের ভিতর যারা নাবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করতে অস্বীকার করে, তারা আসলে

ঈসা (আ.), মূসা (আ.)-এর উপর তাদের বিশ্বাসকেই অস্বীকার করে, কেননা তাদের কিতাবেই অনেক ইঙ্গিত রয়েছে যে, আরেকজন রাসূল আসবেন– কিন্তু তারা এসব ইঙ্গিত সনাক্ত করতে বা স্বীকার করতে চায় না। আল্লাহ নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে এ সম্বন্ধে বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে এমনভাবে জানে, যেভাবে তারা তাদের পুত্রদের সনাক্ত করতে পারে। কিন্তু তাদের একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে।" –সূরা আল-বাক্বারা– ২:১৪৬।

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنْجِيلِ

"যারা বার্তাবাহক উম্মী নাবীর অনুসরণ করে, তারা লিখিতাকারে উল্লেখ পাচ্ছে তাদের নিকটস্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলে... ।"

–সূরা আল-আরাফ– ৭:১৫৭।

সেজন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

"যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! এই জাতির [অর্থাৎ, রাসূল (সা.)-এর সময় থেকে নিয়ে, কিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের সকল মানুষ– তারা সবাই নাবী (সা.)-এর জাতি বা উম্মাহ– কেননা, তাদের সকলের জন্য তাঁকে বিশ্বাস করা ও তাঁকে অনুসরণ করা অবশ্য করণীয়, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইহুদী ও খৃস্টানগণের যে আমার কথা শুনলো এবং তারপর আমাকে যা সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস না এনে মৃত্যুবরণ করলো–তাদের এমন কেউ নেই যে কিনা আগুনের বাসিন্দা হবে না (অর্থাৎ, সকলেই জাহান্নামী)।" – সহীহ মুসলিম।

এটা এমন একটা ব্যাপার যা অন্যান্য জাতিসমূহ থেকে মুসলিমদের পৃথক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। মুসলিমরা সকল নাবী ও রাসূলগণকে বিশ্বাস করে। অথচ অন্যরা কাউকে কাউকে অবিশ্বাস করেছে–যা ইহুদীদের ঈসা (আ.)-কে প্রত্যাখ্যান করা অথবা ইহুদী ও খৃস্টানদের মুহাম্মাদ (সা.)-কে অস্বীকার করা যেটাই হোক না কেন, যদিও বাস্তবে তাদের নাবীর

পরবর্তী নাবীকে অস্বীকার করার তাদের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিলো না। প্রত্যেক রাসূলই পরিষ্কার নিদর্শন ও প্রমাণ সহকারে এসেছেন। মানুষজন যে তাদের অস্বীকার করেছে, তা নিতান্তই একগুঁয়েমি, অজ্ঞতা অথবা হিংসাত্মক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে করেছে।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন এবং সুন্নাহয় যেসব রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম বা মুমিনকে তাদের সবার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যাদের নাম কুরআনে বা সুন্নাহয় উল্লেখিত হয়নি– তাদের ব্যাপারে সাধারণ স্তরের বিশ্বাস থাকতে হবে (একই সময়ে কেউ এ ধরনের দাবী করতে পারে না যে, বুদ্ধ এজন নাবী ছিলেন– কেননা, কুরআনে ও সুন্নাহয় এর সপক্ষে কোন দলিল নেই); একথা জেনে যে, যদিও আল্লাহ সবার নাম ধরে কুরআনে উল্লেখ করেন নি– তবু তিনি বহু রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

"এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। তাদের কিছুসংখ্যকের কাহিনী আমরা তোমার কাছে বর্ণনা কেরছি এবং কিছুসংখ্যকের কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিনি।" – সূরা গাফির– ৪০:৭৮।

তৃতীয়ত ঃ তাঁরা যা কিছু বলেছেন, তার সবটুকুতেই প্রত্যেক মুসলিমকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহর কাছ থেকে তাঁদের কাছে প্রেরিত বাণীকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ও সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার বাধ্যবাধকা তাঁরা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁরা সবচেয়ে শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ পন্থায় সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁরাই ছিলেন আল্লাহ সম্বন্ধে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ইবাদাতকারী ও বান্দা। আল্লাহ সম্বন্ধে নিজেদেরে মনগড়া কিছু বলা থেকে, নিজের "হাওয়া" মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিচার করা থেকে, কবীরা গুনাহয় পতিত হওয়া থেকে অথবা দ্বীনের ব্যাপারে গাফিলতি থেকে তাদের সুরক্ষা করা হয়েছে। (দেখুন : Page- 18, The General Prescript of Belief in the Quran and Sunnah Abdur Rahman Abdul Khaliq.)

চতুর্থতঃ কোন ব্যক্তির পথনির্দেশনার জন্য যে রাসূলকে পাঠানো হয়েছে– তার উচিত সেই রাসূলের দেয়া আইন বা শরীয়াহ মেনে নেয়া বা গ্রহণ করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা । আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"আমরা এমন কোন রাসূল পাঠাইনি যাকে, আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে মেনে চলতে হবে না ।" – সূরা আন-নিসা– ৪ ঃ ৬৪ ।

রাসূল (স) সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً..

"কিন্তু না তোমার প্রতিপালকের কসম! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, তারপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয় ।" –সূরা আন-নিসা– ৪:৬৫ ।

যে কোন ঈমানদারের উপলব্ধি করা উচিত যে, মানবকুলের উপকার ও পথনির্দেশনার জন্য রাসূল প্রেরণ করাটা আল্লাহর তরফ থেকে এক বিরাট আশীর্বাদ বা রহমত । তারা যে জ্ঞান বিতরণ করে গেছেন, তা হচ্ছে এমন জ্ঞান বা মানুষের বুদ্ধিমত্তার আওতাবহির্ভূত জ্ঞান– কেননা তা গায়েবের ব্যাপার নিয়ে কথা বলে। বাস্তবে মানবজাতির খাবার ও পানীয়ের প্রয়োজনের চেয়ে, এই জ্ঞানের প্রয়োজন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । তারা যদি একটা সময়ের জন্য আহার ও পানীয়বিহীন থাকে তবে তারা হয়তো মারা যাবে– অর্থাৎ তারা তাদের জীবনটাই হারাবে, কিন্তু তারা যদি রাসূলগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহর দিক-নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে, তবে তারা আখিরাতের অনন্তকালব্যাপী আল্লাহর আশীর্বাদ ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে|

الركن الثانى: الإيمان باليوم الآخر

পঞ্চম রুকন্

শেষ বিচারের দিন-এর প্রতি বিশ্বাস

ক্বিয়ামাতের দিনকে 'শেষ দিন' (বা শেষ বিচারের দিন) বলা হয়ে থাকে। কারণ, ঐ দিনের পর আর কোন নতুন দিন আসবে না– কেননা, জান্নাতের বাসিন্দারা তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন, যেমন জাহান্নামের বাসিন্দারাও তাদের আবাসস্থলে পৌঁছে যাবে। ঐ দিনের অন্যান্য নামের ভিতর রয়েছে– আল-বা'ছ (পুনরুত্থান দিবস), আল-হাক্কাহ (বাস্তবতা), আল-ওয়াক্বিয়াহ্ (ঘটনাটি), ইয়াউমুল হিসাব (বিচার দিবস) এবং আল-ক্বরিয়াহ (বিধ্বস্ত দিবস) ইত্যাদি। মানবজাতিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিন অতিবাহিত করতে হবে, এটা হচ্ছে সেই দিন। বাস্তবিকই এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম দিন। একজন মানুষের নতুন জীবন এই দিনে নির্ধারিত হবে। প্রতিটি আত্মার জন্যে এই দিনটি হবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। অনন্ত জীবনের এই ধাপটি মানুষকে হয় চিরন্তন শান্তি অথবা চিরন্তন অধঃপনের মাঝে নিয়ে যাবে।

শেষদিনে বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে, ঐ দিন এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন এবং রাসূল (স)-এর সূত্রে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার সবকিছুতে বিশ্বাস করা। কিছু সাধারণ ব্যাপার রয়েছে, যেমন পুনরুত্থান বিচার ও পুরুস্কার বা তিরস্কার, জান্নাত ও জাহান্নাম যেগুলো সম্বন্ধে প্রতিটি মুসলিমকে সচেতন হতে হবে, এবং নিশ্চয়তা সহকারে বিশ্বাস করতে হবে। কুরআন ও আল্লাহর রাসূল (স) বর্ণনা করেছেন, এমন আরো বিস্তারিত দিক রয়েছে। ঐ দিন সম্বন্ধে কারো জ্ঞান যত বেশি হবে এবং ঐ দিনকে ঘিরে যে সমস্ত ঘটনাবলী রয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধে যে যতই বেশি জানবে, তার উপর এই বিশ্বাসের প্রভাবও তত বেশি হবে। সুতরাং, প্রত্যেক মুসলিমেরই উচিত পুনরুত্থান দিবসের আগে এবং পুনরুত্থান দিবসে কি কি ঘটনা ঘটবে সে ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করা।

সহীহ মুসলিমে যেমনটা লিপিবদ্ধ রয়েছে, বিচার দিবস ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পূর্বে, আল্লাহ রেশমের চেয়েও মসৃণ (বা smoother) এক বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করবেন, যা ইয়েমেনের দিক থেকে প্রবাহিত হবে, যা এমন সকল মানুষের প্রাণ হরণ করবে, যাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকবে। সুতরাং সমাপ্তির ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষরাই যাবে– সেই সব মানুষ যাদের অন্তরে কোন ঈমান থাকবে না। শেষ সময়ের ঘটনাগুলোর শুরুর দিকের একটা হচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠা। ঐ

সময়ে অবশিষ্ট ঈমানবিহীন মানুষেরা তাদের ঈমান ঘোষণা করবে, কিন্তু তা তাদের কোন কাজে আসবে না। তারপর সেই ধ্বনি বেজে উঠবে এবং এই পৃবীর জীবিত সবাই মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ ٱللَّهُ

"এবং সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মূর্ছা যাবে, কেবল যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া..... ।"

–সূরা আয্-যুমার– ৩৯:৬৮।

এই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী তখন ধ্বংস হয়ে যাবে (বা ধ্বংস করে দেয়া হবে)। এরপর ৪০ সংখ্যার একটা সময়কাল পরে– আমরা জানি না সেটা ৪০ ঘণ্টা, দিন না বছর– দ্বিতীয় বারের মত সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং মানুষ তখন পুনরুত্থিত হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ * قَالُواْ يٰوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمـٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ*

"যখন সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে বেরিয়ে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের ঘুমের জায়গা থেকে উঠিয়ে আনলো? দয়াময় আল্লাহ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ তো সত্যিই বলেছিলেন'।" – সূরা ইয়াসিন– ৩৬:৫১-৫২।

ইবনু উসাইমীনের মতে শেষ দিবসে বিশ্বাস, তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথমতঃ পুনরুত্থানে বিশ্বাস মানে এই বিশ্বাস করা যে, দ্বিতীয় সিংগাধ্বনির পরে মানুষজন আল্লাহর সামনে পুনরুত্থিত হবে। তারা তখন নগ্নদেহ, নগ্নপদ ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় থাকবে।

–বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত।

আল্লাহ বলেন ঃ

كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেইভাবে আবারো আমি সৃষ্টি করবো। প্রশ্রিুতি পূরণ করা আমার কর্তব্য– আমি তা পূরণ করবোই।"

–সূরা আম্বিয়া– ২১:১০৪ ।

পৃথিবীতে কোন ব্যক্তির যে শরীর ছিল, সেই শরীরে সে পুনরুত্থিত হবে। **ইবনু উসাইমীন** এ ব্যাপারটার প্রজ্ঞা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ "এটা (অর্থাৎ পুনরুত্থিত শরীরটা) যদি নতুনভাবে সৃষ্টি করা হতো, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াতো যে, যে শরীরটা এই পৃথিবীতে পাপকর্ম করেছে, সেটা তার প্রাপ্য শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যেতো। একটা নতুন শরীর নিয়ে আসা এবং সেই শরীরের শাস্তি লাভ সুবিচারের পরিপন্থী একটা বিষয়। সুতরাং কিতাবী প্রমাণ ও যুক্তির বিবেচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যা পুনরুত্থিত করা হবে, সে কোন নতুন সৃষ্টি নয়, বরং এক পুরান সৃষ্টির পুনরাগমন। তিনি এ ব্যাপারেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, গলে পচে ক্ষয় হয়ে যাবার পরেও, সেই শরীরগুলোকে পুনর্গঠিত করার ক্ষমতা আল্লাহর রয়েছে। মানুষ নাও বুঝতে পারে যে, সেটা কিভাবে সম্ভব! যেমন এমন আরো বহু ব্যাপার রয়েছে যা মানুষের বুদ্ধিতে কুলায়না বা যা তার বোধশক্তির বাইরে।[৫]

কারণ আলাহ্ কুরআনে বলেছেন–

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ*

---

[৫] **টীকা ঃ** উদাহরণস্বরূপ "ফরেনসিক" বলে অপরাধ বিজ্ঞানের যে শাখা আছে, তা যেভাবে একযুগ আগে খুন হয়ে যাওয়া একজন মানুষের একটিমাত্র হাড় নিয়ে গবেষণা করে বলে দিতে পারে যে, মানুষটি কিভাবে খুন হয়েছিলেন অথবা তার এক পা খোঁড়া ছিল– তা একজন সাধারণ মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য বা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। সাম্প্রতিককালে জীববিজ্ঞানীরা DNA সংক্রান্ত গবেষণায় যে অগ্রগতি করেছেন, তাতে DNA-তে সংরক্ষিত (code বা) সংকেতকে প্রাণীর বেলায় বিল্ডিং-এর নকশার সমতুল্য ব্যাপার বলে গণ্য করা যায়। একটা বিল্ডিং সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলেও, সেই বিল্ডিং-এর নকশাটি যেমন সেই বিল্ডিং-এর যাবতীয় বিস্তারি বিবরণ সংরক্ষিত করে রাখে, যা থেকে চাইলে বিল্ডিংটি হুবহু পুননির্মাণ সম্ভব– তেমনি মৃত মানুষের দেহাবশেষের DNA sample ঐ মানুষটির বৈশিষ্ট্যের যাবতীয় তথ্যের যোগান দিতে সক্ষম। আমরা আমাদের মানবিক ধীশক্তি দিয়ে, পৃথিবীতে মানুষের যে শরীর ছিল, সেই শরীর নিয়ে তার পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার কথা বোঝাতে এতগুলো কথা বললাম। আমরা বলছি না যে, আমাদের পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কোন "নকশার" প্রয়োজন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট পরাপর আলোচনা মন্তব্য – তিনি হলেন জিব্রীল পৃষ্ঠা ২৪৬।

"আমরা যা চাই তার ব্যাপারে আমরা কেবল বলি 'হও' এবং তা হয়ে যায়" –সূরা নাহল– ১৬:৪০।

কিন্তু আল্লাহ ব্যাপারটা এভাবেই উল্লেখ করেছেন এবং একজন বিশ্বাসী খুব ভালোভাবেই জানেন যে, এটাই সত্যি এবং আল্লাহ তা করার ক্ষমতা রাখেন।

দ্বিতীয়তঃ এরপর যা বিশ্বাস করতে হবে, তা হচ্ছে হিসাব-নিকাশ ও কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি এবং তার ফলশ্রুতিতে কর্মফল হিসেবে পুরস্কার বা শাস্তি লাভ। শেষ দিবসের এই দিকটা কুরআনে বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নীচের আয়াতগুলো উল্লেখ করা যায়ঃ

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

"নিশ্চিতই তাদের প্রত্যাবর্তন আমাদেরই কাছে। তারপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমার উপর ন্যাস্ত কাজ।" – সূরা গাশিয়া– ৮৮:২৫-২৬।

وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

"এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাদের ন্যায়-বিচারের মানদণ্ডস্থাপন করবো। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং তিল পরিমাণ ওজনের কাজকেও উপস্থিত করা হবে– হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমরা যথেষ্ট।" – সূরা আল-আম্বিয়া– ২১:৪৭।

বিচার দিবসে যে সকল কর্মকাণ্ডের ওজন দেয়া হবে বা বিচার করাহবে, আর্লাহ তা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন ঃ

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤاْ أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

"সেদিনের ওজন করা হবে সত্যিকার ওজন করা। যাদের সৎকাজের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের সৎকাজের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হচ্ছে ঐসব ব্যক্তি যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে–কেননা তারা আমাদের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতো। – সূরা আল-আরাফ– ৭:৮-৯।

আবারো কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, "কর্মকাণ্ড হচ্ছে, দার্শনিকরা যেমন বলে থাকেন, দুর্ঘটনার মতো– কোন ওজন বা ভরবিহীন। সেগুলো আবার কিভাবে ওজন দেয়া হবে?" উত্তর হচ্ছে– এসবও ওজন করার সামর্থ আল্লাহর রয়েছে। ঐ দিনে যে নিক্তি (সুক্ষ্মভাবে পরিমাপের যন্ত্রবিশেষ) ব্যবহার করা হবে, তা কোন মানুষের কল্পনাশক্তির আওতাভুক্ত নয়– আর কার্যকলাপের ওজন তো আরো বেশি অকল্পনীয় একটা ব্যাপার।[৬]

আল্লাহ সেগুলো ওজন করবেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন সুবিচারক। প্রতিটি কর্মই আল্লাহর নিক্তির মাপ অনুযায়ী কতটুকু মূল্য বহন করে তা নির্ধারিত হবে।

প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যে প্রতিফল বা পুরস্কার দেন, তা হচ্ছে তার তরফ থেকে এক করুণাবাহক কাজ– কেননা কোন কর্ম যেটুকু প্রতিফলের যোগ্য, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি পুরস্কার দিয়ে থাকেন। অথচ আল্লাহর শাস্তি সুবিচারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, এবং তিনি কাউকে তার যতটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি শাস্তি দেন না।

তৃতীয়তঃ শেষ দিবস সম্পর্কিত বিশ্বাস আনার তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস। মুমিনের জন্য জান্নাত হচ্ছে চিরস্থায়ী আবসস্থল ও পুরস্কার। জাহান্নাম হচ্ছে কাফিরের জন্য চিরস্থায়ী আবাসস্থল ও তার উপার্জিত শাস্তি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী মতটা হচ্ছে এরকম যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানেই অস্তিত্বশীল এবং তারা চিরকালব্যাপী অস্তিত্বশীল থাকবে। কিছু অ-মুসলিম এবং কিছু বিপথগামী মুসলিম যেমন বলে থাকে– জান্নাত ও জাহান্নাম কেবল "মনের অবস্থা বিশেষ" তা নয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স) সেগুলোর (অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের) কথা

---

[6] **টীকা ঃ** আখিরাতের ব্যাপার আপাতত বাদই দিলাম। দুনিয়ার এমন বহু ব্যাপার রয়েছে, যা মানুষ একসময় কল্পনাও করতে পারে নি– অথচ যখন আল্লাহ মানুষের জন্য কোন নির্দিষ্ট জ্ঞানের দ্বার খুলে দেন, তারপরে ব্যাপারটা এত সহজবোধ্য হয়ে যায় যে, এককালে যে তার প্রপিতামহ তা জানতেন না, সেটা ভাবতেও তার হাসি পায়। আজ থেকে ৫০০ বছর আগেও অদৃশ্য বাতাসের যে ওজন আছে আবার তা যে মাপও সম্ভব, সেটা হয়তো মানুষের কল্পনারও বাইরে ছিল– আজ হয়তো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদেরও তা পড়ানো যেতে পারে। – তিনি হলেন জিবরীল পৃষ্ঠাঃ ২৪৮।

উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলো পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কোন মুসলিমের, সেগুলোর অস্তিত্ব অথবা সেগুলোর বর্ণনাকে অস্বীকার করার বা পাশ কাটিয়ে যাবার কোন অবকাশ নেই। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ জান্নাত সম্পর্কে বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ–جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رِّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার– চিরস্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর ব্যাপারে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।" – সূরা আল-বায়্যিনাহ– ৯৮:৭-৮।

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ.

"কেউ জানেনা, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কি লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" – সূরা সাজদা– ৩২:১৭।

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً

"......নিশ্চিতই আমরা জুলুমকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার বেষ্টনী (wall) তাদের ঘিরে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে, তাদেরকে গলিত ধাতুর মত পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মখমণ্ডল ঝলসে দেবে। এটা এক নিকৃষ্ট পানীয়। আর জাহান্নাম নিকৃষ্ট এক আবাসস্থল।"

– সূরা আল-কাহাফ– ১৮:২৯।

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً * خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً لاَّ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً –يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولاَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি; তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে এবং তারা কোন (নিরাপত্তাদানকারী) অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম'।"

– সূরা আল-আহযাব– ৩৩:৬৪-৬৬ ।

কবরের খবর

ক্ববর হলো আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রথম ধাপ ।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (র.) বলেন ঃ একজন ব্যক্তি মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে পুনরুত্থান দিবসের আগ পর্যন্ত যে সব দশার বা অবস্থার ভিতর দিয়ে যাবে– তার সবকিছুতে বিশ্বাস করাটা 'শেষ দিবসে' বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত । এর অন্ত র্ভুক্ত হচ্ছে কবরে সওয়াল-জবাবের কথা–তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহীত যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে । ঐ হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল-মুনকার ও আল-নাকির বলে দুজন ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির কাছে (কবরে) আসেন ও জিজ্ঞেস করেন, "তুমি এই ব্যক্তি [অর্থাৎ, রাসূল (স)] সম্বন্ধে কি বলতে?" অন্য হাদীসে এসেছে, দু'জন ফেরেশতা এসে ৩টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দীন কী? তোমার নাবী কে?" – মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৮৪৪৩, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৭৫৩, তিরমিযী হাঃ নং ১০৭১ ।

কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে কবরের পুরস্কার ও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে । প্রথমটিতে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বেই ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুমিনদের উপর যে রহমত বর্ষিত হয় তার বর্ণনা রয়েছে । দ্বিতীয় আয়াতে শেষ বিচারের দিনের আগেই, জুলুমকারীরা যে শাস্তি ভোগ করে তার উল্লেখ রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا۟ وَلاَ تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

"নিশ্চিতই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে তোমরা ভয় পেও না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, সেই শুভ সংবাদ গ্রহণ কর ।" – সূরা ফুসসিলাত– ৪১:৩০ ।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا۟ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

"যদি তুমি দেখতে পেতে জুলুমকারীরা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতা হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে, কেননা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে যা সত্য ছিল না ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে–'।"

– সূরা আল-আনআম– ৬:৯৩।

অনেকেই ক্বরের আযাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কবরের আযাব কি কেবল আত্মাকেই বহন করতে হয়? নাকি তা শরীরের উপরও প্রযোজ্য যা পচে গলে নষ্ট হয়ে যায়?

ইবনু উসাইমীন এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেনঃ

"কবরের এই আযাব প্রাথমিকভাবে আত্মার উপর নেমে আসা শাস্তি হলেও তা যে শরীরকে প্রভাবিত করবে না এমন কোন কথা নেই। আসলে সরাসরি না হলেও তা (শরীর) কবরের আযাব বা প্রশান্তি দুটোর কিছু অংশ অবশ্যই লাভ করবে। এই পৃথিবীর পুরস্কার বা শাস্তি দুটোই যেমন প্রাথমিকভাবে শারীরিক কিন্তু পরবর্তীতে তা আত্মার উপরও প্রভাব বিস্তার করে– তেমনি মৃত্যু থেকে নিয়ে শেষ বিচার দিন পর্যন্ত সময়কালের শাস্তি বা পুরস্কার হচ্ছে মূলত আত্মার– কিন্তু শরীরের উপরও এর প্রভাব থাকে।"

– দেখুনঃ ইবনু উসাইমীন সংকলিত রাসায়িল ফিল আক্বীদাহ পৃঃ ৩৩।

এটা কিভাবে বলা যায় যে, কবর একজন কাফিরের শরীরকে এমনভাবে চেপে ধরে যে তার বুকের পাঁজর গুঁড়ো হয়ে যায়, অথচ, কবর খুঁড়ে দেখলে দেখা যায় যে, কফিন যেমন ছিল তেমনই রয়েছে? কফিন বা মৃত ব্যক্তির কোন পরিবর্তন হয়নি?' **ইবনু উসাইমীন** এ ধরনের প্রশ্নেরও উত্তর দেন। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ

"সবচেয়ে প্রথমে যে কথাটা আসে তা হচ্ছে কবরের শাস্তি মূলতঃ আত্মার উপর প্রযোজ্য। এটা শরীর দ্বারা লাভ করা কোন অভিজ্ঞতা নয়। এটা যদি শরীর দিয়ে লাভ করা কোন অভিজ্ঞতা হতো, অথবা, চোখে-দেখা শরীরের কোন পরিবর্তনের ব্যাপার হতো, তাহলে তা আর অদৃশ্যে বিশ্বাসের ব্যাপার হতো না। আর সে বিশ্বাসের কোন মূল্যও থাকতো না। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আত্মার সাথে সম্পৃক্ত গায়েবের একটা বিষয়। কোন ব্যক্তি নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পারে যে, সে দাঁড়িয়ে আছে, সে কোথাও যাচ্ছে বা কোন জায়গায় থেকে আসছে– কাউকে প্রহার

করছে বা কারো দ্বারা প্রহৃত হচ্ছে। বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় সে এমনও দেখতে পারে যে, সে উমরা করতে গেল, কা'বার তাওয়াফ করলো, সাফা ও মারওয়া নামের উঁচু স্থানদ্বয়ের মঝে দৌঁড়ালো, মাথা মুড়ালো এবং তারপর তার নিজের আবাসস্থলে ফিরে আসলো। এই সব ঘটনার অভিজ্ঞতা যেন সে লাভ করছে, সেই গোটা সময় জুড়ে তার শরীর বিছানায়ই রইলো এবং মোটেই বদলালো না। সুতরাং আত্মার ব্যাপার-স্যাপার, শরীরের ব্যাপার-স্যাপারের চেয়ে ভিন্ন। দেখুনঃ ইবনু উসাইমীন সংকলিত রাসায়িল ফিল আক্বীদাহ পৃঃ ৩৩।

আখিরাত সম্বন্ধে আরো এমন কিছু ব্যাপার রয়েছে, যাতে বিশ্বাসীদের জ্ঞান লাভ করা উচিত এবং বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। এখানে অবকাশ নেই বলে আমরা সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করছি না তবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. রাসূল (স)-এর হাউজে কাওসার।
২. বিভিন্ন প্রকার মধ্যস্থতা বা শাফায়াত।
৩. কর্মফলের নথিপত্র বিতরণ।
৪. জাহান্নামের উপরে "সিরাত" নামক পুল অতিক্রম করা।
৫. জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ সংক্রান্ত সকল তথ্য।

শেষ দিবসে সঠিক বিশ্বাসের গুরুত্ব

শেষ দিবস ও আখিরাতের ঘটনাবলীতে বিশ্বাস এবং সেগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান কোন ব্যক্তির উপর গভীর প্রভাব ফেলার কথা– যদি সে একটু সময় নিয়ে শেষ দিবস স্মরণ করে এবং তা নিয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবে।

১. প্রথমতঃ এ থেকে একজন বিশ্বাসীর সৎকর্ম সম্পাদন করতে আগ্রহী হওয়ার কথা। কেননা, সে তখন জানে যে, এর বিনিময়ে আখিরাতে তার জন্য কি সঞ্চিত থাকবে। জান্নাতের প্রাপ্তি, যে কোন চোখ যা দেখেছে অথবা যে কোন কান যা শুনেছে এবং যে কোন মন যা কল্পনা করতে পারে, তার চেয়ে বহু বহুগুণ শ্রেয়– এক কথায় অকল্পনীয়! সবচেয়ে প্রথম যে পুরস্কার বা প্রাপ্তির কথা আসবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে তাঁকে দেখার সুযোগ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কেউ যদি এ ব্যাপারটা নিয়ে সচেতন থাকতে পারে সে তখন যেকোন সৎকর্ম সন্ধান করতে এবং সেটা সম্পাদন করতে উদগ্রীব হয়ে থাকবে।" (এর antithesies বা ঠিক বিপরীত

হচ্ছে আখিরাতে অবিশ্বাসী একজন কাফিরের অবস্থা– সে যেহেতু আখিরাতে বিশ্বাসই করে না, তাই সে এমন কোন সৎকাজ করতে পারে না, যার ফলশ্রুতিতে সে এখানে, এই পার্থিব জীবনে, কিছু পাবে না। জাগতিক প্রাপ্তি– বিশেষত ভোগ সুখের সামগ্রীর লোভই হচ্ছে তার জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি।)

২. দ্বিতীয়তঃ শাস্তির চিন্তা ঐ ব্যক্তিকে যে কোন পাপ করা থেকে দূরে রাখার কথা– সে পাপ যত ‘হালকাই’ হোক না কেন! আখিরাতে যত স্বল্প শাস্তির যোগ্যই হোক না কেন– সেই শাস্তির ভয়াবহতা নিয়ে ভাবতে পারলে, কোন পাপকর্ম করাটা কারো কাছে উপযুক্ত বা সমীচীন মনে হবে না। উপরন্তু, ঐ পাপে লিপ্ত হয়ে কেউ হয়তো তার প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং প্রিয় আল্লাহর অসন্তুষ্টি উপার্জন করতে পারে।

৩. তৃতীয়তঃ ইবনু উসাইমীনের মতে, শেষ বিচারের দিনের হিসাব-নিকাশ ও সুবিচারের ব্যাপারটা যে কোন মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি বয়ে আনা উচিত। অবিচারের প্রতি ঘৃণা পোষণ করাটা মানুষেল জন্য স্বাভাবিক। এই পৃথিবীতে প্রায়ই অবিচার ঘটতে দেখা যায়। যারা প্রতারক এবং অনৈতি, তাদের এই পৃবীতে অনেক সময়ই (আপাত দৃষ্টিতে) উন্নত ও অগ্রগামী হতে দেখা যায়– তারা যা করেছে তার জন্য কোন শাস্তি লাভ করা ছাড়াই। এটা এজন্য যে, একটা বৃহত্তর পটভূমিতে এই পৃথিবীটা চূড়ান্ত বিচার, পুরস্কার বা শাস্তির স্থান নয়। কিন্তু যারা যে দুষ্টকর্ম করছে সেটা করে তারা পার পেয়ে যাবে না। আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করে চলেছে, তার সৎকাজও বিফলে যাবে না– যেমনটা এই পৃথিবীতে কখনো কখনো মনে হতে পারে। ঐ সকল অমীমাংসিত ব্যাপারের সুবিচার-ভিত্তিক মীমাংসার জন্য একটা সময় আসবে। আর সেই সময় হচ্ছে শেষ বিচারের দিন।

الركن السادس : الإيمان بالقدر

ষষ্ঠ রুকন

ভাগ্যের ভালো মন্দকে বিশ্বাস করা

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ বা ক্বদরের ধারণায় বিশ্বাস করাটা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয। যদি কেউ তা বিশ্বাস না করে বা সন্দেহ সংশয় পোষণ করে তবে সে মুসলিম থাকবে না এবং তার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার কর্তৃক তখনই বর্ণিত হয়, যখন কিছু লোক তাঁর কাছে এসে তাঁকে বলেছিলেন যে, এমন কিছু মানুষের উদ্ভব ঘটেছে যারা ক্বদরকে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করছিল। সহীহ মুসলিমে ঘটনাটা এভাবে আসে ঃ "ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামূরের সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, বসরায় প্রথম যে ব্যক্তি ক্বদর নিয়ে আলোচনা করে, সে ছিল মা'বাদ আল-জুহানী। হামিদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-হিময়ারী সহ আমি উমরার জন্য যাত্রা করলাম এবং বললাম যে, 'আমরা যদি আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের কারো দেখা পাই, তবে তাকে আমরা ক্বদর সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবো।' অপ্রত্যাশিতভাবে মসজিদে প্রবেশ করছেন, এমন অবস্থায় আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ইবনু আল খাত্তাবের সাক্ষাৎ পেলাম। আমি এবং আমার বন্ধু তাকে ঘিরে ধরলাম। আমাদের একজন তার ডানে এবং একজন তার বাঁয়ে ছিলাম। আমি ধরে নিলাম যে, আমার বন্ধু আমাকে, আমাদের উভয়ের পক্ষ হয়ে কথা বলার অনুমতি দেবেন। তাই আমি বললাম, 'হে আবু আব্দুল রহমান (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনু উমর)! আমাদের দেশে এমন সব লোকের উদ্ভব ঘটেছে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং জ্ঞান চর্চা করেন (বা অন্বেষণ করেন)। তারপর তাদের ব্যাপার-স্যাপার ব্যাখ্যা করার পর আমি বললাম, 'তারা দাবী করেন যে, ক্বদর বলতে কিছু নেই এবং সব ঘটনাই নতুন (আলাহ্ সহ সকলের জন্যই নতুন)।' (আবদুল্লাহ ইবনু উমার) তখন বললেন, 'তোমরা যখন ঐসব লোকের দেখা পাবে, তখন তাদের বলবে যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং নিশ্চিতই আমার বিশ্বাসের জন্য তারা কোনভাবেই দায়ী নয়।' আবদুল্লাহ ইবনু উমর তখন আল্লার শপথ করলেন এবং বললেন, 'তাদের (অর্থাৎ যারা ক্বদরে বিশ্বাস করে না তাদের) কারো কাছে যদি উহুদ পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তারপর সে যদি তা (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, আল্লাহ তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ না সে ক্বদরে তার বিশ্বাস প্রত্যয়ন করে।' তিনি তারপর বললেন, 'আমার বাবা উমর ইবনু আল-খাত্তাব আমাকে বলেন......' (বলে তিনি হাদীস জিবরীল বর্ণনা করলেন।)"

ইনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন যে, ক্বদরে বিশ্বাসের চারটি স্তর রয়েছে অথবা চারটি দিক রয়েছে। কেউ যদি ক্বদরের এই চারটি দিকে বিশ্বাস না করে, তবে বুঝতে হবে যে, আল্লাহয় তার বিশ্বাস শুদ্ধ বা সঠিক নয়।

প্রথম স্তরঃ "জ্ঞান বা জানা" ঃ আর এটা হচ্ছে এই বিশ্বাস রাখা যে, কোন কিছুর অস্তিত্ব লাভের আগেই সুনির্দিষ্ট– সবকিছুর ব্যাপারেই আল্লাহ জানেন বা তাঁর জ্ঞান রয়েছে। আর এটা দু ধরণের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেগুলোকে আমরা আল্লাহর কাজ বলে উল্লেখ করি– যেমন বৃষ্টিপাত বা কোন কিছুকে জীবন দেয়া এবং ঐসব ব্যাপারগুলোকেও আমরা যেগুলোকে মানুষের কর্মকাণ্ড বলে জ্ঞান করি– উভয় শ্রেণীর বেলায় এ স্তরটি প্রযোজ্য। সকল সৃষ্টির সকল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহ আগে থেকেই অবগত– তাঁর চিরকাল স্থায়ী জ্ঞানের বদৌলতে– যা তিনি চিরস্থায়ী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সৃষ্টির আনুগত্য, অবাধ্যতা, রিযিক এবং হায়াত বা আয়ু সংক্রান্ত সকল তথ্যের ব্যাপারে আল্লাহর জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত থেকে ক্বদরের এই দিকটা বোঝা যায় ঃ

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"এবং তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবীসমূহ। তিনি ছাড়া আর কেউ সেসব জানে না এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে ও সমুদ্রে যা কিছু রয়েছে তিনি সে সম্বন্ধে সম্যক অবগত। একটা পাতাও তাঁর জ্ঞান ছাড়া ঝরে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" – সূরা আল-আন'আম– ৬:৫৯।

দ্বিতীয় স্তরঃ লিপিবদ্ধকরণ ঃ ক্বদরে বিশ্বাসের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী তৈরী করার আগেই আল্লাহ সবকিছু লিপিবদ্ধ (record) করে রেখেছেন এই বিশ্বাস পোষণ করা। সুতরাং আল্লাহ যে কেবল জানতেন এবং জানেন যে, কি ঘটবে তাই নয়, বরং তিনি আল-লাওহ আল-মাহফুজে সেসব তথ্য লিপিবদ্ধ করেও রেখেছেন এবং আল্লাহর জন্য এ কাজ কোনভাবেই কঠিন নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

"তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃবিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন। এসবই একটি কিতাবে রয়েছে– নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর কাছে সহজ।" – সূরা আল-হাজ্জ্ব– ২২:৭০।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِيۤ أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমরাতা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর জন্য তা খুবই সহজ।" – সূরা হাদীদ– ৫৭:২২।

এছাড়া রাসূল (সা.) বলে গেছেন– "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ক্বদর লিপিবদ্ধ করেন।"

তিনি [রাসূল (সা.)] আরো বলেন– "এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে।" – মুসলিম।

ইবনুল কায়্যিম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর আসলে পাঁচ ধরনের "পূর্ব-নির্ধারণ" বা "পূর্ব-লিখন" রয়েছে।

এই পাঁচটি অস্তিত্বশীল ধরণ হচ্ছে–

১. আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী আগে থেকেই পরিমাপ বা নির্ধারণ যা লাওহ মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে।

২. রুহানী জগতের নির্ধারণঃ অর্থাৎ রুহানী জগতে নির্ধারণ। কে কত বয়স পাবে। কে জান্নাতী ও কে জাহান্নামী।

৩. মায়ের জরায়ুতে থাকা অবস্থাতেই কোন ব্যক্তির জীবন সংক্রান্ত আলাহর (decree বা) নির্ধারণ। যার ভিতর রয়েছে ঐ ব্যক্তির রিযিক, আয়ু, কর্ম এবং সে সফলকাম হবে না বিফল হবে সেসব।

৪. লায়লাতুল ক্বদরের রাতে, পরবর্তী এক বছরে যা ঘটতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে বাৎসরিক নির্ধারণ।

৫. যা ঘটে তার ব্যাপারে এক দৈনিক পূর্ব-নির্ধারণ।

ইবনুল কাইয়্যিম এবং অন্যান্যদের মতে–আত-তাবারানী ও অন্যান্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ তথ্য অনুযায়ী নিম্নলিখিত আয়াতে এই ব্যাপারের (অর্থাৎ দৈনিক নির্ধারণের কথাই বলা হয়েছে–

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

"তিনি প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত ।"

– সূরা আর-রাহমান– ৫৫:২৯ । – দেখুন: শিফাউল আলীল পৃঃ ১৩-৫০ ।

তৃতীয় স্তর ঃ অস্তিত্বদানের ইচ্ছা –ক্বদরে বিশ্বাসের তৃতীয় স্তর হচ্ছে এই বিশ্বাস যে, যা কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে তা কেবল আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ীই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তিনি যদি ইচ্ছা পোষণ না করেন, তবে তা কখনোই অস্তিত্ব লাভ করবে না । আবার, এটাও সব কিছুর ব্যাপারেই প্রযোজ্য । এটা জীবন দান বা রিযিকদানের মত আলাহর কাজগুলোর বেলায় যেমন প্রযোজ্য তেমনি মানুষ যত কাজ করে সেগুলোর বেলায়ও প্রযোজ্য । আল্লাহ যতক্ষণ নির্ধারণ না করেন এবং হতে না দেন (বা অনুমোদন না দেন) ততক্ষণ কিছুই হতে পারে না ।

উদাহরণস্বরূপ এজন মানুষ আরেকজন মানুষকে গুলি করার ও হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে । কিন্তু এটা কেবল তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে, যখন আল্লাহ তা হতে দেন বা নির্ধারণ করে দেন । ঐ ব্যক্তি সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর যদি মর্জি না হয়, তবে খুনের ঘটনাটা ঘটবে না । আল্লাহ চাইলে হয়তো বন্দুকটা জ্যাম হয়ে যাবে অথবা খুনীর হাত কেঁপে ওঠে তার লক্ষ্য বিচ্যুত হবে ।

ক্বদরের এই দিকটার ব্যাপারে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে ।

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

"..... আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও পারস্পরি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু তাদের মাঝে মতভেদ দেখা দিল । ফলে তাদের কিছু সংখ্যক ঈমান আনলো এবং

কিছু সংখ্যক কুফরী করলো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"

– সূরা আল-বাক্বারা– ২:২৫৩।

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ * لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ

"এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ, তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। তোমরা চাইবে না, যতক্ষণ না জগতসমূহের প্রতিপালক চাইবেন।" – সূরা তাকভীর– ৮১:২৭-২৯।

তাদের বিশ্বাসের এই দিকটা সম্বন্ধে **ইবনু উসাইমীন** এক যুক্তিভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করছেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ যে এই সৃষ্টির মালিক, প্রতিপালক ও নিয়ন্তা তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। সুতরাং এমন হবার কোন উপায় নেই যে, সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং তাঁর রাজত্বের আওতাভুক্ত থাকবে অথচ এমন কিছু ঘটবে যা তিনি চান না। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিতে যা কিছু ঘটে থাকে, তা কেবলই তাঁর ইচ্ছা মাফিক ঘটে। কোন কিছুই কখনো ঘটতে পারে না যতক্ষণ না তিনি তা চেয়ে থাকেন। তা না হলে তাঁর রাজত্বের উপর তাঁর শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ত্রুটিযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে– কেন না তখন তাহলে এমন ব্যাপার ঘটবে, যা তিনি চাননি বা যে ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান নেই। এই ধরনের প্রস্তাবনা গ্রহণযোগ্য নয়।

– দেখুন: রাসায়িল ফিল আক্বীদাহ পৃঃ ৩৮।

চতুর্থ স্তরঃ সৃষ্টি বা অস্তিত্বদান ক্বদরে বিশ্বাসের চতুর্থ স্তর হচ্ছে, আলাহ যে সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, সব কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সব কিছুকে (সে যা তা) হতে দিয়েছেন– এই বিশ্বাস। কুরআনের বহু আয়াতে ক্বদরের এই দিকটা প্রতিফলিত হয়েছে–

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً –ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْض وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً

"কত কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরক্বান (সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী বা সনাক্তকারী এই কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তা বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর

সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।" – সূরা ফুরক্বান– ২৫:১-২।

ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُـلِّ شَـىْءٍ

"আলাহ্‌ সবকিছুর স্রষ্টা।" – সূরা আয-যুমার– ৩৯:৬২।

إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"নিশ্চয়ই আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি পূর্ব-নির্ধারিত পরিমাপ অনুযায়ী।" – সূরা আল-ক্বামার– ৫৪:৪৯।

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের এবং তোমরা যা কর তাও তৈরী করেছেন।" – সূরা সাফফাত– ৩৭:৯৬।

এ প্রসঙ্গে ইবনু উসাইমীন বলেন ঃ "সবকিছুই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। এমনকি মানবজাতির কর্মকাণ্ড গুলোও আল্লাহর সৃষ্টি। যদিও মানুষ সেগুলো তার মুক্ত ইচ্ছা ও পছন্দ মাফিক করে থাকে– তবু সেগুলোও আল্লাহর সৃষ্টি। এটা এজন্য যে, মানুষের প্রতিটি কাজই আসলে দুটো ব্যাপারের যোগফল : কাজটি করার জন্য সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা এবং কাজটি করার সক্ষমতা।

উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন আপনার সামনে ২০ পাউন্ড ওজনের একটা পাথর রয়েছে। আমি আপনাকে বললাম, 'পাথরটি আপনি ওঠান' এবং আপনি বললেন, 'আমি তা ওঠাতে চাই না।' এক্ষেত্রে পাথর ওঠাতে আপনার অনীহা, আপনাকে পাথরটি উঠানো থেকে বিরত রাখলো। আমি যদি আপনাকে আবার এই পাথরটা ওঠাতে বলি, এবং আপনি বললেন, 'ঠিক আছে আমি আপনার কথা শুনবো।' এই ক্ষেত্রে দেখা গেলো, আপনি পাথরটি ওটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু আপনার সামর্থ নেই বলে আপনি হয়তো ওঠাতে পারলেন না। এখন যদি আমি আপনাকে তৃতীয়বার বলি যে, 'পাথরটি ওঠান' এবং আমার কথা শুনলেন এবং তা মাথার ওপর ওঠালেন তবে বুঝতে হবে এক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছা ও সামর্থ দুটোই ছিল।

একইভাবে আমাদের সকল কাজই তাই আমাদের নির্দিষ্ট ইচ্ছা এবং পূর্ণ সামর্থের ফলাফল বা যোগফল। যিনি ঐ সামর্থ এবং ঐ ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহ যদি আপনাকে অক্ষম (paralyzed) করে দিতেন, তাহলে আপনার সেই সামর্থ থাতো না। আপনি যদি আপনার মনোযোগ অন্য কোন কাজের দিকে দিতেন (বা আল্লাহ যদি অন্য কাজের দিকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন) তাহলেও আপনি ঐ কাজটি সমাধা করতেন না।.....

তাহলে আমরা বলবো যে, মানুষের সকল কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি। কেননা, সেগুলো নির্দিষ্ট ইচ্ছা ও পূর্ণ সামর্থের সমন্বয়। যিনি সেই ইচ্ছা ও সামর্থ তৈরী করেছেন তিনি হচ্ছেন আল্লা। ইচ্ছা এবং সামর্থ হচ্ছে কোন একজন মানুষের দুটো বৈশিষ্ট্য, যে কোন একটা কাজ করতে চায় এবং যার সেই কাজ করার সামর্থও রয়েছে। আর যিনি ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী মানুষটিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ– সুতরাং তার ইচ্ছা ও সামর্থের মত বৈশিষ্ট্যও তাঁরই সৃষ্টি। এ থেকে বোঝা যায় যে, কিভাবে আমাদের কাজগুলোও আসলে আল্লাহরই সৃষ্টি। Ñ†`Lyb: ivmvwqj wdj AvK¡x`vn& c„t 37-39|

যা হোক, ক্বদরের ধারণাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু প্রশ্ন ও ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অবকাশ নেই বলে আমরা এখানে সেসবের বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না। তবে সংক্ষেপে **জাফর শেখ ইদ্রিস** সে সবের বেশ কয়টি সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু সৃষ্টির আগেই তিনি জানেন (এবং তিনি না জানার কোন প্রশ্নই ওঠে না) যে, প্রতিটি মানুষ কিভাবে সেই স্বাধীন ইচ্ছাকে ব্যবহার করবে। উদাহরণস্বরূপঃ একজন নবী যখন তার কাছে আল্লাহর বাণী ব্যাখ্যা করবেন, তখন তার প্রতিক্রিয়া কি হবে। একজন ক্বাদারী (যে কিনা ক্বদরের ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে) বলতে পারে যে, 'আমাদের যদি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা থাকে, তবে আমরা সেই ইচ্ছার স্বাধীনতা এমনভাবে ব্যবহার করতে পারি, যা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আমরা যদি দাবী করি যে, সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও পূর্বনির্ধারণ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তবে তা ঠিক হবে না।' এই সমস্যা

সমাধান দিতে গিয়ে কুরআন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহই চেয়েছেন যে আমাদের ইচ্ছা (বা অনিচ্ছা) থাকবে এবং তিনিই আমাদের সেই ইচ্ছা প্রয়োগ করার অনুমোদন দেন। (এখানে তিনি সূরা আল-ইনসানের ২৯-৩০ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দেন)। এখানে একজন কাদারী হয়তো বলবে, 'তাই যদি হয় তবে তো তিনি আমাদের সকল খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতেন!' হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি তা পারতেন। কুরআনে তিনি বলছেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে, এই পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনতো; তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?" – সূরা ইউনূস– ১০:৯৯।

কিন্তু তিনি চেয়েছেন যে, মানুষের স্বাধীনভাবে বেছে নেবার ক্ষমতা থাকবে– বিশেষতঃ বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ব্যাপারগুলো। (আল্লাহ বলেনঃ)

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

"বলুন, এই সত্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে, সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান কর।" – সূরা কাহাফ– ১৮:২৯।

এখানে কেউ বলতে পারে 'আমাদের কর্মকাণ্ড গুলো যদি তাঁর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো আসলে তাঁরই কাজ।' এ ধরনের প্রতিবাদের জন্ম হয় এক ধরনের বিভ্রান্তি থেকে। আমরা যা চাই, আল্লাহ তা চেয়েছেন এই অর্থে যে, তিনি আমাদের চাইবার ক্ষমতাটুকু দান করেছেন এবং ঐ চাওয়াকে বাস্তবায়িত করার সামর্থটুকু অনুমোদন বা দান করেছেন। অর্থাৎ তিনি সে সবকিছুও সৃষ্টি করেছেন যার ফলে আমাদের জন্য কোন কার্য সমাধা করা সম্ভব হয়। তবে তাঁর ইচ্ছাটা– কোন কিছু করবার ইচ্ছার মত ইচ্ছা নয়– বরং অনুমোদনের যে ইচ্ছা সেরকম একটা ইচ্ছা। তা না হলে এটা বলা যথার্থ হতো যে, যখন আমরা খাই, পান করি বা ঘুমাই– আল্লাহই এই কাজগুলো সমাধা করেছেন। আল্লাহ এই সব কাজগুলো সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি সেগুলো সম্পাদন করেন না। এই ধরনের আরেকটা বিভ্রান্তি থেকে আরেক শ্রেণী প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এই বলে যে, আল্লাহ আমাদের

খারাপ কাজ করার অনুমতি দেন– তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে, তিনি খারাপ কাজ অনুমোদন করেন এবং পছন্দ করেন। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, কাউকে কোন একটা কিছু করতে দেয়া (অর্থাৎ, পরীক্ষার খাতায় যেমন কেউ ভুল লিখছে, একজন পরীক্ষক পাশ দিয়ে যেতে যেতে তা দেখেও ঐ ছাত্রকে ভুল লিখতে দেন।) এক ব্যাপার– আর তার সেই কাজ ইতিবাচকভাবে অনুমোদন করা এবং তাকে সে কাজে উৎসাহ দেয়া বা বাহবা দেয়া হচ্ছে আরেক ব্যাপার।..” – দেখুন: ইনি হলেন জিবরীল পৃঃ ২৭০-২৭১।

ভাগ্যের ভালো ও মন্দ পর্যায়

হাদীছে জিবরীলের কোন কোন বর্ণনায় ‘ভালো ও মন্দ’ কথাটুকুর পরে ‘মিষ্ট ও টক’ কথাগুলো এসেছে। **আল-মুদাবাগী** বলেন যে, এখানে ভালো হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য আর মন্দ হচ্ছে, আল্লাহর অবাধ্যতা। মিষ্টি হচ্ছে, আত্মার কাছে যা প্রিয় বা পছন্দনীয়। যেমন– বৃষ্টি, সুস্বাস্থ্য এবং এ ধরনের ভালো জিনিসগুলো আর টক হচ্ছে, আত্মার কাছে যা কষ্টকর যেমন অসুস্থতা বা ব্যাধি।

এ প্রসঙ্গে ইনুল কাইয়্যিম বলেন যে, এখানে মন্দ বলতে মানুষের নিরিখে যা মন্দ তাই বোঝানো হচ্ছে– আল্লাহর নিরিখে মন্দ নয়। ‘মন্দ’ হচ্ছে মানুষের অজ্ঞতা, ভুল, জুলুম ও পাপ ইত্যাদি কর্মের কর্মফল। কিন্তু আলাহ্ সেগুলো ঘটতে দিয়েছেন এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব লাভ করতে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর প্রতি কোন মন্দ আরোপ করা যাবে না– আল্লাহর নিরিখে যে কোন কাজেরই ভালো দিক রয়েছে এবং প্রজ্ঞা রয়েছে– কেননা তা অবশ্যই আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফলাফল। এ ধরনের যে কোন কাজেরও আবার অন্তর্নিহিত মঙ্গল থাকবে এবং তা নির্ভেজাল মন্দ হতে পারে না। রাসূল (স)-এর হাদীস এই ধারণাকে সমর্থন করে ঃ “কোন মন্দ তোমার উপর আরোপিত হবার নয় (হে আল্লাহ্)।” Ñ gymwjg|

এটা এজন্য যে, প্রতিটি ঘটনা ঘটার পেছনেই কিছু প্রজ্ঞা এবং কিছু ভালোত্ব (বা goodness) রয়েছে এবং তা নির্ভেজাল মন্দ বা দোষণীয় হতে পারে না। কোন ব্যক্তি সেরকম মনে করতে পারে যে, কোন একটা কাজ বা

ঘটনায় কেবল মন্দই রয়েছে– কিন্তু বাস্তবে আল্লাহর সৃষ্টিতে যা কিছুই ঘটে সব কিছুর পেছনে প্রজ্ঞা ও মঙ্গল রয়েছে।

ইবনু উসাইমীন এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা উদাহরণ দেন। আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

মানুষের কৃতকর্মের জন্য স্থলভাগে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি তিনি আস্বাদন (taste) করান, যাতে তারা (তওবা করে) ফিরে আসে।" – সূরা আর-রূম– ৩০:৪১।

এই আয়াতে আল্লাহ যে, ফাসাদ পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে তার কথা বলেন, এর কারণ এবং ফলাফলের কথাও বলেন। ফাসাদ এবং ফাসাদের কারণ দুটোই দুষ্ট (বা evil)। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটোর পরিণতিতে একটা কল্যাণ রয়েছে– আল্লাহ, তারা যা করেছে তার অংশ বিশেষের জন্য তারেদ শাস্তি দেন, যাতে তারা অনুশোচনা করে এবং ফিরে আসে। সুতরাং ঐ ফাসাদের পেছনেও একটা প্রজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্য এবং প্রজ্ঞা থাকতে ঐ ফাসাদ একটা নির্ভেজাল অনিষ্ট বা অমঙ্গল না হয়ে কল্যাণময় একটা ব্যাপারে পরিণত হয়। নির্ভেজাল অনিষ্ট বা দুষ্ট ব্যাপার হবে এমন একটা বিষয়, যার সাথে কোনভাবেই কোন মঙ্গল সম্পৃক্ত থাকবে না। আল্লাহর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ফলে এমন কোন অনিষ্টের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবই নয়। এমনকি শয়তান সৃষ্টিটাও নির্ভেজাল অনিষ্ট বা অমঙ্গল নয়–এর পেছনেও প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময় ব্যাপার রয়েছে।

– বিস্তারিতের জন্য দেখুন: ইনি হলেন জিবরীল পৃঃ ২৭৩-২৭৪।

ক্বদরে সঠিক বিশ্বাসের সুফল

১. যখন কোন ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে এবং তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে হয়– তখন সে আসলে নিজেকে, আল্লাহর কর্মকাণ্ডে বা রুবুবিয়াতে যে কোন প্রকারের শিরক থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে সহজেই। সত্যিকার অর্থে সৃষ্টির একজনই মাত্র সৃষ্টিকর্তা বা প্রতিপালক রয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা ও অনুমোদন ছাড়া কিছুই ঘটে না। কারো অন্তরে যখন

এই সত্যটা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন সে বোঝে যে, আর কারো কাছে প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়ার বা কারো উপর নির্ভর করারও কোন মানে হয় না– কেবল সেই একজন প্রভু ছাড়া আর কেউ সেই মর্যাদা লাভ করার যোগ্যও নয়। তখন সেই ব্যক্তি, তার সকল ইবাদাত বা ইবাদাতের কর্মকাণ্ড সেই একজনের জন্য নিবেদিত করে– যিনি সকল কিছু নির্ধারণ ও অনুমোদন করেন। সুতরাং ক্বদরে সঠিক বিশ্বাস তাওহীদ আল-রুবুবিয়াহ এবং তাওহীদ আল উলুহিয়াহ সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে পালন করার সামর্থ যোগায়।

২. একজন ব্যক্তি তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে। যখন সাধারণভাবে যে কেউ কার্যকারণের নিয়মগুলো মেনে চলবে– যেগুলো পৃথিবীতে বাহ্যত ঘটতে দেখা যায়। তবে তার উপলব্ধি করা উচিত যে, আল্লাহ যতক্ষণ অনুমোদন না করবেন বা চাইবেন, ততক্ষণ কেবল ঐ কার্যকারণ দিয়ে কোন কাজ হবে না। সুতরাং কোন বিশ্বাসী কখনোই কেবলই নিজের কাজ বা বাহ্যত যে জাগতিক ব্যাপারগুলোর উপর তার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে মনে হয়– সেগুলোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবে না। তার পরিবর্তে কোন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যেটুকু চেষ্টা করার প্রয়োজন, সেটুকু করে সে কাঙ্খিত ফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করবে।

৩. ইবনু উসাইমীন যুক্তি দেখান যে, ক্বদরে সঠিক বিশ্বাস যে কাউকে দুর্বিনীত ও অহঙ্কারী হওয়া থেকে বিরত রাখে। কেউ যদি কাঙ্খিত কোন লক্ষ্যে পৌঁছায়, তবে সে জানে যে, তা কেবল এজন্য সম্ভব হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর করুণাবশতঃ তার জন্য তা নির্ধারণ ও অনুমোদন করেছেন। আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে নানা প্রবিন্ধকতা সৃষ্টি করে তাকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো থেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন। সুতরাং কোন একটা লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করে দুর্বিনীত হওয়ার পরিবর্তে, সে যদি সত্যিকার অর্থে ক্বদরে বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তবে, সে বরং আল্লাহর কাছে তাঁর রহমতের ব্যাপারে কৃতজ্ঞ থাকবে!

৪. আল-ক্বদরে সঠিক বিশ্বাস মানুষের মনে প্রশান্তি ও শান্তি এনে দেয়। যে কেউ অনুধাবন করে যে, জীবনে বা পৃথিবীতে যা কিছুই ঘটে সবই আলাহর নির্ধারণের ফলে ঘটে থাকে। এছাড়া আল্লাহ যা কিছু করেন, তার পেছনে এক প্রজ্ঞা রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রিয়জন অথবা এই পৃথিবীর কোন সম্পদ হারায়– সে শোকে-দুঃখে তখন উন্মাদ হয়ে যায়

না অথবা নিরাশ হয়ে সকল আশা ত্যাগ করে না। তার পরিবর্তে সে উপলব্ধি করে যে, ঘটে যাওয়া ঘটনাটাই আল্লাহর ইচ্ছা আর তাকে তাই সেটা মেনে নিতে হবে। তাকে আরো বুঝতে হবে যে, যা ঘটেছে নিশ্চয় তা কোন কারণ ও উদ্দেশ্য বশত ঘটেছে। তা কাকতালীয়ভাবে বা দুর্ঘটনাবশত ঘটেনি– অর্থাৎ কোন কারণ ছাড়া এমনি এমনি ঘটেনি। আল্লাহ বলেন ঃ

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِيۤ أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَاكُمْ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমি সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছো তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তার জন্য যেন উচ্ছ্বসিত না হও। আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদের পছন্দ করেন না।"

– সূরা আল-হাদীদ– ৫৭:২২-২৩।

৫. ক্বদরে বিশ্বাস কোন ব্যক্তিকে সাহস ও শক্তি যোগায়। সে জানে যে, আলাহ তার আয়ু এবং তার রিযিক তার জন্য নির্ধারণ করে লিখে রেখেছেন। এসব ব্যাপারগুলো কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আসে এবং তিনি তা নির্ধারণ করেই রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহর পথে সংগ্রাম বা যুদ্ধ করতে গিয়ে তার ভয় পাবার কোন কারণ নেই– কেননা, তার মৃত্যুর সময় লিপিবদ্ধ রয়েছে। একইভাবে তার রিযিকের ব্যাপারেও তার কারও তোয়াক্কা করার প্রয়োজন নেই, কেননা, সেসবও কেবলই আল্লাহর কাছ থেকে আসে এবং সেসবও ইতোমধ্যেই তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যদি আল্লাহ নির্ধারণ করে থাকেন যে, সে কোন উৎস থেকে তার রিযিক লাভ করবে, তবে কোন মানুষ তা রোধ বা রহিত করতে পারবে না।

দ্বিতীয় অংশ

شهادة أن محمدا عبده ورسوله

মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল

তাঁর উপর কিভাবে ঈমান আনতে হবে।

هو الاقرار باللسان والاعتقاد الجازم بالقلب بأنه محمد بن عبد الله الهاشمى القرشى عبد الله ورسوله أرسله الله إلى جميع الخلق من الإنس والجن مخلوق من الطين والنطفة كسائر البشر فتميز عنهم بالوحى والمعجزات

মুখে স্বীকার করা ও অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষন করা যে, কুরাইশ গোত্রের হাশিম বংশের আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর গোলাম ও তাঁর রাসুল, জ্বিন ও মানবজাতির জন্য তাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি অন্যান্য মানুষের ন্যায় মাটি ও নুত্বফার তৈরী, নূরের নয়, অহী ও মু'জিযার দ্বারা সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক। এই ঈমানের দাবী (সংক্ষেপে) :

تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه ويؤثر، وعدم مخالفته بالقول والعمل والنقص والزيادة وعدم الإطراء فيه برفعه من البشرية أو إعطائه الوصف الذى يختص بالله سبحانه وتعالى من الحى القيوم وعالم الغيب والشهادة ودراسة حياته لمعرفة ما كان عليه من العبادات والاداب والأخلاق والدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله وغير ذلك من جوانب حياته .... من العروة الوثقى بتصرف وزيادة

তাঁর দেয়া সকল সংবাদ মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, সকল নির্দেশ মেনে চলা, সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা, তার দেয়া নিয়ম পদ্ধতি ব্যতীত আলাহর ইবাদত না করা, কথা ও কাজে বা কম ও বেশীর মাধ্যমে তার হিদায়াতের বিপরীত না চলা। তার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করে তাকে মানবপ্রকৃতি থেকে বের না করা (নূরের নবী বলে) কিংবা আল্লাহর জন্য খাছ কোন বৈশিষ্ট বা গুণ তার জন্য সাব্যস্ত না করা যেমন এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনি জীবিত বা তিনি গায়েব জানেন।

তাঁর জীবন চরিত রোমন্থন করা, তাঁর ইবাদতের ত্বরীকা ও পদ্ধতি, তাঁর আদব আখলাক্ব, তাঁর দাওয়াত-তাবলীগ, জিহাদ এবং জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ সম্পর্কে জানা। উম্মতের উপর যে সমস্ত হক্ব রয়েছে তা যথাযথভাবে আদায় করা।

حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

উম্মতের উপর রাসুল (সা.) এর কতিপয় হক্ব:

أولا : الإيمان به

এক : সত্যিকার অর্থে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা:

মুহাম্মাদ (সা.) আলাহ্র নির্বাচিত সত্য আখিরী নবী। তিনি নিজে নিজে বিনা দলীল-প্রমাণে নবী হননি। আমাদের নবী (সা.) এর সত্যতা প্রমাণের জন্য বহু দলীল রয়েছে। ইতিপূর্বে আসমানী গ্রন্থে তাঁর নাম ও গুণাবলী সহ উল্লেখ এসেছে। ইয়াহুদ ও নাসারা (খ্রীষ্টান) ধর্মের অনেক আলিম তাঁকে চিনেও ছিলেন। অত:পর নবুওত লাভের পর অসংখ্য মু'জিযা দ্বারা তার সত্যতাকে আরো বহুগুণে প্রবল করা হয়েছে। বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ আল-কোরআন একটি অন্যতম মু'জিযা। এরপর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, ইসরা মি'রাজ, সহ আরো অসংখ্য মু'জিযা দান করা হয়েছিল। এসব মু'জিযা তাঁর সত্যতা প্রমাণ করে।

তার উপর ঈমান আনার জন্য আলাহ্ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তার উপকারীতা ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। আর ঈমান না আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধমকি ও শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আল্লাহ বলেন: অতএব ঈমান আনো আল্লাহর উপর তাঁর রাসূলের উপর এবং সেই নূরের উপর (কুরআনের) উপর যা অবতীর্ণ করেছি। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। – তাগাবুন ৮।

فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِ ٱلأُمي ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَ ٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূল উম্মী (নিরক্ষর) নবীর উপর যিনি ঈমান রাখেন আল্লাহর উপর এবং তার বাণীসমূহের উপর। আর তার অনুসরণ করো নিশ্চয় হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। – সূরা আ'রাফ ১৫৮।

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো, তিনি তোমাদেরকে তার দ্বিগুণ রহমত দান করবেন এবং তোমাদেরকে এমন নূর দান করবেন যাতে তোমরা পথ চলতে পারবে, আর

তোমাদের (পাপসমূহকে) ক্ষমা করে দিবেন, আর আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। – সূরা হাদীদ ২৮।

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে না আমরা সেই কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে রেখেছি।– সূরা ফাতহ ১৩।

নবী (ছঃ) বলেছেন:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويومنوا بى وبما أرسلت به (رواه مسلم)

আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে মানুষের সঙ্গে লড়াই করার জন্য যে পর্যন্ত তারা এই সাক্ষ্য প্রদান না করে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ প্রকৃত উপাস্য নেই এবং আমার ও আমার আনীত বস্তুর (রিসালাতের) উপর ঈমান না আনে। – মুসলিম।

والذى نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بى وبما ارسلت الا كان من أصحاب النار (رواه مسلم)

ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে এই উম্মতের ইহুদী ও খৃষ্টানের যে কেউ আমার (আবির্ভাবের) সম্পর্কে শুনবে অতঃপর আমার উপর এবং আমি যা কিছু নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে তাকে অবশ্যই নরকবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।
– হাদীছটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

ثانيا : طاعته واتباعه

দুই : যথাযথ ভাবে তাঁর (ছ:) অনুসরণ ও আনুগত্য করা:

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে বহু আয়াতে আনুগত্যের অপরিসীম গুরুত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন।

কোন সময় اتباع অনুসরণ/আনুগত্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কোন সময় الطاعة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কোন সময় أسوة নমুনা বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করো এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন সময় তাঁকে ফয়সালাকারী হিসাবে গ্রহণ করার উপর কঠোর তা'কীদ প্রদান করা হয়েছে।

কোন সময় তার দেয়া বিধানে সীমাবদ্ধ থাকতে ও তাঁর নিষেধকৃত বিষয় ও বস্তু থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাঁর অনুসরণের সাথে তাঁর রাসূলের অনুসরণ একত্রে উল্লেখ করেছেন। কোন আয়াতে রাসূলের অনুসরনকে স্বয়ং তাঁর অনুসরণ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

অনুসরণ ও আনুগত্য করার নির্দেশ সূচক দলীল সমূহ:

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করো এবং জেনে শুনে তাঁর থেকে বিমুখ হইও না।

– সূরা আনফাল ২০।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো ও তার রাসূলের অনুসরণ করো এবং তোমাদের (ইসলামী শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচিত) নেতাদের। আর যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ করো তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (কুরআন ও হাদীছ) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করো যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। এটাই সর্বোত্তম ও পরিণতির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা। – সূরা নিসা ৫৯।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً

যে ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুসরণ করে, আর যে বিমুখ হবে তাদের জন্য আপনাকে প্রহরী করে পাঠাইনি।

– সূরা নিসা ৮০।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُ ملَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ

বলুন তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো এবং রাসূলের অনুসরণ করো, আর যদি বিমুখ হও, তবে তাঁর ভার তাঁর উপর আর তোমাদের ভার তোমাদের উপর। আর তোমরা যদি তাঁকে অনুসরণ কর তবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর রসূলের উপর অর্পিত দায়িত্ব হল প্রকাশ্য ভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।
– সূরা নূর ৫৪।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ

রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও। – সূরা হাশর ৭।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

আপনার প্রতিপালকের শপথ তারা মু'মিন নয় যতক্ষণ আপনাকে তাদের মাঝে সংঘটিত বিবাদের বিচারক নির্ধারণ করে অত:পর আপনার কৃত ফায়সালাকে দ্বিধাহীনচিত্তে শিরোধার্যভাবে মেনে না নেয়।
– সূরা নিসা ৬৫।

এ আয়াতের একাধিক নাযিল হওয়ার কারণ পাওয়া যায়। একটি কারণ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

اخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما' فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب فاتيا إليه فقال الرجل قضى رسول الله على هذا' فقال: ردنا إلى عمر فقال: أكذلك؟ قال: نعم' فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما' فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذى قال: ردنا إلى عمر فقتله فانزل الله (فلا وربك..) الاية' مرسل غريب' فى اسناده ابن لهيعة' وله شاهد أخرجه الرحيم فى تفسيره من طريق عتبة بن ضمرة عن ابيه /لباب النقول

ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদুওয়ায়হ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ দু'জন লোক রসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট ঝগড়ার জের নিয়ে আসল। তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করলেন। যার বিপক্ষে ফয়সালা হল তিনি বললেনঃ চল উমার বিন খাত্তাবের নিকট যাব। অতঃপর উভয়ে তাঁর নিকট আসল এবং যে ব্যক্তির অনুকুলে বিচারের সিদ্ধান্ত ছিল তিনি বললেনঃ

রসুলুল্লাহ (ছঃ) যে বিচার করেছেন এর প্রতিকুলে যাওয়ায় সে বলল চল “উমারের নিকট যাই।” তিনি (উমার) বললেনঃ এরূপই ঘটনা? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। অতঃপর উমার রাযিঃ বললেন তোমরা দু’জন এখানেই থাক। আমি (বাড়ীর ভিতর যেয়ে) বেরিয়ে এসে তোমাদের বিচার করবো। কিছুক্ষণ পর তলওয়ার সহকারে বেরিয়ে এলেন এবং যে বলেছিল চল উমারের কাছে যাই– তাকে তলওয়ার মেরে হত্যা করলেন, অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেনঃ “ফালা ওয়ারাব্বিকা ....” আয়াতের শেষ পর্যন্ত। হাদীছটি মুরসাল গারীব। (অর্থাৎ যঈফ) এর সনদে ইবনু লাহীআহ আছে এই জন্য। তবে এর সহযোগী বর্ণনা রয়েছে যা আব্দুর রহীম তার তাফসীরে আতবাহ বিন যামরাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।

– লুবাবুন্ নুকুল পৃঃ ১৪২, ছহীহ সনদে আরো কয়েকটি নাযিলের কারণ বা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

কোন মু’মিন ও মু’মিনার জন্য উচিৎ নয় যে, আল্লাহ ও তার রাসূল কোন সিদ্ধান্ত নিলে বা ফয়সালা করলে তাতে তাদের কোন ইখতিয়ার থাকবে। – আহযাব ৩৬।

أخرج الطبرانى بسند صحيح عن قتادة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهو يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت فانزل الله (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الاية فرضيت وسلمت ـ لباب النقول

ত্বব্রাণী ছহীহ সনদে কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নবী (ছঃ) যায়নাব কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যায়নাব প্রথমে মনে করেছিলেন যে, তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন। কিন্তু যখন জানলেন যে, নিজের জন্য নয়, যায়েদের জন্য তখন প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করলেন। ...এরপর তিনি রাযি হয়ে গেলেন এবং আত্মসমর্পণ করলেন। অর্থাৎ যায়েদের সাথে বিবাহ বসলেন। – লুবাব ৩৯৭।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً

তোমাদের ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে যে, আল্লাহর সাক্ষাত (বা সন্তুষ্টি) আখিরাতের, সফলতা কামনা করে ও বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে। – সূরা আহযাব ২১।

من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله (رواه البخارى)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে আমার অনুসরণ করলো সে স্বয়ং আল্লাহরই অনুসরণ করলো আর যে আমার অবাদ্ধতা (নাফরমানী) করলা সে স্বয়ং আল্লাহরই নাফরমানী করলো। – ছহীহ বুখারী।

তিনি আরো বলেছেন:

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين' تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (أحمد وابو داود والترمذي)

শক্তভাবে ধারণ করো আমার সুন্নাতকে ও আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত সঠিকপথের উপর প্রতিষ্ঠিত উত্তরাধিকারী সাহাবীদের সুন্নাতকে, একেবারে চোয়ালের দাঁত দ্বারা ধারণ করবে। ধর্মের ভিতর নবাবিস্কৃতি থেকে সাবধান! কারণ ধর্মের ভিতর প্রতিটি নবাবিস্কৃতই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই হলো ভ্রষ্টতা। – আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ ও মুসলিম।

নাসাঈতে বৃদ্ধি সহকারে এসেছে :

وكل ضلالة في النار

আর প্রত্যেকটা ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به (رواه في شرح السنة) وقال النووى فى اربعينه هذا حديث صحيح وعزاه إلى كتاب الحجة وصحح إسناده -

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার মনমস্তিস্ক (চিন্তা-চেতনা) আমার আনীত বস্তুর (কুরআন হাদীছের) অনূকুলে না হয়। – ইমাম বাগাভী শারহুস্ সুন্নাহ্ কিতাবে বর্ণনা করেছেন

এবং নববী তাঁর গ্রন্থে – "কিতাবুল হুজ্জাহ" এর উদ্ধৃতিতে তার সনদকে ছহীহ বলেছেন। তবে আলবানী এর সনদকে দুর্বল বলেছেন।

يتم الإيمان به بالتزام القرأن والسنة معًا

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার অবলম্বন

রসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর ঈমান আনতে হবে ক্বুরআন সুন্নাহর অবলম্বনে। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে তিনি রাসূল (সা.) তার প্রতি কুরআন নাযিল হওয়াতেই তিনি রাসূল হয়েছেন। আর তাঁকে আল্লাহ বোবা করে পাঠাননি বা কুরআন বুঝানোর অধিকার হরন করেননি। বরং সেই কুরআন বুঝানোর দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 44

আমি আপনার উপর যিকর (গ্রন্থ)টি নাযিল করেছি এ জন্য যে, লোকদের উদ্দেশ্যে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা আপনি বর্ণনা করে দেন। আর যাতে তাদের জন্য চিন্তা করা সম্ভব হয়। –নাহল– ৪৪।

অন্যত্রে বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। – সূরা হাশর : ৭।

সুতরাং তিনি ক্বুরআনের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাও কুরআনের মত গুরুত্ব সহকরে মানতে হবে। এটা কি করে হতে পারে যে, নবী (সা.) থেকে কুরআনের শব্দগুলো নিব অর্থ নিব না? এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। কুরআন বুঝানোর জন্য তিনি যে সব বাক্য ব্যবহার করেছেন তাই সুন্নাহ বা হাদীছ। কুরআনের ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে সুন্নাহরও কঠোর ব্যবস্থা ও নিয়মাবলীর মধ্য দিয়ে হিফাযাত করা হয়েছে। অতএব যারা কুরআন মানার দাবী করে কিন্তু সুন্নাহ অমান্য করে, তারা কুরআনেরই

অমান্যকারী। তাদের মু'মিন মুসলিম হওয়ার দাবী মিথ্যা। তারা প্রকৃতপক্ষে নবীর বিরোধী এক প্রকার কাফির এতে কোন সন্দেহ নেই।

أضرار ومفاسد مخالفته

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণের পরিপন্থী কাজ করার ক্ষতি ও পরিণতি:

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

যারা তাঁর (রাসূলের) নির্দেশের পরিপন্থী চলে তারা যেন এই ভীতির মাঝে থাকে যে, যে কোন সময় ফিতনার (বিপদের) মাঝে পতিত হবে কিংবা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। – সূরা নূর -৬৩|

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (হুকুমের) অবাদ্ধতা করবে সে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত হবে। – সূরা আহযাব ৩৬।

অন্যত্র বলেছেন

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাদ্ধতা করবে এবং তাঁর সীমারেখা অতিক্রম করবে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন যার মধ্যে চিরকাল বসবাস করবে। আর তার জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। – সূরা নিসা ১৪।

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করো। খবরদার তোমাদের আমলগুলি বিনষ্ট করো না।

– সূরা মুহাম্মাদ ৩৩।

অর্থাৎ যে আমল আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী এবং রাসূল (সা.) এর তরীকা অনযায়ী না হবে তা বিনষ্ট, তার কোন সওয়াবই সে পাবে না, পরিমাণে যতই বেশী হোক না কেন।

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ

বলুন: তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং রসূলের, এরপর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না।

– আলূ ইমরান –৩২।

হাদীছে এসেছে :

عن أنس قال : جاء ثلاثة رهط إلى بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم' فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها' فقالوا أين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر' فقال أحدهم: أما أنا فاصلى الليل أبدا' وقال الأخر: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر' وقال الأخر: انا أعتزل النساء فلا اتزوج (بهن) أبدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ اما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له' ولكنى أصوم وافطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء' فمن رغب عن سنتي فليس مني – (متفق عليه)

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের কোন স্ত্রীর (আয়েশার) নিকট এসে নবী (সা.) এর ইবাদতের ব্যাপারে জানতে চাইলো। যখন বলা হলো তখন তারা তা সামান্য মনে করলো এবং বললো আমরা নবী (সা.) এর তুলনায় কোথায়? তার তো অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেয়া হয়েছে। অত:পর তাদের একজন বললো: আমি সর্বদা সারা রাত্রি নামায পড়বো। অন্যজন বললো: আমি সর্বদা দিনে রোযা রাখবো কোন দিন রোযা ছাড়বো না। তৃতীয় জন বললো আমি মহিলাদের থেকে পৃথক থাকবো। কখনোও বিবাহ করবো না। অত:পর রাসূলুল্লাহ তাদের নিকট এসে বললেন: তোমরাই কি এই এই কথা বলেছিলে? জেনে রেখ আমি সবচেয়ে আল্লাহকে ভয় করি আমি তোমাদের সবার চেয়ে পরহেযগার বান্দা। অথচ আমি রোযা রাখি আবার ছেড়েও দেই। (নফল রোযার ক্ষেত্রে) নামায পড়ি আবার ঘুমাই ও। নারীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি (নয়টি স্ত্রী রয়েছে)। এই ভাবে ইবাদত করাই

আমার সুন্নাত বা পদ্ধতি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়। – বুখারী ও মুসলিম।

অপর হাদীছে এসেছে:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا' أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ فقد جئتكم بها بيضاء' نقية' ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى رواه البيهقي في شعب الايمان وأحمد

জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) থেকে এমন সময়ের কথা বর্ণনা করেন যখন উমার (রা.) তার নিকট এসে বললেন: নিশ্চয় আমরা ইহুদীদের নিকট এমন কিছু হাদীছ পাই যা আমাদেরকে চমৎকৃত করে। আপনি কি মনে করেন–এগুলোর কিছু কি আমরা লিখে নিব? তিনি বললেন: তোমরা কি ইহুদী ও নাসারাদের মত দিশেহারা হতে চাও? আমি যা তোমাদের নিকটই নিয়ে এসেছি তা সাদা ও স্বচ্ছ। স্বয়ং মুসা (আ.)ও যদি থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তারও উপায় ছিল না।

– এটি আহমাদ ও বায়হাক্বী শয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

অপর একটি হাদীছে এরূপ এসেছে:

وفي رواية عن جابر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله! هذه من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل! ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله' رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا' وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتى لاتبعنى (رواه الدارمى، وحسنه الألبانى فى مشكاة المصابيح 63/1 رقم 194/177

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমার (রা.) একদিন তাওরাতের একটি কপি নিয়ে এসে বলেছিলেন হে আল্লাহর রাসুল এটা তাওরাতের একটা কপি। আল্লাহর রাসুল (সা.) চুপ রইলেন, অত:পর উমার (রা.) পড়া শুরু করলেন এবং এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চেহারা মুবারক পরিবর্তন হতে শুরু করল। আবু বাকর (রা.) বললেন: (উমরকে উদ্দেশ্য করে) তোমার জন্য ক্রন্দনকারীরা ক্রন্দন করুক। অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক। দেখনা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চেহারার কি পরিবর্তন হয়েছে। উমার

(রা.) রাসূল (সা.)এর চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন আল্লাহর নিকট তার ক্রোধ ও রাসূলের ক্রোধ থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহকে রব্ব হিসাবে ইসলামকে একমাত্র ধর্ম হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (সা.) নবী হিসাবে গ্রহণ করে রাযী হয়েছি। এ কথা শুনে রাগ প্রশমিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন আজ মুসা-ও যদি প্রকাশ লাভ করতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে তবু সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যেতে। যদি তিনি বেচে থাকতেন এবং আমার নবুওতের সময়কাল পেতেন তবে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন। – দারেমী। শাইখ আলবানী এটিকে মিশকাতে হাসান বলেছেন। পৃঃ ১/৬৩ হাদীছ নং ১৭৭ ও ১৯৪।

অত্র হাদীছ থেকে পরিস্কার বূঝা যায় যে, আল্লাহর রাসুল (সা.) ব্যতীত অন্য যত বড়ই সৎ লোক বা অলি-দরবেশ বা ইমাম হোক তার সুন্নাত বা কথার বিরুদ্ধে এক মুহুর্তের জন্য-ও তাদের অনুসরণ করা চলবে না। এমনিভাবে যত বড় পণ্ডিত বা আলেমের লিখা কিতাব হোক না কেন কুরআন ও হাদীছের বিরুদ্ধে ক্ষণিকের জন্যও মানা চলবে না।

আরো বুঝা গেল যে, যারা একথা বলে যে, কুরআন ও হাদীছ শুধু বরকত লাভের জন্য এবং মাসলা মাসায়েলের জন্য নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের ফিকাহই যথেষ্ট। তাদের একথা বলা ও তার উপর আমল করা জঘণ্যতম অপরাধ। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মুসলমানী থাকায় দ্বিধাযুক্ত। দু:খজনক হলেও সত্য যে, বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা খ্যাতিমান বড় বড় মাযহাবী আলিমগণও এমন আক্বীদা পোষণ করেন। আল্লাহ তাদের সঠিক পথ দান করুন। সত্যিকার হাক্কানী আলিম বানান।

অপর পক্ষে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নামে বা স্বার্থে কুরআন সুন্নাহ বাদে কাফির রাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত সংবিধান, তন্ত্রমন্ত্র ও মতবাদ যেমন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, নাস্তিকতাবাদ এসবই কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছের আলোকে ইসলামের সাথে এমন সাংঘর্ষিক যে ওসব কিছুর সমর্থকদেরকে ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত করে দেয় এবং কাফিরদের গণ্ডিভূক্ত করে দেয়।

فضائل وفوائد طاعته واتباعه

আল্লাহর রাসুল (সা.) এর অনুসরণ ও আনুগত্য করার শুভ পরিণতি:

আল্লাহ বলেন:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً.

যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করলো এবং রাসূলের, সে চরম সফলতা অর্জন করলো। – সূরা আহযাব ৭১।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালূ। Ñ m~iv Av‡j-Bgivb 31|

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ

যদি তোমরা তাঁর অনুসরণ করো তাহলে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।

– সূরা নূর ৫৪।

وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর তাঁর অনুরণ করো অবশ্যই হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।

– সূরা আ’রাফ ১৫৮।

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করো নিশ্চয় রহমত প্রাপ্ত হবে। – আল ইমরান ১৩২।

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ.

আর যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুসরণ করবে তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন বসবাস করবে, আর এটাই তো হলো বিরাট সফলতা।

– সূরা নিসা ১৩ ।

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰٓئِكَ رَفِيقاً

যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করবে তারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা– নবীগণ সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীল বান্দাগণের সাথে (জান্নাতে) থাকবে, কতইনা সুন্দর সাথী তাঁরা । – সূরা নিসা ৬৯ ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى (رواه البخاري)

আমার উম্মতের প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে অস্বীকার করবে । বলা হলো কে আবার (জান্নাতে প্রবেশ করতে) অস্বীকার করবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: যে আমার অসুনরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্যতা করবে সেই অস্বীকার কারী । – বোখারী ।

صفة اتباعه

অনুসরণের রূপ রেখা ও ধরণ:

রাসুলুল্লাহ (ছঃ) এর অনুসরণের রূপ বা ধরণ হলো কম বা বেশী না করে ঠিক আল্লাহর রাসূল (ছঃ) যেভাবে বলেছেন ও করেছেন এবং যত পরিমাণ ও সংখ্যায় করেছেন সেই অনুযায়ী করতে হবে ।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল ।

রাসূলের অনুসরণ খাঁটি ও নিখুত করার জন্য একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যা বলেছেন, করেছেন ও সমর্থন দান করেছেন সেটা করা বলা ও সমর্থন করা সুন্নাত, নবীর সাথে খাছ প্রমাণিত ব্যাপার গুলি ছাড়া । এমনিভাবে সাহাবাগণ যা বলেছেন ও করেছেন ও সমর্থন করেছেন সেটাও সুন্নাত ।

পক্ষান্তরে তাঁরা (নাবী ও তাঁর সাহাবীগণ) যা করেননি, বলেননি, ও সমর্থন করেননি বা নিষেধ করেছেন তা না করা, বা না বলা বা ছেড়ে দেয়াই সুন্নাত । এবং তা করাই হলো বিদ‘আত ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

ان الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها - رواه الدارقطنى وصححه النووى

নিশ্চয় আল্লাহ (আমার মাধ্যমে) তোমাদের উপর অনেক ফরয আরোপ করেছেন সেগুলো বিনষ্ট করো না। অনেক সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না। অনেক কিছুই হারাম করেছেন সেগুলোর হুরমত ক্ষুন্ন করো না এবং অনেক বিষয়ে চুপ রয়ে গেছেন (অর্থাৎ এটা কর বা করো না কিছু বলেনি) তোমাদের প্রতি দয়া বশত: ভুল ক্রমে নয়, সুতরাং (এ জাতীয় বিষয় করতে ও বলতে যাওয়া তো দূরের কথা) খোঁজ করতে যেও না। এটিকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন এবং নবভী ও অপর মুহাদ্দীছগণ হাসান বলেছেন। – জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৪২।

তিনি আরো বলেন: ذرونى ما تركتم (رواه مسلم)

আমি যে বিষয়ে (বর্ণনা করতে) তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি সে বিষয়ে আমাকে (প্রশ্ন করা) ছেড়ে দাও।

হাদীছটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। (এটি একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ)

উপরোক্ত ধরণ ও পদ্ধতি অনুসরণকারীদের জন্য জান্নাতের সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة' قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة' وتصوم رمضان' قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا انقص منه' فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا (متفق عليه)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন এক পল্লীবাসী নবী (সা.) এর নিকট এসে বললেন আমাকে এমন কিছু আমলের নির্দেশ দিন যা পালন করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে আর তার সাথে বিন্দুমাত্র কোন কিছুকে শরীক করবে না। ফরয ছলাত প্রতিষ্ঠা করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে। রামযানের ছিয়াম পালন করবে। (শুনার পর) বলল ঐ যাতের শপথ যার হাতে আমার জীবন রয়েছে। আপনি যা বললেন এর

চেয়ে কমও করব না বেশীও করব না। এই বলে যখন সে ফেরৎ যাচ্ছিল নবী (সা.) বলেছিলেন: যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোক দেখতে আগ্রহী সে ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখো। – বুখারী, মুসলিম।

অন্য হাদীছে এসেছে:

وفى رواية : أفلح الرجل إن صدق وفى رواية : دخل الجنة إن صدق

লোকটি যদি সত্যিই তাই করে (যা বলে গেল) সে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে গেল, অপর বর্ণনায় এসেছে : সে জান্নাতে প্রবেশ করে গেছে যদি সত্যিই তাই করে বা বলে গেল।

مجالات الاتباع والابتداع

রাসূলুলাহ (সা.) এর অনুসরণের ক্ষেত্র সমুহ বা সুন্নাত বিদআত চিহ্নিত করার মৌলনীতি সমূহ :

এরূপ ছয়টি ক্ষেত্র/ বা মৌলনীতি বা উপায় রয়েছে।

এক: কারণ ভিত্তিক অনুসরণ করতে হবে –অর্থাৎ রাসূলুলাহ (সা.) কোন কারণের সাথে ইবাদত বা আমল জড়িত করে থাকলে তাঁর অনুসরণ করে আমরা ঐ কারণের সাথে ইবাদত বা আমল জড়িত করবো। এমনিভাবে যে সমস্ত কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)এর যুগে বিদ্যমান ছিল কিন্তু তাঁর সাথে ইবাদত বা আমল জড়িত করেন নি, তাঁর অনুসরণ করে আমরাও সেই কারণের সাথে কোন ইবাদত বা আমল জড়িত করবো না। উদাহরণ:

১। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ দেখা দিলে রাসুলুল্লাহ (সা.) صلاة الكسوف ও صلاة الخسوف গ্রহণের নামায পড়তেন। আমরাও ঐ কারণে তাঁর অনুসরণ করে ঐ নামায পড়বো।

২। মদীনায় এসে, রাসূল (সা.) ইয়াহুদদেরকে মুহাররম মাসের দশ তারিখে (عاشوراء) রোযা রাখতে দেখলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কেমন রোযা রাখ? তারা বললো এটা সেই শুভদিন যেই দিনে আল্লাহ তা'আলা বানু ইসরাঈল (মুসা ও তার সম্প্রদায়) কে তাদের শত্রুর (ফিরআউন ও তার বাহিনীর) হাত থেকে পরিত্রাণ দান করেছিলেন,তাই মুসা

(আ.) এই দিন (শুকরিয়া স্বরূপ) রোযা রেখেছিলেন এ জন্য আমরাও রাখি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: أنا أحق بموسى منكم মুসা (আ.) এর পরিত্রাণের কারণে শুকরিয়া করার আমি তোমাদের চেয়ে বেশী হকদার। অত:পর তিনি রোযা রাখলেন এবং সাহাবাদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মু'মিনদেরকে আল্লাহ তাআলা ইহুদীসহ যে কোন বিধর্মীর বিপরীত করার নির্দেশ দিয়েছেন এই জন্য রাসূল বলেছিলেন:

لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك (رواه مسلم)

যদি আগামী বৎসর আল্লাহ জীবিত রাখেন তাহলে নবম তারিখেও রোযা রাখবো। কিন্তু এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। – মুসলিম।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগে বিদ্যমান ছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সাথে কোন ইবাদত বা আমল জড়িত করেন নি আমরাও তার সাথে কোন ইবাদত বা আমল জড়িত করবো না। ইবাদত জড়িত না করাই সুন্নাত ও নেকীর কাজ এবং জড়িত করাই হলো বিদআত ও গুনাহর কাজ।

উদাহরণ:

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম দিবস উপস্থিত হওয়ার কারণে মিলাদ মাহফিল করা, বা জন্মের কারণে ঐ দিনকে স্মরণ করে কোন ইবাদত যেমন দরূদ ও জন্মকাহিনী বর্ণনা করে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে সমবেত কণ্ঠে সুর ঝংকারের সাথে নিজেদের রচিত দরূদ পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম দিবস বা জন্মের কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগেও ছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এই কারণের সাথে কোন ইবাদত বা আমল জড়িত করেন নি। কাজেই রাসূলের অনুসারী বলে দাবী করলে বা রাসূলের প্রেমিক হওয়ার আকাঙ্খা রাখলে ঐ কারণের সাথে কোন ইবাদত বা আমর যোগ করা চলবে না। কেউ জড়িত করলে তা বিদআত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসণের রূপ রেখা ও ধরণ সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান না থাকার কারণে বা তাকলীদের (দেখাদেখির) ভিত্তিতে বিরাট সংখ্যক মুসলমান আলিম ও জনসাধারণ এই বিদআতে নিমজ্জিত। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ট লোক করে বলে ও اتباع সম্পর্কীয় সুক্ষ্ম জ্ঞান শূণ্য বহু আলিম করে বলে অনেক আলেম ও জনসাধারণ এটাকে সঠিক বা সওয়াবের কাজ বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ

চেষ্টাও করে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের রূপরেখার সুক্ষ্মভাব বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

২. ইসরা ও মি'রাজ: এটা একটা বিরাট মু'জিযা ও উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য এক বিরাট গৌরব ও অহঙ্কারের কারণ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এই কারণের সাথে কোন প্রকার ইবাদত বা আমল জড়িত করেন নি। কাজেই নবী প্রেমিক মুসলমানদের উচিত হলো ঐ কারণের সাথে আমল বা ইবাদত জড়িত না করা। যদি কেউ করে তবে তা বিদআত ও গুনাহের কাজ হবে।

ইবনু আব্বাস থেকে মিরাজের রাত্রির (২৭শে রজব) এর ব্যাপারে যে, ঘটনা বর্ণনা করা হয় তা বিদআতীদের বানানো মিথ্যা ও জাল বানোয়াট কথা। এমনিভাবে ইবনু সুলতান নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে ঘট্না বর্ণনা করা হয় সেটাও মিথ্যা ও বানোয়াট। – দেখুন আস-সুনান ওয়াল মুবতাদিআত ১৪৩-১৪৪, ও তাহযীরুল মুসলিমীনা আনিল ইবতিদাই ফিদ দ্বীন- উর্দু অনুদিত ৬৫০-৬৫৬ পৃঃ।

দুই: প্রকার ভিত্তিক: অর্থাৎ যেই প্রকার বা যেই জাতীয় আমল ও ইবাদত রাসূলুল্লাহ (সা.) করতেন ঐ জাতীয় আমল ও ইবাদত (খাছগুলি ব্যতীত) আমরাও করবো। ইবাদতের মধ্যে যেই জাতীয় দু'আ কালাম তিনি পড়তেন আমরাও ঐগুলি পড়বো। যেই জাতীয় জিনিস বা বস্তু তিনি হালাল করেছেন ঐ জাতীয় বস্তু ও জিনিস আমরাও হালাল করবো। যেই জাতীয় কাজ, বস্তু ও জিনিস হারাম করেছেন আমরাও হারাম জানবো। এভাবে আমল করাই সুন্নাত, এর বিপরীত করা-ই হলো বিদআত ও পাপের কাজ।

উদাহরণ:

১। নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেই জাতীয় দুআ-কালাম পড়তেন তা হচ্ছে এই: তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে নামায আরম্ভ করতেন এরপর চুপিচুপি স্বরে ছানা পড়তেন। তারপর সূরা ফাতিহা ও যে কোন একটি সুরা বা কিছু আয়াত পাঠ করতেন। তাকবীর দিয়ে রুকু করতেন সামিআল্লাহু বলে রুকু থেকে উঠতেন। রুকুর ভিতর সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" পড়তেন। উঠে রাব্বানা লাকাল হামদু পাঠ করতেন। অত:পর তাকবীর দিয়ে সিজদায় যেতেন। সিজদায় "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" বলতেন, তাকবীর দিয়ে, সিজদা থেকে উঠে আল্লাহুম্মাগফিরলী অরহামনী ওয়াহদিনী অআ'ফিনী,

ওয়ারযুক্বনী” পড়তেন, অত:পর দ্বিতীয় সিজদা দিতেন, তাতে ঐ তাসবীহ পাঠ করতেন। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পর আততাহিয়্যাতু...... তাশাহহুদ পাঠ করতেন, কোন হাদীছে পাওয়া যায় দরূদও পড়তেন। ফজরের নামায হলে এর সঙ্গে আরো অন্যান্য দুআ মাছুরা পাঠ করে আসসালামু আলাইকুম বলে দু'দিকে সালাম দিয়ে ছলাত শেষ করতেন। মাগরিব নামায হলে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ে উঠে আরো এক রাকআত, যোহর, আছর ও ইশার নামায হলে দু'রাকআত পড়ে তাশাহহুদ, দরূদ ও অন্যান্য দু'আয়ে মা'ছুরাহ পড়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ বলে ডানে বামে সালাম ফিরে নামায শেষ করতেন। প্রতিটি কাজ ধীর স্থিরতার সাথে পালন করতেন। এই হলো হাদীছ থেকে পাওয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)এর নামাযের বিবরণ।

নামাযে যে জাতীয় দুআ-কালাম ও তাসবীহ রাসূলুল্লাহ (সা.) পড়তেন তার ভিতর নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া....... বিভিন্ন ওয়াক্তের নামাযের বিভিন্ন গঁদবাধা নিয়তের মুখে উচ্চারণ করে কিংবা মনে মনেও পড়েন নি। তবে নিয়ত অবশ্যই করতেন। গঁদবাধা নিয়তে শব্দগুলি কুরআন, হাদীছ ও উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কোন ফিকার কিতাবেও নেই। চার ইমামের কোন ইমাম থেকেও এই সমস্ত শব্দভিত্তিক নিয়ত বর্ণিত হয়নি। কাজেই প্রমাণিত হল যে, নিয়ত পড়া খাঁটি বিদআত, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ পর্যন্তও নেই। এ কথা বুঝে আসবে না একমাত্র ঐ ব্যক্তির যার মস্তিস্ককে গোঁড়ামী ও বিদআত নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এমনিভাবে নামাযের পূর্বে মুছাল্লার দু'আ। কোনদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন এক ওয়াক্তেও পড়েননি, দুনিয়ার কোন কুরআন সুন্নাহভিত্তিক বড় কিংবা ছোট আলেমও পড়েননি ও পড়ে না। একমাত্র মাযহাবীরা তথা কুরআন হাদীছের সুক্ষ্ম অনুসরণ থেকে বহুদূরে অবস্থানকারী তথাকথিত মুর্খ সমাজের দৃষ্টিতে বড় আলিমরাই পড়ে থাকেন, ফতোওয়া দিয়ে থাকেন ও তাদের পুস্তকে লিখে থাকেন। আমার এই ক্ষুদ্র লিখনীটা দেখে রাগান্বিত হয়েই হোক না কেন একবার যদি আল্লাহ তাদের এই ব্যাপারে হাদীছ দেখার তাওফীক দিতেন আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকবীরে তাহরীমার পর ফাতিহা পড়ার পূর্বে চুপি স্বরে কিছু দু'আ পড়তেন যেটাকে ছানা বলা হয়। এই দু'আ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন শব্দ এসেছে। কোন নামাযে সুবহানাকা ..... কোন নামাযে আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বাইয়া...... কোন নামাযে ইন্নি ওয়াজ্জাহতু অজ্‌হিয়া লিল্লাযী.... পড়তেন। এই তিনটি ছাড়াও হাদীছের কিতাবে আরো কয়েকটি দু'আ এসেছে। এ সমস্তই তাকবীরে তাহরীমার পর সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে পড়তেন।

এক্ষণে তাকবীরে তাহরীমার পর ইন্নী ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া.... পড়ার দলীল উল্লেখ করছি।

عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين (رواه أحمد ومسلم والترمذي وابو داود وغيرهم)

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন অত:পর বলতেন: ইন্নী ওয়াজজাহতু লিলাযি... । – হাদীছটি ইমাম আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ও অন্যান্যগণ তাদের স্বস্ব হাদীছগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২। যেই জাতীয় মহিলা বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ (সা.) হারাম করেছেন সেই জাতীয় মহিলা বিবাহ করা হারাম জানতে হবে। যেই জাতীয় মহিলা বিবাহ করা হালাল করেছেন সেই জাতীয় মহিলা বিবাহ করা হালাল জানতে হবে।

৩। যেই জাতীয় পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েয তাদের থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) মহিলাদেরকে পর্দা করতে বলেছেন, তারা কে তাদের থেকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। এবং যাদের সাথে বিবাহ হারাম তাদের থেকে পর্দা না করলে অসুবিধা নেই বলেছেন তাদের থেকে পর্দা না করলে অসুবিধা নেই।

৪। যেই জাতীয খাদ্য পানীয় হারাম করেছেন সেই জাতীয খাদ্য ও পানীয় হারাম জানতে হবে।

তিন: সংখ্যা ও পরিমাণ ভিত্তিক অনুসরণ: ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) যে সংখ্যা ও পরিমাণ দিয়েছেন ঠিক ঐ পরিমাণ ও

সংখ্যার ভিত্তিতে ইবাদত ও আমল করতে হবে। এর ভিতর কোন হেরফের করা চলবে না। নইলে তা বিদআতে পরিণত হয়ে যাবে। উদারহণ:

১। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত পড়া ফরয। এর কম ও বেশী ওয়াক্ত পড়া চলবে না।

২। সমর্থশালীদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয বলেছেন, একবারই ফযর জানতে হবে। এর অধিক যতবার করতে পারবে সুন্নাত হবে।

৩। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যে ওয়াক্তের যত রাকআত নির্ধারণ করেছেন তত রাকআতই পড়তে হবে। এর কম ও বেশী করা চলবে না। কম ও বেশী করলে ইসলাম থেকে বহির্ভূতকারী বিদআত হবে।

৪। যাকাত ফরযের জন্য নির্দিষ্ট নিসাব নির্ধারণ করেছেন, ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ এর টাকা পয়সা বা ধন সম্পদ হলে যাকাত দিতে হবে। এই নিসাবের ভিতর হেরফের করা চলবে না। নিসাব পরিমাণ ধনসম্পদ হওয়ার পর ১ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে যাকাত না দেয়া সাংঘাতিক বড় পাপ হবে, হাদীছের আলোকে অনেক বিদ্যানের নিকট কাফির হওয়ার কথাও পাওয়া যায়। নিসাবের পূর্বে যাকাত দেয়া বৈধ নয়, দিলে ওটা সাদাকাহ হিসাবে দিতে হবে। কিন্তু নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর ১ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে তা (অগ্রীম) যাকাত বলেই গণ্য হবে।

যাকাতুল ফিতর ১ ছা' দিতে হবে। অর্ধ সা দিলে চলবে না। দিলে রাসূলুল্লাহ (সা.)এর সুন্নাহ পরিপন্থী বিদআত হবে।

৬। তারাবীহ ১১ রাকআত পড়া রাসূলের সুন্নাতের নিখুত অনুসরণের দাবী। বেশী পড়া অনেকে বিদআত বলেছেন। এমনকি আলামাহ আলবানীও বিদআত বলেছেন।

৭। এক সফরে একটি হজ্জ ও উমরাহ করেছেন। একাধিক করেন নি। না তাঁর নিজের জন্য না অন্য কোন আত্মীয়ের জন্য। এমনিভাবে তাঁর ছাহাবা (রা.) গণও নয়। যদি কেউ এক সফরে একাধিক হজ্জ বা উমরা করে। চাই নিজের জন্য চাই অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের জন্য তাহলে তা রাসূলের পরিপন্থী ও বিদআত হবে।

চারঃ পদ্ধতি ভিত্তিক অনুসরণঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) যে ইবাদত যে পদ্ধতিতে করতেন বা করতে বলেছেন ঐ পদ্ধতিতেই করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা হলে অনুসরণ ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং বিদআতের দরজা উম্মুক্ত হবে।

উদাহরণঃ

রাসূলূল্লাহ (সা.) যে পদ্ধতিতে ছলাত পড়েছেন বা পড়তে বলেছেন ঐ পদ্ধতিতে পড়তে হবে। তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পাঠ করে সূরা ফাতিহা পড়তেন আমাদেরকেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, ছলাত আদায় করতে হবে। সূরা ফাতিহার পর ছানা পড়া চলবে না। কেউ পড়লে বিদআত হবে।

এমনিভাবে যে কোন একটি সূরা বা কিছু আয়াত পড়ার পর সূরা ফাতিহা পড়াও বিদআত হবে। রুকুর পূর্বে সিজদা করলে বিদআত হবে। যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পদ্ধতি জানার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ পদ্ধতির ব্যতিক্রম করে পড়ে তবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনিভাবে প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে ইচ্ছুক এবং বিদআত বিদ্বেষী তাদের উচিত প্রতিটি ইবাদত ও আমলকে হাদীছে বর্ণিত পদ্ধতির সাথে তুলনা করে বা মিলিয়ে দেখা উচিত।

বিভিন্ন হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশও দিয়েছেন যেমন ছলাতের ক্ষেত্রে বলেছেনঃ

صلوا كما رأيتمونى أصلى (بخارى)

তোমরা ঠিক ঐ পদ্ধতিতে ছলাত পড়ো যে পদ্ধতিতে আমাকে ছলাত পড়তে দেখ। বোখারী

হজ্জের ক্ষেত্রে বলেছেনঃ خذوا عنى مناسككم (بخارى)

তোমরা আমার থেকে হজ্জের পদ্ধতি শিখে নাও। – বুখারী।

কেউ যদি যিল-হজ্জের ৮ তারিখে উকুফে আরাফাহ ও ৯ তারিখে মিনা ও ১০ তারিখে মুযদালিফায় অবস্থান করে তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পদ্ধতির অনুসরণ না করার কারণে এই ব্যক্তির হজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে। অবশ্য ১০ তারিখের কাজগুলি (জামরাতুল কুবরাকে পাথর মারা, কুরবাণী

করা, মাথা নাড়া বা চুল ছোট করা, তাওয়াফে ইফাযা) এর ভিতর ধারাবহিকতা ক্ষুন্ন হলে হজ্জের কোন অসুবিধা হবে না। তবে উত্তমের পরিপন্থী হবে। অবশ্য রাসুল (সা.) বলেছেন: অসুবিধা নেই। যদি না বলতেন তবে অসুবিধা ছিল।

পদ্ধতিগত কারণে ও প্রকারভিত্তিক অনুসরণের মানদণ্ডে প্রতি ফরয ছলাতের পর প্রচলিত পদ্ধতিতে ইমাম ও মুক্তাদির সম্মিলিত দু'আ বিদআত। পদ্ধতিগত কারণে বিদআত এ জন্য যে, নবী (সা.) প্রতি ফরয ছলাতের পর একাকী দু'আ যিকর-আযকার করতেন সম্মিলিত ভাবে নয়, তাই সম্মিলিত দু'আ নবীর বিপরীতে হওয়ায় বিদআত বলে গণ্য। আর প্রকারভিত্তিক অনুসরণের মানদণ্ডে এ জন্য যে, যে প্রকার দু'আ ও যিক্‌র-আযকার নবী (সা.) পাঠ করতেন সেগুলো বাদ দিয়ে নিজেদের চয়নকৃত দু'আ পাঠ করা হয়। আরো এ জন্য বিদআত যে, নবী (সা.) সালাতের পর এক বচনের পাঠ করার দু'আই শুধু শিখিয়েছেন। সম্মিলিত দু'আর জন্য লোকেরা নিজেদের পক্ষ থেকে বহুবচনের শব্দ বিশিষ্ট দু'আ পাঠ করে।

পাঁচ: সময় ভিত্তিক অনুসরণ: রাসূলুল্লাহ (সা.) যেই সময় যেই ইবাদত করেছেন বা করতে বলেছেন ঐ সময় ঐ আমল বা ইবাদত করতে হবে। এমনিভাবে যেই সময় ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন ঐ সময় ঐ ইবাদত করা চলবে না।

উদাহরণ: ১। যোহরের ছলাত পড়তে বলেছেন, সূর্য পূর্বাকাশে ঢলে যাওয়ার পর। কাজেই কেউ যদি এর পূর্বে বেলা ১০টায় পড়ে তবে তার ছলাত হবে না। কিংবা যোহরের সময় আসরের নামায ও আসরের সময় যোহরের নামায পড়লে হবে না। এমনিভাবে মাগরিবের নামায আসরের সময় পড়লে চলবে না। কিন্তু শারঈ কারণবশত: যোহর আছর ও একত্রে (আলাদা ইকামত ও আলাদা সালামে) পড়া চলে। এমনিভাবে মাগরিব ও ইশাও।

২। আল্লাহ তাআলা শুধু রামাযান মাসে ২৯ বা ৩০ দিন ছওম রাখা ফরয বলেছেন। কাজেই এই ফরয ছওম শুধু রামাযান মাসেই করতে হবে। রামাযানের পরিবর্তে অন্য কোন মাসে এই ছওম করা চলবে না। হ্যাঁ, তবে কেউ শারঈ কারণবশত: পূর্ণ রামাযানের রোযা না রাখতে পারলে অন্য মাসে তা কাযা করে নেয়ার নির্দেশ কুরআনে ও হাদীসে এসেছে।

৩। এমনিভাবে হজ্জের মাসেই শুধু হজ্জ করা চলবে, বছরের অন্য কোন মাসে হজ্জ করা চলবে না। এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ। কেউ যদি অন্য কোন মাসে হজ্জ করে তবে তাঁর হাজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে। রাসূল (সা.) এর হাদীছ থেকে হজ্জের সময়সীমা জানার পর যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য কোন মাসে হজ্জ করা জায়েয ঘোষণা দেয় বা পালন করে তবে সে মুসলমানই থাকবে না।

৪। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) জুমআর নামায পড়ার দিন ধার্য করেছেন জুম্‌আহ বার (শুক্রবার)। যদি কেউ শনিবার বা অন্য কোন বারে জুমআর ছলাত আদায় করে তবে তা হারাম কাজ বলে গণ্য হবে। যারা জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রবার ব্যতীত অন্য কোন বারে জুমআর ছলাত প্রতিষ্ঠা করবে তারা ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে।

৫। শুধু জুমআর দিন বা রাত ইবাদতের জন্য খাছ করা নিষেধ করেছেন। রাসূল বলেনঃ

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة لصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم (رواه مسلم)

তোমরা রাত সমূহের মধ্যে জুমআর রাতে বিশেষ করে কিয়ামুল্লাইল (তাহাজ্জুদ) পড়ো না। এমনিভাবে শুধু জুমআর দিনে বিশেষ করে ছিয়াম পালন করো না। হ্যাঁ, তবে কারো ছিয়ামের দিন হলে সেটা ভিন্ন কথা।

– মুসলিম।

* যে সমস্ত সময়ে নামায পড়া নিষেধ করেছেন যেমন সুর্য উঠার সময়, সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়, ঠিক মাথার উপর সুর্য থাকে ঐ সময়। ফজরের ছলাতের পর থেকে সুর্য উঠার পূর্ব, আছরের ছলাতের পর থেকে সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত। কারণ কাযা ব্যতীত ঐ সমস্ত সময়ে ছলাত পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে কারণ বিজড়িত নামাযের বিষয়টি ব্যতিক্রম।

ছয়ঃ স্থান ভিত্তিক অনুসরণঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) যেই স্থানে যে ইবাদত ও আমল করতেন বা করতে বলেছেন ঐ স্থানে ঐ ইবাদত বা আমল করতে হবে। আর যে স্থানে ইবাদত বা আমল করতেন না বা করতে নিষেধ

করেছেন, সেই স্থানে ইবাদত করা চলবে না। এর বিপরীত করলে বিদআত হবে। উদাহরণ:

১। নবী (সা.) ফরয ছলাত মাসজিদে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সুন্নাত ও নফল ছলাত বাড়ীতে পড়া উত্তম বলেছেন। এমনকি আজান শোনার পর কেউ শারঈ কারণ ব্যতীত মাসজিদে জামাআতের সাথে ছলাত না পড়ে বাড়ীতে পড়লে উক্ত নিয়মের বিপরীত করলে বিদআত হবে তার ছলাত হবে না বলেও ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়। উক্ত নিয়মের বিপরীত করলে বিদআত হবে।

২। হজ্জ আদায়ের জন্য শুধু মক্কা মুকাররমাহ হবে নির্ধারণ করেছেন। কাজেই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও হজ্জ হবে না। কেউ যদি জেনে শুনে অন্য কোন কোথাও হজ্জ করে বা করার নির্দেশ করে তবে সে ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে।

৩। ছলাতের জন্য শুধু কা'বা মুকাররমাহ্‌কে রাসূল (সা.) কিবলা নির্ধারণ করেছেন। অন্য কোন স্থানকে কিবলা বানালে ঐ ব্যক্তি মুসলমান থাকবে না। হ্যাঁ, তবে দিক হারিয়ে কিংবা ভুলক্রমে যদি অন্য দিকে মুখ করে ছলাত আদায় করে ফেলে তাহলে সে দোষমুক্ত এমনকি তার ছলাতও শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৪। রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি মাসজিদ ব্যতীত ইবাদতের উদ্দেশ্যে আর অন্য স্থানে যাওয়া কড়াকড়ি নিষেধ করেছেন। কাজেই এর ব্যতিক্রম করে অন্য কোথাও এমনকি কোন নাম করা বড় মাসজিদেও যাওয়া যাবে না। কোন মাযার, দরগাহ ও দরবার এমনকি টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমায়ও নয়।

৫। মাসজিদ ব্যতীত আর কোথাও ই'তিকাফ করা চলবে না, কারণ কুরআন ও হাদীছে শুধু মাসজিদে ই'তিকাফ করার কথা-ই উল্লেখ হয়েছে। বাড়ীর উল্লেখ কোন আয়াতে বা হাদীছে নেই। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিষয় সমান। উক্ত কথার উপর সকলেই একমত পোষণ করেছেন শুধু হানাফী মাযহাবের কিছূ সংখ্যক আলিম ব্যতীত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার ও আহমাদের নিকট শুধু ঐ সমস্ত মাসজিদে জায়েয যে সমস্ত মাসজিদে ছলাত প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাহিলাদের জন্য বাড়ীকে ই'তিকাফের স্থান নির্ধারণ করা আল্লাহ ও রাসূলের উপর মাতব্বরী ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে তাদের দলীল হলো নিজেদের মস্তিস্ক। মহিলা পুরুষের সবার জন্য

ই'তিকাফের স্থান হলো মাসজিদ তার দলীল সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াত ও সহীহ বুখারীর হাদীছ। দেখুন কিতাবুল ই'তিকাফ এর প্রথম তিনটি হাদীছ এমনিভাবে দেখুন বাবু ই'তিকাফিন নিসা।

৬। তাওয়াফের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কা'বাকে খাছ করেছেন। কাজে অন্য কোথাও কোন কবরে বা মাযারে তাওয়াফ করা রাসূলের তরীকার পরিপন্থী শিরকে আকবার বা বড় শির্ক বা বড় বিদ'আত হবে।

সুন্নাহ অনুসরণের রূপরেখা এবং সুন্নাত ও বিদআত চিহ্নিত করার মৌলনীতি সমূহের আলোকে কতিপয় বিদ'আতী আক্বীদাহ ও আমলের তালিকা দেখুন ১৭৭ পৃষ্ঠা হতে ...... পৃষ্ঠা।

ثالثا : محبته

তৃতীয় হক্ব :

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ভালবাসা:

রাসূলুল্লাহ (সা.)কে ভালবাসা দু'ভাগে বিভক্ত:

(ক) তাঁর যাত (দেহ) কে ভালবাসা:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ.

আপনি বলে দিন– তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী, তোমাদের বংশের লোক, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা মন্দা পড়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসগৃহ যা তোমরা পছন্দ কর– আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর আদেশ (আযাব-গযব এর) আসা পর্যন্ত। আলাহ্‌ ফাসিক লোকদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন না। – সূরা তাওবা – ২৪।

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب أليه من والده وولده والناس أجمعين (متفق عليه)

আনাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তাঁর সন্তান, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয়তর না হই। – বুখারী ও মুসলিম।

আরো একটি হাদীছে এসেছে–উমার (রা.) বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জীবন ছাড়া সবকিছুর চেয়ে বেশী প্রিয়। নবী (সা.) বলেছিলেন: যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ করে বলছি যতক্ষণ তোমাদের জীবনের চেয়েও প্রিয়তর না হবো ততক্ষণ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না। অত:পর উমার (রা.) বললেন: আল্লাহর শপথ করে বলছি এখন আপনি আমার জীবনের চেয়েও বেশী প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন এবার পূর্ণ মু'মিন হয়েছ। – বুখারী।

সাহাবীগণ শুধু মৌখিক ভাবে ভালবাসার স্বীকৃতি দেননি, বরং বাস্তবে তাঁর জন্য জীবন দিয়ে প্রমাণও করেছিলেন।

খুবাইব (রা.)কে শূলে চড়ানোর পূর্বে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল হে খুবাইব! যদি তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সা.)কে শূলে দেয়া হয় তবে রাজী আছ? তিনি (রা.) বলেছিলেন: আমার জীবনের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পায়ে একটি সাধারণ কাটা বিদ্ধ করাও আমি সহ্য করব না। সেদিন কাফেররাও একবাক্যে স্বীকার করেছিল মুহাম্মাদকে তার সাথীরা যেমনভাবে ভালবাসে আর কেউ তাদের নেতাকে এত বেশী ভালবাসে না বা ভালবাসতে দেখা যায় না।

(খ) রাসূলুল্লাহ (সা.)এর সুন্নাত ও আদর্শকে ভাল বাসা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছে:

من أحيا سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معي فى الجنة (رواه الترمذي)

যে আমার সুন্নাতকে জিন্দা করে প্রকৃতপক্ষে সেই আমাকে ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে।

সুন্নাতকে ভালবাসার দাবী হল: তার সুন্নাতের অবমাননা হতে না দেয়া। উমার (রা.) এর ঘটনা যেমনটি প্রমাণ করে।। খাঁটি মুমিন হতে হলে রাসূল (সা.) কে উভয় প্রকারের ভালবাসা এক সঙ্গেই বাসতে হবে। শুধু

যাতকে ভালবেসে সুন্নাতকে ভাল না বাসলে মুমিন হওয়া যাবে না। এমনি ভাবে সুন্নাত ভালবেসে তার যাতকে ভাল না বাসলেও মুমিন হওয়া যাবে না।

رابعا: التحاكم إليه والرضا بحكمه

চতুর্থ হক্ব:

তার ফায়সালা বা সিদ্ধান্তকে নি:শর্ত ও নির্দ্বিধায় শিরোধার্য ভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মানতে হবে।

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করো এবং জেনে শুনে তাঁর থেকে বিমুখ হইও না।

– সূরা আনফাল ২০।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো ও তার রাসূলের অনুসরণ করো এবং তোমাদের (ইসলামী শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচিত) নেতাদের। আর যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ করো তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (কুরআন ও হাদীছ) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করো যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। এটাই সর্বোত্তম ও পরিণতির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা। –সূরা নিসা ৫৯।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً

যে ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুসরণ করে, আর যে বিমুখ হবে তাদের জন্য আপনাকে প্রহরী করে পাঠাইনি।

– সূরা নিসা ৮০।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُ ملَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ

বলুন তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো এবং রাসূলের অনুসরণ করো, আর যদি বিমুখ হও, তবে তাঁর ভার তাঁর উপর আর তোমাদের ভার তোমাদের উপর। আর তোমরা যদি তাঁকে অনুসরণ কর তবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর রসূলের উপর অপির্ত দায়িত্ব প্রকাশ্যভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।

– সূরা নূর ৫৪।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ

রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও। – সূরা হাশর ৭।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

আপনার প্রতিপালকের শপথ তারা মু’মিন নয় যতক্ষণ আপনাকে তাদের মাঝে সংঘটিত বিবাদের বিচারক নির্ধারণ করে অত:পর আপনার কৃত ফায়সালাকে দ্বিধাহীনচিত্তে শিরোধার্যভাবে মেনে না নেয়। Ñ m~iv wbmv 65|

এ আয়াতের একাধিক নাযিল হওয়ার কারণ পাওয়া যায়। একটি কারণ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

اخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما’ فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب فاتيا إليه فقال الرجل قضى رسول الله على هذا’ فقال: ردنا إلى عمر فقال: أكذلك؟ قال: نعم’ فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما’ فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذى قال: ردنا إلى عمر فقتله فانزل الله (فلا وربك ..) الاية مرسل غريب فى اسناده ابن لهيعة’ وله شاهد أخرجه رحيم فى تفسيره من طريق عتبة بن ضمرة عن ابيه /لباب النقول

ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদুওয়ায়হ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ দু’জন লোক রসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট ঝগড়ার জের নিয়ে আসল।

তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করলেন। যার বিপক্ষে ফয়সালা হল তিনি বললেনঃ চল উমার বিন খাত্তাবের নিকট যাব। অতঃপর উভয়ে তাঁর নিকট আসল এবং যে ব্যক্তির অনুকুলে বিচারের সিদ্ধান্ত ছিল তিনি বললেনঃ রসুলুল্লাহ (ছঃ) যে বিচার করেছেন এর প্রতিকুলে যাওয়ায় সে বলল চল "উমারের নিকট যাই।" তিনি (উমার) বললেনঃ এরূপই ঘটনা? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। অতঃপর উমার রাযিঃ বললেন তোমরা দু'জন এখানেই থাক। আমি (বাড়ীর ভিতর যেয়ে) বেরিয়ে এসে তোমাদের বিচার করবো। কিছুক্ষণ পর তলওয়ার সহকারে বেরিয়ে এলেন এবং যে বলেছিল চল উমারের কাছে যাই– তাকে তলওয়ার মেরে হত্যা করলেন, অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেনঃ "ফালা ওয়ারাব্বিকা ..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত। হাদীছটি মুরসাল গারীব। (অর্থাৎ যঈফ) এর সনদে ইবনু লাহীআহ আছে এই জন্য। তবে এর সহযোগী বর্ণনা রয়েছে যা আব্দুর রহীম তার তাফসীরে আতবাহ বিন যামরাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। – লুবানুল নুক্বুল পৃঃ ১৪২, ছহীহ সনদে আরো কয়েকটি নাযিলের কারণ বা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

কোন মু'মিন ও মু'মিনার জন্য উচিৎ নয় যে, আল্লাহ ও তার রাসূল কোন সিদ্ধান্ত নিলে বা ফয়সালা করলে তাতে তাদের কোন ইখতিয়ার থাকবে। – আহযাব ৩৬।

أخرج الطبرانى بسند صحيح عن قتادة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهو يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت فانزل الله (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الاية فرضيت وسلمت - لباب النقول

ত্ববরাণী ছহীহ সনদে কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী (ছঃ) যায়নাব কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যায়নাব প্রথমে মনে করেছিলেন যে, তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন। কিন্তু যখন জানলেন যে, নিজের জন্য নয়, যায়েদের জন্য তখন প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করলেন। ... এরপর তিনি রাযি হয়ে গেলেন এবং আত্মসমর্পণ করলেন। অর্থাৎ যায়েদের সাথে বিবাহ বসলেন। – লুবাব ৩৯৭।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً

তোমাদের ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে যে, আল্লাহর সাক্ষাত (বা সন্তুষ্টি) আখিরাতের, সফলতা কামনা করে ও বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে। – সূরা আহযাব ২১।

من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله (رواه البخارى)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে আমার অনুসরণ করলো সে স্বয়ং আল্লাহরই অনুসরণ করলো আর যে আমার অবাদ্ধতা (নাফরমানী) করলা সে স্বয়ং আল্লাহরই নাফরমানী করলো। –ছহীহ বুখারী।

তিনি আরো বলেছেন:

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين' تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (أحمد وابو داود والترمذي)

শক্তভাবে ধারণ করো আমার সুন্নাতকে ও আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত সঠিকপথের উপর প্রতিষ্ঠিত উত্তরাধিকারী সাহাবীদের সুন্নাতকে, একেবারে চোয়ালের দাঁত দ্বারা ধারণ করবে। ধর্মের ভিতর নবাবিস্কৃতি থেকে সাবধান! কারণ ধর্মের ভিতর প্রতিটি নবাবিস্কৃতই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই হলো ভ্রষ্টতা। – আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ ও মুসলিম।

নাসাঈতে বৃদ্ধি সহকারে এসেছে : وكل ضلالة في النار

আর প্রত্যেকটা ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به (رواه في شرح السنة) وقال النووى فى اربعينه هذا حديث صحيح وعزاه إلى كتاب الحجة وصحح إسناده -

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার মনমস্তিস্ক (চিন্তা-চেতনা) আমার আনীত বস্তুর (কুরআন হাদীছের) অনূকুলে না হয়। –ছহীহ, মিশকাত।

خامسا : الصلاة عليه

পঞ্চম হক্ব:

তার উপর দরূদ পাঠ করা:

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً.

নিশ্চয় আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর উপর ছলাত পাঠ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তার উপর ছলাত পাঠ করো ও বেশী বেশী সালাম দাও। – সূরা আহযাব ৫৬।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا (مسلم)

যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির উপর ১০ বার রহমাত প্রেরণ করবেন। – মুসলিম।

রাসূলের উপর দরূদ পাঠ বিরাট ইবাদত। অনেকে তাশাহহুদে দরূদ পাঠকে ওয়াজিব বলেছেন।

যখনই কোন বান্দা নেকীর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর দরূদ পাঠ করবে তখনই তার জন্য এই ফযীলত লাভ হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় বা আনুষ্ঠানিকতা শর্ত নয়। বরং আনুষ্ঠানিকভাবে যেমন মিলাদ মাহফিলে দরূদ পড়া বিদআত, কারণ মিলাদ মাহফিলই বিদআত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মিলাদ তথা বিদআতপন্থী আলিমগণ দরূদের আয়াত ও হাদীছ দিয়ে মিলাদ সাব্যস্ত করে থাকেন।

অথচ দরূদ পড়া হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাদের সুন্নাত আর মিলাদ হলো খ্রীষ্টানদের সুন্নাত। যা ইসলামের দৃষ্টিতে দু'দিক থেকে বিদআত।

দরূদ পড়া নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) দিয়েছেন এবং মিলাদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছে বা ব্যবস্থা করেছে একজন ইরাকের রাজনৈতিক স্বার্থউম্মাদ শাসক মুযাফফরুদ্দীন কাউকুবুরী। সে সপ্তম শতাব্দীর ৬০৪ হিজরী সনে এই মিলাদ চালূ করে। উক্ত শাসকের ইন্তেকাল

হয় ৬৩০ হিজরীতে। তারীখে ইবনে খাল্লেকান ও জুনাগড়ী প্রণীত মিলাদুন্নবী দ্রষ্টব্য।

দরূদে ইব্রাহীম ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত দরূদ বিভিন্ন নামে প্রচলিত ওগুলো যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সাব্যস্ত নয় কাজেই তা পড়া রাসূলের সুন্নাতে কাউলীর পরিপন্থী হওয়ায় বিদআত। আল্লাহ আমাদেরকে নিখুত ভাবে তাঁর রাসূলের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

مجالات الصلاة عليه

দরূদ পড়ার ক্ষেত্রসমূহ:

ইমাম ইবনুল ক্বয়েইম আল জাউযিয়াহ (রহ.) তাঁর প্রণীত জালা-উল আফহাম নামক গ্রন্থে নবী (সা.)এর প্রতি দরূদ পড়ার ৪১টি ক্ষেত্র ও অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তার কতিপয় উদ্ধৃত করা হলো:

১। ছলাতের তাশাহহুদে–

২। মাসজিদে প্রবেশের সময়,

৩। মাসজিদ থেকে বের হবার সময়–

৪। মুয়াযযিনের আযান শুনার পর–

৫। ইক্বামতের সময়,

৬। তাঁর (রাসূল (সা.)) নাম শুনার পর,

৭। দু'আর সময়,

৮। জানাযার ছলাত,

৯। সকাল-সন্ধ্যার যিকর হিসাবে,

১০। জুমআর দিন,

১১। যে কোন দ্বীনি মাজলিসের শুরু ও শেষে,

১২। দুআ কুনুতের শেষে,

১৩। তাঁর ক্বররের যিয়ারত কালে,

১৪। জুমআ ও ঈদাইনের খুৎবায়,

১৫। হজ্জ-উমরাহ কালে ছাফা-মারওয়াহ পাহাড়ের উপর চড়ে,

১৬। যে কোন দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময়,

১৭। ক্ষমা ও তাওবাহর জন্য ইত্যাদি ক্ষেত্র ও অবস্থা সমূহ।

المجالات التى لا تباح الصلاة عليه

যে সমস্ত অবস্থায় দরূদ পড়া নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় ঃ

১। নাপাক জায়গায় ও অবস্থায়,

২। যে কোন বিদ'আতী উপলক্ষ ও অনুষ্ঠানে যেমন মীলাদে, ও ঈদে মীলাদুন্নবী, কুলখানী, জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদিতে।

سادسا

الاعتراف بخاتمة نبوته ورسالته وعموميتهما للجميع

ষষ্ঠ হক্ব

মুহাম্মাদ (সা.) শেষ নবী এবং তাঁর রিসালাত শেষ ও সকলের জন্য সার্বজনীন রিসালাত

ইসলামের সূচনা হয়েছে আদম (আ.) থেকে এবং পূর্ণতা লাভ করেছে মুহাম্মাদ (সা.) এর মাধ্যমে। ইসলাম বলতে যা কিছু ও যত কিছুকে বুঝায় সবই নবী (সা.) বর্ণনা করে গেছেন। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব ও জ্বীন জাতির জন্য একমাত্র নবী ও রাসূল। আরব-আজম যে কোন ধর্মাবলম্বী শাসক ও জনগণ সকলের জন্য। আল্লাহ বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে নির্ধারণ করে খুশী হয়ে গেলাম। –মায়িদাহ – ৩।

আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বলুন, হে মানব সকল! নিশ্চয়, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল। – সূরা 'আরাফ – ১৫৮।

অন্যত্র বলেছেন:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا 1

বরকতময় সেই সত্ত্বা, যিনি তার বান্দার প্রতি ফুরক্বান (হক্ব-বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী গ্রন্থ) নাযিল করেছেন যাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। –সূরা আল-ফুরকান ১।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

আর আমার নিকট এ কুরআন অহী করা হয়েছে যাতে আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যার কাছে তা পৌঁছাবে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি। –সূরা আনআম – ১৯।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ 107

আমি আপনাকে বিশ্বের জন্য, রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

–আল-আম্বিয়া – ১০৭।

তিনি যে শেষ নবী তার দলীল :

আল্লাহ বলেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

আর মুহাম্মাদ তোমাদের একজন পুরুষ ব্যক্তিরও পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। –সূরা আহযাব – ৪০।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আর আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি করে না।

–সূরা সাবা – ২৮।

নবী (সা.) বিভিন্ন হাদীছে অনুরূপ কথাই বলেছেন। যেমন একটি হাদীছে বলেছেন:

وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة – مسلم

আর অতীতে নবী প্রেরণ করা হতো তার নিজের জাতির নিকট এবং আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য। –ছহীহ মুসলিম।

অন্য আরেকটি হাদীছ :

নবী (সা.) বলেছেন

مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه و أجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له' ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين – متفق عليه

আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ হচ্ছে ঐরূপ, যেমন এক ব্যক্তি খুব সুন্দরভাবে একটি বাড়ী নির্মাণ করল তবে এক কর্ণারে একটি ইট বসাতে বাকী রেখে দিল। অতঃপর লোকজন বাড়ীটি ঘুরে ঘুরে দেখে আর আর্শ্চযজম্বিত (চমৎকৃত) হতে থাকে এবং বলতে থাকে কেন যে, এই ইটটি সেট করা হয়নি। তিনি (সা.) বললেন: আমি সেই ইটটি, আর আমি সর্বশেষ নবী। –বুখারী ও মুসলিম।

তাঁর রিসালাতকে শেষ রিসালাত বলে বিশ্বাস করার অর্থই হলো তাঁর রিসালাত অতীতের সকল রসূলের রিসালাতকে রহিতকারী।

আল্লাহ তা'আলা বিগত সকল নবী ও রসূল থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছেন, তাদের বর্তমানে যদি আখিরী রসূল মুহাম্মাদ (সা.) এসে

যান তাহলে যেন নিজেদের নবুওতের উপর স্থিত না থেকে তাঁর নবুওতেই বিশ্বাসী হয়, এবং তার সহযোগী হয়। Ñm~iv Av‡j-Bgivb 81 I 82 AvqvZ `ªóe¨|

অত্র আয়াতের তাফসীরের জন্য আলী ও ইব্‌নু আব্বাসের যৌথ বর্ণনাও তাফসীর ইবনে কাছীরে দ্রষ্টব্য, প্রথম খণ্ড ৩৫৭। এ আয়াতের জোরেই নবী (সা.) বলেছেন:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا' أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ فقد جئتكم بها بيضاء' نقية' ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى رواه البيهقي في شعب الايمان وأحمد

জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) থেকে এমন সময়ের কথা বর্ণনা করেন যখন উমার (রা.) তার নিকট এসে বললেন: আমরা ইহুদীদের নিকট এমন কিছু হাদীছ পাই যা আমাদেরকে চমৎকৃত করে। আপনি কি মনে করেন–এগুলোর কিছু কি আমরা লিখে নিব? তিনি বললেন: তোমরা কি ইহুদী ও নাসারাদের মত দিশেহারা হতে চাও? আমি যা তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি তা সাদা ও স্বচ্ছ। স্বয়ং মুসা (আ.)ও যদি থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তারও উপায় ছিল না।

– এটি আহমাদ ও বায়হাক্বী শুয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

অপর একটি হাদীছে এরূপ এসেছে:

وفي رواية عن جابر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله! هذه من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل! ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله' رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا' وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتى لاتبعنى (رواه الدارمى، وحسنه الألبانى فى مشكاة المصابيح 63/1 رقم 194/177

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমার (রা.) একদিন তাওরাতের একটি কপি নিয়ে এসে বলেছিলেন হে আল্লাহর রাসুল এটা তাওরাতের একটা কপি। আল্লাহর রাসুল (সা.) চুপ রইলেন, অত:পর উমার (রা.) পড়া শুরু করলেন এবং এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চেহারা মুবারক

পরিবর্তন হতে শুরু করল। আবু বাকর (রা.) বললেন: (উমরকে উদ্দেশ্য করে) তোমার জন্য ক্রন্দনকারীরা ক্রন্দন করুক। অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক। দেখনা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চেহারার কি পরিবর্তন হয়েছে। উমার (রা.) রাসূল (সা.)এর চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন আল্লাহর নিকট তার ক্রোধ ও রাসূলের ক্রোধ থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহকে রব্ব হিসাবে ইসলামকে একমাত্র ধর্ম হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (সা.) নবী হিসাবে গ্রহণ করে রাযী হয়েছি। এ কথা শুনে রাগ প্রশমিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন আজ মুসা-ও যদি প্রকাশ লাভ করতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে তবু সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যেতে। যদি তিনি বেচে থাকতেন এবং আমার নবুওতের সময়কাল পেতেন তবে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন। – দারেমী। শাইখ আলবানী এটিকে মিশকাতে হাসান বলেছেন। পৃঃ ১/৬৩ হাদীছ নং ১৭৭ ও ১৯৪।

অত্র হাদীছ থেকে পরিস্কার বূঝা যায় যে, আল্লাহর রাসুল (সা.) ব্যতীত অন্য যত বড়ই সৎ লোক বা অলি-দরবেশ বা ইমাম হোক তার সুন্নাত বা কথার বিরুদ্ধে এক মুহুর্তের জন্য-ও তাদের অনুসরণ করা চলবে না। এমনিভাবে যত বড় পণ্ডিত বা আলেমের লিখা কিতাব হোক না কেন কুরআন ও হাদীছের বিরুদ্ধে ক্ষণিকের জন্যও মানা চলবে না।

আরো বুঝা গেল যে, যারা একথা বলে যে, কুরআন ও হাদীছ শুধু বরকত লাভের জন্য এবং মাসলা মাসায়েলের জন্য নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের ফিকাহই যথেষ্ট। তাদের একথা বলা ও তার উপর আমল করা জঘণ্যতম অপরাধ। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মুসলমানী থাকায় দ্বিধাযুক্ত। দু:খজনক হলেও সত্য যে, বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা খ্যাতিমান বড় বড় মাযহাবী আলিমগণও এমন আক্বীদা পোষণ করেন। আল্লাহ তাদের সঠিক পথ দান করুন। সত্যিকার হাক্কানী আলিম বানান।

অপর পক্ষে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নামে বা স্বার্থে কুরআন সুন্নাহ বাদে কাফির রাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত সংবিধান, তন্ত্রমন্ত্র ও মতবাদ যেমন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, নাস্তিকতাবাদ এসবই কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছের আলোকে ইসলামের সাথে এমন সাংঘর্ষিক যে ওসব কিছুর

সমর্থকদেরকে ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত করে দেয় এবং কাফিরদের গণ্ডিভূক্ত করে দেয়।

سابعا: حسن التأديب معه وتوقيره
সপ্তম হক:
তাঁর সাথে আদব শিষ্টাচার ও সম্মান রক্ষা করা

নবী (সা.) এর সাথে শিষ্টাচার রক্ষার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ নিজে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا

খবরদার! তোমারা তোমাদের মাঝে রসূলকে ঐভাবে সম্বোধন করো না যেভাবে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন কর। –সূরা আন-নুর ৬৩।

পরবর্তীতে উল্লেখিত আয়াতে ক্ষতি ও পরিণতি-ও উল্লেখ করা হয়েছে। –হুজুরাত: ২।

একক শব্দে যেমন শুধুমাত্র মুহাম্মাদ শব্দে ডাকা বা সম্বোধন করা আদব বিরোধী।

মুহাম্মাদ বললে সাথে অবশ্যই "ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" বলবে। আল্লাহ তাঁকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন সেই গুণ বা খেতাব সহকারে বলাই উচিত। যেমন রসূলুলাহ, নবীউলাহ, আন-নাবী, আর-রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবে। হুজুর বলে নবী (সা.)কে সম্বোধন করা সম্পূর্ণ উপরোক্ত আয়াত বিরোধী। অনুরূপ সাধারণ কোন মানুষের নাম নবী, নবীউল্লাহ, রসূলুল্লাহ রাখা যাবে না।

সাধারণ মৌলভী-মুন্সীদেরকেও হুজুর বলে ডাকা হয় এবং নবী (সা.) কেও হুজুর বলা হয়। ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোগ করলেও উক্ত শব্দ বেআদবী ও উপরোক্ত আয়াতের শিক্ষা ও শিষ্টাচার বিরোধী।

নবী (সা.) এর সাথে আদব প্রদর্শনের নমুনা হল: তাঁর স্বরের উপর স্বর উঁচু করা যাবে না। যদি কেউ তা করে তবে তার পরিণতি খুবই খারাপ।

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 2

হে ঈমানদার গণ! তোমরা তোমাদের স্বরকে নবীর স্বরের উপর উঁচু করো না এবং তাকে এমন কথার দ্বারা সম্বোধন করো না যেমনভাবে তোমরা একে অপরকে সম্বোধন কর। এতে তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে অথচ টেরও পাবে না। –সূরা হুজুরাত : আয়াত ২।

এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ এভাবে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 1

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে অগ্রণী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহভীতি (তাক্বওয়া) পরায়ণ হও, নিশ্চয় আল্লাহ অতি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। –সূরা হুজুরাত : ১।

এ আয়াতদ্বয় নাযিলের একাধিক কারণ বর্ণিত হয়েছে।

তবে আবু বাকর ও উমার সম্পর্কে নাযিল হওয়াটাই সমধিক প্রাধান্যযোগ্য। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতদ্বয় নাযিল হয়েছে তা বর্ণনা করতে যেয়ে এ বলে মন্তব্য করেছেন।

كاد الخيران ان يهلكا

সবচেয়ে ভাল দু'জনই ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

ঘটনাটি নিম্নরূপ:

عن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب بنى تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد' وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس' فقال أبو بكر ما أردت إلى أو إلا خلافي' فقال عمر: ما أردت خلافك' فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل فى ذلك – يا ايها الذين آمنوا .... – رواه البخاري رقم ٤٨٤٧

আবু মুলাইকাহ্ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন আয-যুবাইর তাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, বনু তামীমের একটি দল নবী (সা.) এর নিকট আসলে আবু বাকর (রা.) বললেন, আল ক্ব'-কা' বিন মা'বাদকে

আমীর নির্ধারণ করুন। আর উমার (রা.) বললেন বরং আল্-আক্বর বিন হারিসকে আমীর নির্ধারণ করুন। অতঃপর আবু বাকর (রা.) বললেন তুমি কেবল আমার বিরোধীতা করারই ইচ্ছা পোষণ করেছ। প্রতি উত্তরে উমার (রা.) বললেন আমি আপনার বিরোধীতা করতে চাইনি। এভাবে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এ প্রেক্ষিতে নাযিল হল। "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলেল সামনে অগ্রণী হয়ো না। আয়াতের শেষ পর্যন্ত। পরের আয়াতটিরও নাযিল হওয়ার একই কারণ। – দেখুন ছহীহ বুখারী হাদীছ নং ৪৮৪৫, ৪৮৪৭।

আয়াত দু'টি নাযিল হওয়ার পর তারা খুবই আতংকিত ও আশংকিত হয়ে পড়েন। এমনকি এ আয়াতের পর নবী (সা.) কে উমার (রা.) তার গলার স্বর স্পষ্ট করে শুনাতেন না। যতক্ষণ তিনি নিজে তাকে বুঝিয়ে বলতে আদেশ না দিতেন। ছহীহ বুখারী হাদীছ নং ৪৮৪২।

অন্য এক সাহাবী সাবেত বিন কায়েস স্বভাবগত কারণে নবী (সা.) এর স্বরের চেয়ে কণ্ঠস্বর উঁচু থাকায় বাড়ী থেকে বের হওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নবী (সা.) নিজে তার অনুপস্থিতি অনুভব করলে এক ব্যক্তি বললেন আমি আপনাকে তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে জানাব। অত:পর তিনি তার নিকট আসলে তাকে নিজ গৃহে মাথা নীচু করে বসে থাকা অবস্থায় পেলেন। তিনি তাকে বললেন: আপনার কি অবস্থা? উত্তরে বললেন: খারাপ। কেননা সে নবী (সা.) এর স্বরের উপর স্বর উচু করতো। সুতরাং তার (আশংকা) তার আমল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে নরকের অধিবাসী। অত:পর লোকটি নবী (সা.) এর নিকট ফিরে এসে বললেন সে তো এরূপ এরূপ কথা বলল। পুণর্বার লোকটি তার কাছে বিরাট সুসংবাদ নিয়ে ফিরে গেলেন। নবী (সা.) তাকে বললেন: তুমি তার নিকট যাও এবং বল নিশ্চয় তুমি নরকের অধিবাসী নও বরং তুমি জান্নাতের অধিবাসী।

– বুখারী হাদীছ নং ৪৮৪৬।

নবী (সা.) এর আদব রক্ষা ও মুহাব্বাত দাবী করে– তাঁকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়া ও সবার চেয়ে বেশী সম্মান দেয়া। অন্য কোন ব্যক্তি ও বস্তুকে তার মত সম্মান বা তার চেয়ে বেশী সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হলে

ঈমান থাকবে না। তাই তো ছাহাবায়ে কেরাম তাদের জান-মালকে রসূল (সা.) এর সামনে উপস্থাপন করে বলতেন আপনি যা ইচ্ছা করুন।

قالوا هذه أموالنا بين يديك' فاحكم فيها بما شئت' وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل بين يديك' ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك -

তারা বলতেন এই আমাদের ধন-সম্পদ– আপনার সামনে উপস্থাপিত, আপনি এর ব্যাপারে যা ইচ্ছা ফায়সালা দিন। আর এই আমাদের জান আপনার সামনে উপস্থাপিত। আপনি যদি আমাদেরকে সাগরে ঝাঁপ দিতে বলেন আমরা ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। আমরা আপনার সম্মুখে যুদ্ধ করবো, পিছনে, ডানে ও বামে। মুহাব্বাতুন নবী .... Ñ Qnxn gymwj‡gi D×„wZ mn c„ôv 63|

আবার সর্বোচ্চ সম্মান দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, তাঁকে আল্লাহর মত বা তার চেয়েও বেশী সম্মান দিতে হবে।

تجب مراعاة التوازن فى المحبة التأديب والتوقير من غير إفراط ولا تفريط

মুহাব্বাত, আদব ও সম্মান প্রদর্শনে ভারসাম্যতা রক্ষা করতে হবে কম ও বেশী নয়

تفريط الشيعة وبعض الصوفية

এক শ্রেণীর ছূফীবাদীরা এবং রাফিযী (শী'আহ, বর্ত্তমানে ইরানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী) রসূল (সা.) এর সাথে অশিষ্টাচার ও অমর্যাদাপূর্ণ আচরণ করে থাকে।

এক শ্রেণীর ছূফীবাদীরা তথাকথিত তাদের অলী দরবেশ এবং কুতুব-আক্বতাবদেরকে নবী (সা.)এর চেয়েও বেশী মর্যাদা দেয়। তাদের কুফরীপূর্ণ ধারণা এই যে, নবীগণ জিবরীল ফিরিশতা ও অহীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করেন এবং লাওহু মাহফুযের জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তাদের কথিত অলীরা কোন রকম মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলে ও লাওহে মাহফুযের জ্ঞান আহরণ করে। এমনকি তারা আল্লাহর সাথে মিশে ফানা হয়ে যায়। অথচ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 51

কোন মানুষ এমন পর্যায়ভূক্ত নয় যে, আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন। তবে ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা তিনি কোন ফিরিশতা প্রেরণ করেন, ফলে তিনি যা চান তার অনুমতিক্রমে তা তিনি প্রত্যাদেশ করেন। নিশ্চয় তিনি সূউচ্চ ও প্রজ্ঞাময়। Ñm~iv AvkÑïiv, AvqvZ 51|

ইমাম খোমেনী (লা'আনাহুল্লাহ) তাঁর আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়া গ্রন্থে লিখেছেন:

وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل

আমাদের মাযহাবে অনিবার্যভাবে বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভূক্ত একটি বিশ্বাস এই যে, আমাদের ইমামদের এমন মর্যাদা রয়েছে যে, এ মর্যাদায় কোন নৈকট্যশীল ফিরিশতা এবং কোন রসূলও পৌঁছতে পারে না।

– পৃষ্ঠা ৫২, ইরানী ইনকিলাব, ইমাম খোমেনী ও শী'আ মতবাদ পৃষ্ঠা ১১।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 4

হে নবী! আমি আপনার বর্ণনাকে উন্নীত করেছি। –সূরা ইনশিরাহ: ৪।

নবী মুহাম্মাদ (সা.)কে আল্লাহ সমস্ত মাখলূকের উপর মর্যাদা ও প্রধান্য দান করেছেন। আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে ও আসবে তার চেয়ে সম্মানী কেউ নেই। তিনি নবী ও রসূলগণেরও সরদার ও সর্বশেষ নবী।

নবী (সা.) নিজেও বর্ণনা দিয়েছেন:

أنا سيد ولد آدم ولا فخر' وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع – رواه مسلم

আমি আদম সন্তানের সরদার আর এটা কোন অহংকার নয়। (আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা) আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হব (হাশরের মাঠে

একত্র হওয়ার জন্য) আমি প্রথম সুপারিশ করবো এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ গৃহীত হবে। –সহীহ মুসলিম।

অতএব উপরোল্লিখিত উভয় সম্প্রদায় মুরতাদ কাফির নবীর উম্মত থেকে বহিস্কৃত এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত।

অনুরূপ বিধানই প্রযোজ্য বর্তমান যুগের অনেক নামধারী মুসলিমের ক্ষেত্রে। যারা রাজনীতি ও মাযহাবের অজুহাতে নিজেদের দলীয় ও মাযহাবী ইমাম বা নেতা-নেত্রীকে এবং তাদের বক্তব্য, নীতি ও আদর্শকে নবী (সা.) ও তার নীতি ও আদর্শের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়।

الغلو والإفراط فى محبة النبى والتادب معه لدى بعض الصوفية

নবী (সা.) এর শিষ্টাচার ও সম্মান প্রদর্শনে অতিরঞ্জন নিষিদ্ধঃ

যেমনভাবে নবী (সা.) এর চেয়ে অন্য কোন ব্যক্তি ও বস্তুকে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান ঈমান ঘাটতি ও বিনষ্ট হওয়ার কারণ তেমনি তাকে তার মর্যাদা থেকে উন্নীত করাও ঈমান ঘাটতি ও বিনষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে। সুতরাং তাঁর আদব রক্ষা, সম্মানদান ও তার প্রশংসা জ্ঞাপনে যেন এমন অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি না করি – যাতে আল্লাহ তাকে যে মর্যাদা দান করেছেন সে মর্যাদা থেকে উন্নীত করে আল্লাহর সমান বা তার চেয়েও উচ্চাসনে না বসিয়ে ফেলি। যেমনটা একশ্রেণীর ছূফীবাদীরা করেছে। তারা নবী (সা.) কে বান্দার গণ্ডি থেকে বের করে আল্লাহর সমান ও সমকক্ষ বানিয়ে ফেলেছে। তাদের অতিরঞ্জনের নমুনা ও দৃষ্টান্তের তালিকা দেয়া হল:

১। তারা বলে, নবী (সা.) নূরের তৈরী। শুধু তাই না, এরূপও বলে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর যাতী (সত্তার) নূর থেকে তৈরী। অথচ নবী (সা.) নিজে স্বীকার করেছেন তিনি আদম সন্তান তাদের সরদার। ফিরিশতার সদস্য নন।

২। নবী (সা.) কে হায়াতুন নবী তথা কবরে যাওয়ার আগে যেমন জীবিত ছিলেন এখনো সেরূপই জীবিত আছেন ও থাকবেন।

৩। মরার পরও তিনি দুনিয়ার সবকিছু দেখেন ও শোনেন।

৪। তিনি গায়েব জানেন।

৫। তার কোন ছায়া ছিল না।

৬। তার প্রস্রাব পায়খানা ছিল না।

৭। তাঁর কবর ও গম্বুজকে হিন্দু বৌদ্ধদের মত করে পূঁজা করে। কিন্তু তাওহীদবাদীদের হিফাযতে থাকায় তা কার্যকর করতে পারে না। তারা যদু-মদুদেরকে অলী আখ্যা দিয়ে তাদের কবর পুঁজা করে তৃপ্তি মেটায়।

৮। এরা কখনও হজ্জ উমরায় গেলে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে নবী (সা.) এর কবরে পুজা দেয়া।

৯। নবীর নিকট প্রার্থনা করা। সুপারিশ কামনা করা ইত্যাদি।

আলাহ তা'আলার ভাষায়: এ সবই হল الغلو অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ী যা তিনি কুরআনে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً 171

হে কিতাবধারীরা! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করো না। আল্লাহর উপর সঠিক ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ তো কেবল মাত্র আল্লাহর একজন রসূল এবং তার বাণী (সিদ্ধান্ত যার মাধ্যমে তার অস্তিত্ব) যা তিনি মারইয়ামের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। তার থেকে (প্রদত্ত) একটি রূহ বা জীবন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসূলগণের প্রতি, আর (এ কথা) বলো না (আল্লাহ) তিনজন। এরূপ বলা থেকে বিরত হও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ। তিনি এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর সন্তান হবে। তারই সব কিছু যা আকাশ ও যমীনে রয়েছে। কর্ম বিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। –সূরা নিসা– ১৭১।

১০। মুহাম্মাদ (সা.) কে সৃষ্টি করা না হলে আসমান, যমীন ও অন্য মাখলুক সৃষ্টি করা হতো না। এটি একটি ইসলাম বিধ্বংসী জাল হাদীসের বক্তব্য। কুরআনের হুবহু উল্টা। আল্লাহ আসমান-যমীন এবং মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টি করেছেন তার তাওহীদ ও ইবাদাত কায়েমের জন্য।

–সূরা বাক্বারাহ ২২ ও আয-যারিয়াত ৫৬।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

বলূন, আমি তো কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার নিকট ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একজনই। – সূরা কাহ্‌ফ্ ১১০।

এ বিষয়ে আরো কিছু আয়াত (দলীল) দেখুন: সুরা আ'রাফ ১৮৮, ইউনুস : ৪৯, সূরা জ্বীন ১৮-২৩ ও ২৬, সূরা আন-নামল: ৬৫, সূরা আন'আম : ৫০, ৫৯ এবং সূরা হুদ : ৩১।

১। রসূলুল্লাহ (সা.) তার বিষয়ে “গলু” করতে বিভিন্ন হাদীছে নিষেধ করেছেন:

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله – رواه البخاري

তোমরা আমার ব্যাপারে (প্রশংসায়) বাড়াবাড়ি করো না। যেমনভাবে খৃষ্টানেরা মারইয়ামের পুত্র (ঈসার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো একজন আল্লাহর বান্দা অতএব (আমার ব্যাপারে) বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। – ছহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বীয়া।

২। অন্য আরেকটি হাদীছে বলেছেন:

إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين -

তোমরা সাবধান থেক দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িই ধ্বংস করেছে। –মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ।

৩। দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কারীদের প্রতি জীবনের অন্তিমকালে নবী (সা.) বদ দু'আ বা অভিশাপের দু'আ করেছেন:

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد – بخاري ومسلم

ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহর লা'নাত (অভিশম্পাত) বর্ষিত হোক। কারণ তারা তাদের নবীদের ক্ববরগুলোকে সাজদাহর স্থানে (মসজিদে) পরিণত করেছে। – বুখারী ও মুসলিম।

৪। নবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে নিয়ে মৃত্যুর পর বাড়াবাড়ির একটি চিত্র মাথায় অঙ্কন করে সেটার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে দু'আ করে গেছেন।

اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد' اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد – احمد ومالك -

হে আল্লাহ তুমি আমার কবরকে দেবতায় পরিণত করতে দিও না – যার পুজা করা হবে। আল্লাহর ভীষণ রাগ ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি যারা তাদের নবীদের ক্ববরগুলোকে সাজদার জায়গায় (মসজিদে) পরিণত করেছে।

–মুসনাদে আহমাদ ও মুয়াত্তা মালিক।

৫। নবী (সা.) আলী (রা.) কে একটি দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি সেটা আবুল হায়ইয়াজ আল-আসাদী নামক এক ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন: তা হলো এই ঃ

أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته – رواه مسلم

কোন মুর্তি ও প্রতিকৃতি পেলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে এবং উঁচু (বাধাই কৃত) ক্ববর পেলে মাটি বরাবর করে দিবে। – ছহীহ মুসলিম।

৬। নবী (সা.) বলেছেন:

لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها – مسلم

তোমরা ক্ববরের উপর বসো না এবং তার দিকে (ক্বিবলার তথা সাজদার কাছাকাছি রেখে) সলাত আদায় করো না। – ছহীহ মুসলিম।

৭। নবী (সা.) বলেছেন :

إن لله ملائكة سياحين يبلغونني من أمتي السلام

নিশ্চয় আল্লাহর নিযুক্ত ভ্রাম্যমান কিছু ফিরিশতা রয়েছে যারা আমার নিকট আমার উম্মতের সালাম পৌঁছিয়ে থাকেন ।

– মুসনদে আহমাদ ও নাসাঈ । সহীহ সনদ ।

৮ । নবী (সা.) বলেছেন:

لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى – رواه البخاري

তোমরা বাহন প্রস্তুত (করে নেকীর উদ্দেশ্যে সফর) করো না একমাত্র তিনটি মসজিদ ছাড়া । আমার এই মসজিদ, মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আক্বসা । – ছহীহ বুখারী ।

উপরোক্ত হাদীছের নির্দেশনা এই যে, কোন মাযার-কবর, দরবার, দরগা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোন দেশে বা অঞ্চলে সফর করা যাবে না । সুতরাং আজমীর, বাগদাদ, এমনকি নবী (সা.) এর কবর যিয়ারতের জন্য মদীনা সফর করা যাবে না । নবী (সা.) এর কবর যিয়ারতের ফযীলতে বহু হাদীছ কবর পুঁজারীদের সংগ্রহে পাওয়া যায় । ঐ সবই জাল বানেয়াট । এ ধরণের অনেক হাদীছ আমার হজ্ব উমরাহ ও যিয়ারত নির্দেশিকা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সতর্ক করার জন্য । সম্ভব হলে সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ।

قائمة ببعض البدع الفاشية فى العقيدة والعمل’ على ضوء بعض الأصول ومجالات الاتباع والابتداع

সুন্নাহ অনুসরণের রূপরেখা এবং সুন্নাত ও বিদআত চিহ্নিত করার মৌলনীতি সমূহের আলোকে কতিপয় বিদ‘আতী আক্বীদাহ ও আমলের তালিকা :

البدع المكفرة أو البدع الاعتقادية

শিরকী ও কুফরী বিদ‘আতসমূহ

১ । সকল প্রকার শিরক (শির্ক ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)

২। কোন ব্যক্তিকে গাউছ, গাউছুল আযম, কুত্বুব, কুত্বুবুল আক্বতাব বিশ্বাস করা।

৩। কোন ব্যক্তি বিশেষদেরকে আবদাল, নুক্বাবা, আওতাদ, নুজাবা বিশ্বাস করা। (এসব উপাধীধারীদেরকে সুফীবাদীরা এক আলাহ্র সমকক্ষ ও সহযোগী বিশ্বাস করে)

৪। কোন নবী, অলী, জিন-শয়তানের নিকট প্রার্থনা করা বা বিপদমুক্তির জন্য ফরিয়াদ করা।

৫। যে কোন গায়রুল্লাহ্র জন্য পশু জবাই করা যেমন জ্বিন, কবর ও মাযার।

৬। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে যেমন মাযার, দরবার, দরগার জন্য ডিম, মুরগী- মোরগ, ছাগল, গরু-মহিষ ও উট উৎসর্গ করা।

৭। পীর-মুরশিদ, রাষ্ট্রীয় নেতা-নেত্রীদের ভক্তি সম্মানের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা। আতিথিয়তার জন্য জায়িয।

৮। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতিয়তাবাদ, প্রগতিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সমর্থন ও বিশ্বাস করা।

৯। লোকদের বদ নযর ঠেকানোর উদ্দেশ্যে পশু জবাই বা উৎসর্গ করা।

১০। কাশফ, ইলহাম, মুরাকাবা, মুশাহাদাহর দাবী করা ও চর্চা করা।

১১। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান বা আল্লাহ্ মুমিনদের ক্বলবে (অন্তরে) থাকে এরূপ বিশ্বাস করা।

১২। আল্লাহ নিরাকার এরূপ বিশ্বাস করা।

১৩। আলাহ্র আকার-আকৃতি কোন মাখলুকের ন্যায় বিশ্বাস করা।

১৪। আল্লাহর সাথে বান্দার বা বান্দার সাথে আল্লাহর লিং (ফানা) বা মিলে একাকার হওয়ায় বিশ্বাস করা।

১৫। নবী (সা.) এর তরীকা বাদে অন্য কোন তরীকাহকে শুদ্ধ মনে করা এবং সে সব তরীকার জ্ঞানলাভ ও চর্চা করা। যেমন কাদেরীয়া, চিশ্তীয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দিদিয়া, রিফাইয়া, বাদাবিয়া, ছাবেরিয়া, তীজানিয়াহ, শাযালিয়া। চার তরীকাহ, একশো তরীকাহ, একশো ছাব্বিশ তরীকাহ সবই বিদআতী ।

১৬। দ্বীন ইসলামের ভিতর শরীয়ত মারেফত, হাক্বীক্বত, তরীক্বত নামে ভাগাভাগি সৃষ্টি করা। ইসলামী শরীয়ত ছাড়া সব কুফরী।

১৭। কোন ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতা-নেত্রীর, দেশ স্বাধীন বা রক্ষার যুদ্ধে নিহতদেরকে শহীদ বলা, তাদের মাজার, ভাস্কর্য, মুর্তি, প্রতিকৃতি নির্মাণ, শহীদ মিনারের পিলার ও সৌধ নির্মাণ করে সেখানে ভক্তি প্রদান ফুল দান ও পুস্পস্তবক অর্পণ করা।

১৮। অগ্নিশিখা, শিখা অর্ণিবাণ ও শিখা চিরন্তনকে ভক্তি করা আগুন পুজার শামিল।

১৯। মাজার কবর বা মৃত কথিত অলীর কোন নিদর্শনকে ভক্তি ও চুম্বন করা। সেখানে সাজদাহ করা, মাথা নোওয়ানো, জুতা নিয়ে যাওয়া বেআদবী মনে করা, পিছন ফিরে উল্টো করে হেঁটে আসা।

২০। মাজারের পার্শ্বস্ত গাছ, পুকুরের মাছ, কচ্ছপ, কুমিরকে কথিত অলীর সংশ্লিষ্ট কিছু মনে করা ও তাদের ভোগ দেয়া, এবং তাদের ভোগ গ্রহণকে সৌভাগ্য মনে করা।

২১। চার মাযহাবকে চার ফরয বিশ্বাস করা এবং চার কুরসীকে চার ফরয বিশ্বাস করা।

২২। পীর ধরা ওয়াজিব। যার পীর নাই তার শির নাই। যার পীর নেই তার পীর শয়তান, এসব কথা বলা ও বিশ্বাস করা।

২৩। মৃত ব্যক্তিকে (দুনিয়ার জীবনের মৃত) জীবিত বলে বিশ্বাস করা। মরার পর তারা দুনিয়ার খবর রাখে, উপকার ও অপকারের ক্ষমতা রাখে এরূপ বিশ্বাস করা।

২৪। মারিফত ও তাসাউফকে শরীয়তের চেয়ে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া।

২৫। চার মাযহাবকে কুরআন হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা। নিঃসন্দেহে এরূপ করা কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা ও অর্থগত বিকৃতির শামিল।

২৬। মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা, এমনিভাবে প্রথা ও চিরাচরিত অভ্যাস দ্বারা ফায়সালা করা।

২৭। তাবীজ কবচ আংটি, বালা, চুড়ি, সুতা পড়া, আজমীরের সুতা, যাদুটোনা, যাদুকরদের নিকট যাতায়াত। হাত গণনা ও জ্যোতিষী এবং গণক ও জ্যোতিষদের শরণাপন্ন হওয়া বা তাদেরকে বিশ্বাস করা।

২৮। নবী (সা.) এর নিকট অসীলা ও শুপারিশ চাওয়া।

২৯। নিজেকে আব্দুর রসূল বা আব্দুন নবী (নবী বা রাসূলের বান্দা) নামে নামকরণ করা।

৩০। কোন মাখলুকের (মানুষ, পশু-পাখি) গতিবিধিকে শুভাশুভ নির্ণয়ের ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা।

৩১। মাসজিদের ক্বিবলায় ক্ববর দেয়া এবং তাকে সামনে করে ছলাত পড়া।

৩২। ক্বুরআনের ভিতর বিকৃতি ঘটেছে এমন ধারনা করা বা এ ধারণা করা যে কুরআন ৯০ পারা। ৬০ পারা গোপণ রয়েছে।

৩৩। আবু বকর, উমার, উছমান, আলীসহ অধিকাংশ ছাহাবী মুরতাদ এরূপ বিশ্বাস ও প্রচার করা।

৩৪। কুরআনের কোন আয়াত বা শরঈ কোন বিষয়কে বিদ্রুপ ও অপছন্দ করা।

৩৫। ইসলামের কোন ফরয/ওয়াজিবকে বা নিয়ম-নীতিকে অস্বীকার করা।

৩৬। ইসলামের নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষিত কোন বিষয়বস্তু ও ব্যক্তিকে হালাল মনে করা।

৩৭। আমল ইবাদাতের নিয়মাবলীর জন্য মাযহাব অনুসরণ ও তাক্বলীদ প্রয়োজন, ক্বুরআন সুন্নাহ নয় এবং বরকত, ছাওয়াব বা ফযীলতের জন্য কুরআন সুন্নাহ প্রয়োজন মনে করা।

৩৮। নবী (সা.) মরেননি জীবিত রয়েছেন এমন বিশ্বাস পোষণ করা।

৩৯। নবী (সা.)কে হায়াতুন্নবী বলে ধারণা করা।

৪০। নবী (সা.) কে হাজির নাযির মনে করা।

৪১। কোন নবী, অলী, ফিরিশতা, জ্বিন, শয়তান গায়েব বা অদৃশ্যজ্ঞান জানে এমন বিশ্বাস করা।

৪২। যুগ ও সময়কে গালি দেয়া।

৪৩। গায়রুল্লাহর নামে কসম করা। যেমন মা, বাবা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পদমর্যাদা ও পোষাক, কা‘বা ঘর ও জীবনের।

৪৪। নবী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা।

৪৫। ছলাত পড়ার সময় পীর- মুর্শিদের ছবি সামনে রাখা।

البدع العملية

আমল-আচরণ বা কার্যকলাপগত বিদ‘আত :

১। নবী ওলীর বরাত (অসীলায়) প্রার্থনা করা।

২। মসজিদের বাউণ্ডারীতে বা আযান শোনার জন্য তার পার্শ্বে কবর দেয়া এবং যে কোন জায়গায় যে কোন ব্যক্তির কবর বাঁধাই করা।

৩। নবী, ওলী বা যে কোন পীর-দরবেশের কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা।

৪। গানের মত স্বর-তরঙ্গ সহ কুরআন পড়া।

৫। কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত সোনালী বা রূপালী অক্ষরে লিখে মসজিদ ও বাড়ীর ওয়ালে ওয়ালমেটের মত সৌন্দর্যের জন্য ঝুলিয়ে রাখা।

৬। বিশেষ বিশেষ কিছু আয়াতের ক্ষেত্রে দুনিয়াবী নির্দিষ্ট কোন উপকার ও অপকারের ধারণা করা।

৭। গাড়ীর সামনে কুরআন ঝুলিয়ে রাখা।

৮। পাত্রে আয়াতুল কুরসী লিখে সে পাত্রে পানি ভর্তি করে সে পানি দ্বারা গোসল করা।

৯। কুরআন তেলাওয়াত শেষে ছদাকাল্লাহুল আযীম বলা।

১০। মুমূর্ষ ও মৃত ব্যক্তির নিকট বা কবরে কুরআন তিলাওয়াত বা সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

১১। কুরআন তিলাওয়াত কালে স্রোতাদের উচ্চস্বরে আল্লাহু আল্লাহু বলা।

১২। সূরা ওয়াদ দুহা থেকে আন-নাস পর্যন্ত প্রতিটি সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহর এর আগে আল্লাহু আকবার বলা।

১৩। রুকু ও সাজদাহতে কুরআন পড়া বা তিলাওয়াত করা (তবে কুরআনের দু’আ বলা যাবে)।

১৪। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন রিডিং পড়ায় ও মুখস্ত করায়, ছওয়াব থাকলেও সারা জীবন কুরআন না বুঝে পড়া ও তিলাওয়াত করা বিদ‘আত।

১৫ সলাতের যে সব ভুলে শুধরানোর জন্য নবী (সা.) শুধু সাহু সাজদাহ দিতেন সে সব ভুলের ক্ষেত্রে ছলাত দোহরানো।

১৬। আমল ছাড়া কুরআন পড়া বিদ‘আত।

১৭। কুরআনকে চুমু খাওয়া বিদ'আত।

১৮। ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ ও শেষে আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইলাল্লাহু .... দু'আ ছাড়া আর অন্য কোন দু'আ পড়া।

১৯। ঘাড় মসেহ করা। (অত্যন্ত দুর্বল হাদীছ ভিত্তিক আমল)

২০। কোন ইবাদাত ও আমলের পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা।

২১। কুলি ও নাকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পানি নেয়া। নবীর নিয়ম হল এক অঞ্জলি পানি অর্ধেক করে কুলি ও নাকের জন্য নেয়া।

২২। দুবার মাটিতে হাত মেরে তায়াম্মুম করা।

২৩। তায়াম্মুমের সময় কনুই পর্যন্ত হাত মাসাহ করা।

২৪। বায়ু নিস্কাশনের পর ইস্তিঞ্জা করা।

২৫। প্রশ্রাবের পর কুলুফ ছাড়া শুধু পানি দ্বারা পূর্ণ পবিত্র হওয়া যায় না, এরূপ বিশ্বাসে কুলুফ ধরে ল্যাংড়া মানুষের মত হাঁটা চলা করা।

২৬। ফরয ওযূ-গোসল, ছলাত বা যে কোন ইবাদাত নিয়াত শুণ্যভাবে সম্পন্ন করা।

২৭। ওযূর ক্ষেত্রে দু'পা ধৌত করার পরিবর্তে মাসাহ করা।

২৮। শারঈ উযর ছাড়া ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা।

২৯। মোজা মাসাহ করার সময় পায়ের নীচের অংশ (পাতা) মাসাহ করা।

৩০। পূর্ণভাবে ওযূ না করা।

৩১। ওযূর সময় কোন অঙ্গ তিন বারের বেশী ধৌত করা।

৩২। ওযূতে পানি অপচয় করা।

৩৩। পাহাড়-জঙ্গলে যেয়ে নির্জনতা অবলম্বন করা বা নির্জনে ইবাদাত করা।

البدع فى الصلواة
ছলাতের ক্ষেত্রে বিদ'আত চর্চা :

১। মুখে উচ্চারণ করে ছলাতের নিয়ত পড়া অর্থাৎ নাওয়াইতু আন .... বলা।

২। মুছল্লা পাকের জন্য তাকবীর তাহরীমার পূর্বে ইন্নী অজ্জাহতু ... পড়া।

৩। জামাআতের ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে শিশু অথবা মূর্খলোক দাড়ানো।

৪। ইমামের " আনা ইমামুন লিমান হাযারা অমান ইয়াহযুরু" বলা।

৫। মাসবূক (পরে যোগদানকারী ব্যক্তি) ইমামকে রুকু বা সাজদাহ বা তাশাহহুদে পেলে না উঠা পর্যন্ত দাড়িয়ে অপেক্ষা করা।

৬। সাজদার ক্ষেত্রে সাত অঙ্গের উপর পূর্ণভাবে সাজদাহ না করা। (দু'হাতের তালু, নাক ও কপাল, দু' হাঁটু, দু'পায়ের আঙ্গুল সমূহ)

৭। অপূর্ণ রূকু ও অপূর্ণ সাজদাহ অর্থাৎ পূর্ণভাবে দাড়ানো ও মাথা উঠানোর পূর্বেই সাজদায় চলে যাওয়া (এতে নামায হবে না)।

৮। রূকু থেকে মাথা উঠিয়ে ধীর-স্থীর ভাবে না দাড়ানো। দু' সাজদার মাঝে ধীর-স্থির ভাবে না বসা। (এতে নামায হবে না)।

৯। গলা খাকরিয়ে ইমামকে সংকেত দেয়া যাতে রাকআত ধরানোর জন্য ইমাম বিলম্ব করে।

১০। ইক্বামতের সময় "ক্বদ ক্বামাতিস সলাত" শুনলে "আক্বামাহুলাহু ওয়া আদামাহা" দু'আ পাঠ করা। (অত্যন্ত দুর্বল হাদীস)

১১। মুয়াযযিনের "ক্বদ ক্বামাতিস সলাত" শোনার পর মুছল্লীদের কাতারের জন্য দাড়ানো। (অত্যন্ত দুর্বল হাদীছ)

১২। ফরয সলাতের পর ইমাম মুক্তাদীর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা।

১৩। ফরয সলাতের সালাম ফিরার পর– সম্মিলিত দু'আর জন্য ইমামের নিকট আবেদন করা।

১৪। ছলাতের পর পরস্পর মুসাফাহা করা।

১৫। তাসবীহ দানা দিয়ে যিকর তাসবীহ গণনা করা। শারঈ ওযরের (বার্ধক্য বা স্মরণশক্তি দুর্বলতার) কারণে এমনটি করা যায়।

১৬। দুই খাম্বার মাঝে কাতারে দাড়ানো।

১৭। কাতারের মাঝে জুতার বাক্স রাখা।

১৮। বাড়ী থেকে মসজিদের ইমাম ও জামাতের ইকতিদা করা।

১৯। আযান ও ইক্বামতের পূর্বে দরূদ পাঠ বা কুরআন তিলাওয়াত করা।

২০। জামাআত শুরু হওয়ার ১/২ মিনিট পূর্বে এবং জুমআর দিন বায়ান ও খুতবাহ চলাকালে নামায নিষিদ্ধের প্রতীকস্বরূপ লালবাতি জ্বালিয়ে রাখা।

২১। জুমআর দিন ইমাম মিম্বারে বসে বয়ান দেয়া, বয়ানের কারণে মসজিদে প্রবেশ করে নামায না পড়ে বসে যাওয়া ও নামায পড়তে নিষেধ করা।

২২। জুম'আর দিন জুম'আ পড়ার পর আবার আখেরী যোহর পড়া।

২৩। রূকু পেলেও রাকআত হবে না মনে করা।

২৪। উমরী ক্বাযা আদায় করা।

২৫। বিতর নামাযকে ওয়াজিব বলা।

২৬। ফরয সলাতের পূর্বে ও পরের সুন্নাতগুলোকে ফরযের মত জরুরী মনে করা এবং ছেড়ে দিলে গোনাহগার ধারনা করা।

২৭। বয়ান শেষে সবাই একসাথে ক্বাবলাল জুমআ ৪ রাকআত পড়া।

২৮। পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত ছাড়া অন্য কোন ছলাতের জন্য আযান ও ইকামাত দেয়া।

২৯। ঈদের ছলাতের পরে (ফাঁকা মাঠে) নফল ছলাত পড়া।

৩০। মাসজিদের কাতারের ভিতর জায়গা (নির্দিষ্ট) রাখা।

৩১। দুই সালাতকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া। অর্থাৎ ফরয ছলাতের সালাম ফিরানোর পর কোন দু'আ-তাসবীহ না পড়ে, কথা না বলে বা স্থান পরিবর্তন না করে সুন্নাত পড়ার জন্য দাঁড়ানো।

৩২। ছলাতরত অবস্থায় (মুছল্লীর নির্দিষ্ট এরিয়া- তিন হাতের ভিতর) সামনে দিয়ে অতিক্রম করা।

৩৩। তিন হাতের শেষ সীমানায় সুতরাহ না রাখা।

৩৪। তিন হাতের চেয়ে অনেক বেশী দূরুত্ব দিয়েও মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষিদ্ধ মনে করা।

৩৫। কাতার সোজা না করা, আকা-বাকা অবস্থায় ছলাত পড়া।

৩৬। কাতারবন্দী হওয়ার সময় পাশের মুসল্লীর কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা না মিলানো বা ফাকা রেখে দেয়া।

৩৭। জুমআর দিন কাতারে উপবিষ্ট মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যাওয়া।

৩৮। ইক্বামতের পর সুন্নাত কোন ছলাতের নিয়্যত করা, বিশেষভাবে ফজরের ক্ষেত্রে।

৩৯। অভ্যাসরত শিশু ও নওমুসলিম ছাড়া প্রকৃত কোন মুসলিম ব্যক্তির ছলাত সংশ্লিষ্ট কিরাআত ও দু'আ কালাম না বুঝে পড়া।

৪০। শুধু জুমআর ছলাত পড়লেই মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করা। সঠিক কথা হল এক ওয়াক্ত ছলাত ত্যাগ করলেও বে-নামাযী বলে গণ্য হবে। এবং কুফরী গোনাহ হবে।

৪১। নামাযের চার অবস্থায় রফউল ইয়াদাইনকে জাল হাদীছের ভিত্তিতে মানসুখ বলা।

৪২। ছাহাবীগণ বগলের নীচে পুতুল রেখে নামায পড়ার জন্য নবী (সা.) তাদেরকে রফউল ইয়াদাইন করতে বলতেন এরূপ ধারণা ছাহাবায়ে কেরামকে অপবাদ দান ও বিদ'আতী ধারণা, বরং কুফরী ধারণা।

৪৩। এক মাযহাব অবলম্বীর জন্য অন্য মাযহাব অবলম্বীর পিছনে নামায হবে না।

৪৪। হানাফীর পিছনে আহলে হাদীছের, বা আহলে হাদীছের পিছনে হানাফীর নামায হবে না এরূপ ধারণা করা বিদ'আত ও ধারণাকারী বিদ'আতী। কেবল মুসলিম বা ইসলাম থেকে বহির্ভূত ব্যক্তির পিছনে নামায জায়েয নেই।

৪৫। সাধারণ বিদ'আতীর পিছনে নামায জায়িয। তবে এমন ব্যক্তিকে জেনে শুনে নিয়মিত ইমাম নিযুক্ত করা যাবে না।

৪৬। নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া বিশেষভাবে নিরব কিরআত বিশিষ্ট রাকআতে– মানসুখ বলা।

৪৭। চার অবস্থায় রফউল ইয়াদাইন, জোরে আমীন বলা মানসুখ ও মুসল্লীদের মনোযোগ ক্ষুন্নকারী মনে করা।

৪৮। সালাম ছাড়া ইচ্ছাকৃত কোন কাজ যেমন খানা, পিনা ও ইচ্ছাকৃত বায়ূ নিস্কাশন এর মাধ্যমে ছলাত সমাপ্ত করা। (বায়ু নিস্কাশনের মাধ্যমে ছলাত সমাপ্তির হাদীস দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।)

البدع المتعلقة بالولادة والوفاة
জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কীয় বিদ'আত:

১। সুন্নাহ নির্ধারিত সংখ্যার অধিক সংখ্যক পশু আক্বীক্বাহ করা।

২। মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে মন সংকোচিত হওয়া, স্ত্রীকে গালিগালাজ করা।

৩। আক্বীক্বাহ না দিয়ে খাতনার দিন পশু জবাই করা এবং দাওয়াত খাওয়ানোর বিনিময়ে অর্থোপার্জন করা।

৪। শিশুদের ইসলামী তথা ভাল অর্থবোধক নাম না রেখে আজে বাজে নাম রাখা।

৫। মৃত ব্যক্তিকে "মারহুম" বলা এবং কোন প্রতিপক্ষের আক্রমণ বা আঘাতে নিহত হলে শহীদ বলা।

৬। মৃতব্যক্তির জন্য দাড়িয়ে নিরবতা পালন করা।

৭। স্বামীর জন্য স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন ও নিকটাত্মীয়র জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা।

৮। স্বামী মারা যাওয়ার ৪ মাস ১০ দিন পূর্বেই বিবাহ করা।

৯। শোক পালনের জন্য নির্দিষ্ট রং এর পোষাক পরা যেমন কাল বা সাদা।

১০। স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক অপরের জন্য বেগানা হওয়ার ধারনা। সুন্নাত হলো একজন অন্যজনকে গোসল দেয়া।

১১। দুই সাক্ষ্যবাণীর "কালিমাহ" ছাড়া অন্য কোন কথা মূমুর্ষব্যক্তিকে তালক্বীন দেয়া বা শেখানো ও স্মরণ করানো।

১২। মূমুর্ষ ব্যক্তির পার্শ্বে সূরা ইয়াসীন বা কুরআন তেলাওয়াত করা।

১৩। তাকে ক্বিবলামুখী করানো।

১৪। দাফনের পর মৃতব্যক্তির রূহ তার মরণের স্থানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে বলে ধারণা করা।

১৫। মৃত ব্যক্তির নখ কাটা ও নাভির নীচের লোম কামানো।

১৬। শোকের কারণে দাড়ি, গোফ কাটা থেকে বিরত থাকা। দাড়ি শারঈ নির্দেশের কারণে রাখতে হবে কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ এবং গোফ সর্বদা ছোট রাখতে হবে।

১৭। রূহের মাগফিরাতের জন্য সূরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক ও নাস ইত্যাদি পাঠ করা।

১৮। মৃতদেহের উপর ও কবরে গোলাপজল ছিটানো।

১৯। কবরকে পাকা করা বা মাটি হতে আধ হাতের বেশী উচু করা্

২০। কবরের উপর মৃতব্যক্তির নাম ঠিকানা লেখা।

২১। মৃত অলী-দরবেশ বা বিভিন্ন তরীকার পীরের জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য ইছালে ছওয়াব নামক মাহফিল করা। একে ছওয়াব রেসানী ও বলা হয়।

২২। কুলখানি করা।

২৩। ফাতেহাখানি করা। কবরের নিকট যেয়ে সূরা ফাতিহা ও সংক্ষিপ্ত দু'আ পাঠ করা।

২৪। ফাতেহা ইয়াযদাহাম পালন করা। অর্থাৎ প্রতি বছর রবিউস সানী মাসের এগার তারিখে আব্দুল কাদির জীলানী (রহঃ) এর মৃত্যু দিবস পালন করা।

২৫। ফাতিহা দোয়াযদাহম পালন করা। অর্থাৎ প্রতি বছর বারই রবিউল আউয়াল তারিখে নবী (সা.) এর মৃত্যু দিবস পালন করা।

২৬। চেহলাম বা চল্লিশা পালন। মৃত্যুর চল্লিশ দিনের দিন তার রূহের মাগফিরাতের জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয়।

২৭। মাটিয়াল। মৃতব্যক্তিকে দাফনে শরীক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে যে খানা খাওয়ানো হয়।

২৮। মীলাদ বা মীলাদ মাহফিল করা।

২৯। মৃত্যুবার্ষিকী জন্মবার্ষিকী পালন করা।

৩০। রমাযান বা অন্য মাসে মৃত ব্যক্তির জন্য ভোজ অনুষ্ঠান।

৩১। কুরআন তিলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তিকে হাদীয়া দেয়া।

৩২। কাঙ্গালী ভোজ।

৩৩। ওরস করা।

৩৪। ওরসে কুল করা।

৩৫। কবরে বা কফিনে ফুল বা পুস্পস্তবক প্রদান করা।

৩৬। মুসলিম ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা।

৩৭। জানাযার খাটের সামনে জোরে জোরে যিকর ও কুরআন তেলাওয়াত করা।

৩৮। মুর্দার খাট নিয়ে আস্তে আস্তে (চলিশ কদম) হাঁটা।

৩৯। জানাযার সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করা।

৪০ । সূরা ফাতিহার পূর্বে ছানা পাঠ করা ।

৪১ । ঈদের দিন ঈদের সালাতের পর ব্যাপকভাবে কবর যিয়ারত করা ।

৪২ । মৃত ব্যক্তির জামা-কাপড় ও জায়নামায অশুভ মনে করে বাড়ীর লোকেরা ব্যবহার না করে দান করা ।

৪৩ । জানাযার সলাতের পর ও দাফনের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করা ।

৪৪ । জানাযার তাকবীরে রফউল ইয়াদাইন করা বা না করাকে জরুরী মনে করা ।

৪৫ । জানাযার সলাত শেষে লাশের প্রদর্শনী করা ।

৪৬ । মৃতব্যক্তিকে গোসলের শেষে বাড়ীর সকলকে দিয়ে মৃতব্যক্তিকে আবার পানি দেয়া ।

البدع المتعلقة بالزواج والطلاق
বিবাহ ও ত্বলাক সম্পর্কে বিদ'আতঃ

১ । ওয়ালী ছাড়া বিবাহ । ওয়ালী ছাড়া কাজী অফিসে ও কোর্টে বিবাহ করা । এভাবে বিবাহ অবৈধ

২ । কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ । এ ক্বিবাহ অবৈধ ।

৩ । মোহর ছাড়া বিবাহ ।

৪ । কনের নিকট হতে যৌতুক নেয়া ।

৫ । ওয়ালী বিদ্যমান থাকতে উকীল নিযুক্ত করা এবং উকীলকে উকীল পিতা বলা ও পর্দা না করা ।

৬ । আক্বদের পূর্বে সাক্ষী ও উকীলের কনের নিকট হতে সম্মতি আদায়ের জন্য যাওয়া ও বরের মত করে বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মতি আদায় করা ।

৭ । প্রথমে কনের পক্ষ থেকে ওয়ালিমার আয়োজন করা ।

৮ । বাসর রাতে দু'রাকআত ছলাত আদায়ের পরিবর্তে অন্য কিছু করা ।

৯ । বিবাহ উপলক্ষ্যে বরের দাড়ি গোফ সেভ করা এবং কনের ভ্রু প্লাগ সহ বিভিন্ন ধরণের শরীয়ত বহির্ভূত সাজসজ্জা করা ।

১০ । বিবাহের সময় স্বামীর নিকট মহর ছাড়া অন্য কোন খরচ দাবী করা ও সামর্থের অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করা ।

১১। লেখাপড়ার ওজুহাতে উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যুবক-যুবতীদের বিবাহ বিলম্বিত করা।

১২। পিতা কর্তৃক চাকুরীরতা মেয়ের চাকুরীর উপার্জিত সম্পদ ভোগ করার উদ্দেশ্যে বিবাহ বিলম্বিত করা।

১৩। শরীয়তসম্মত ওয়ালীমার দাওয়াত পাওয়ার পর গ্রহণযোগ্য শারঈ ওজর ছাড়া উপস্থিত না হওয়া।

১৪। বিবাহ উপলক্ষ্য ও সব সময় পুরুষের জন্য স্বর্ণের কোন অলংকার ব্যবহার করা।

১৫। ওয়ালীমায় খানা অপচয় করা।

১৬। বিবাহের পূর্বে এঙ্গেজমেন্ট বা বাগদান অনুষ্ঠান করে ভাবী স্বামী কর্তৃক হবু স্ত্রীকে আংটি পরানো। এটি খৃষ্টান ও কাফির সম্প্রদায়ের নিয়ম।

১৭। বিবাহ অনুষ্ঠানে নাচ-গান ও বাজনার জন্য নায়ক নায়িকা বা গায়ক গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের সমাহার ঘটানো।

১৮। স্বামীর নাম উচ্চারণ অবৈধ বা অনিয়ম মনে করা।

১৯। স্বামী-স্ত্রীর যৌনাচারণের কথা অপরের নিকট ব্যক্ত করা।

২০। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া নিয়ে খাম খেয়ালী করা বা সামান্য কিছুতেই তা উচ্চারণ করা।

২১। স্বামীর অজান্তে বা সমর্থন ও অনুমোদন ছাড়াই শুধু কোর্ট বা কাজীর মাধ্যমে বিচ্ছেদপত্র তৈরী ও প্রেরণ করে অন্যত্র বিবাহ করা।

২২। শারঈ যথেষ্ট ও উপযুক্ত কারণ ছাড়া স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া।

২৩। জোর পূর্বক তালাক নেয়া বা দিতে বাধ্য করা।

২৪। রাগ অবস্থায় তালাক প্রদান।

২৫। এক বৈঠকে একাধিক তালাক প্রদান।

২৬। এক বৈঠকে বা এক তুহুরে তালাককে (কার্যকরী) তিন তালাক গণ্য করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো। সুন্নাহ মোতাবেক এক তালাক গণ্য হবে এবং স্বামী-স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে ঘর-সংসার করবে।

২৭। ঋতুস্রাব অবস্থায় ও যে তুহুরের (পবিত্রতার) ভিতর যৌনমিলন ঘটেছে সেই তুহুরে তালাক দেয়া।

২৯। উপরোক্ত অনিয়মতান্ত্রিক এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাকের ভিত্তিতে হালালা (হিল্লা) বা নাটকীয় বিবাহ, বিদ’আত ও ব্যভিচার করানোর শামিল।

৩০। বর কনের জন্য মঞ্চ নির্মাণ এবং সেই মঞ্চে উভয়ে পাশাপাশি বসা এবং উপস্থিত সকল নারী-পুরুষদের দেখা অবাধ করে দেয়া।

৩১। মাইকের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠানের অবৈধ গান-বাজনার মাধ্যমে অন্যদের কষ্ট দেয়া।

৩২। ছবি তোলা, ভিডিও করা।

৩৩। দ্বীনের ক্ষেত্রে বর-কনের সমতা ছাড়া বিবাহ দেয়া।

৩৪। নামাযীর সাথে বে নামাযীর বিবাহ দেয়া।

৩৫। পীর পুঁজারী, ক্ববর পুঁজারী ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং খাটি দ্বীন চর্চাকারীর মাঝে বিবাহ।

البدع المتعلقة بالذكر والدعاء والصلاة على النبى

দু‘আ, দরূদ ও যিকির-আযকারের ক্ষেত্রে বিদ‘আত :

১। আলাহ্র নিকট দু‘আ না করা।

২। হাত তুলে দু‘আ করা, কখনই ঠিক নয় এরূপ মনে করা।

৩। উচ্চস্বরে দু‘আ করা।

৪। ফরয সলাতের পর একাকী বা সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দু‘আ করা। অবশ্য একাকী হাত তুলে দু‘আ যঈফ জাল হাদীছে পাওয়া যায়– যা আমল যোগ্য নয়।

৫। হাত তুলে দু‘আ শেষে মুখে মুছা।

৬। নবী বা পীর অলীদের অসীলায় দু‘আ করা।

৭। দু‘আ কবুলের জন্য তাড়াহুড়া করা।

৮। ছন্দাকারে দু’আ পাঠ করা।

৯। নিজের মৃত্যু চেয়ে দু‘আ করা।

১০। পাপময় দু‘আ যেমন কোন নিকটাত্মীয়র নাম উল্লেখ করে বলা যে, আল্লাহ অমুকের মুখ যেন দেখতে না হয়।

১১। নিজের বা সন্তানের জন্য বদ দু‘আ করা।

১২। জোরে জোরে সমস্বরে যিকর করা।

১৩। বিজ্ঞাপন ও পোষ্টারের মাধ্যমে হালকায়ে যিকিরের প্রচার ও আয়োজন করা।

১৪। তরীকা ও পীর ভিত্তিক যিকিরের শব্দ ও স্বরের তারতম্য বজায় রাখা।

১৫। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পূর্ণ অংশ উচ্চারণের মাধ্যমে যিকির করা। কেননা যিকিরের বাক্য শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

১৬। যিকিরের ক্ষেত্রে লতীফা যোগ করা।

১৭। আলাহ-রসূল বলে যিকির করা।

১৮। আল্লাহ মুহাম্মাদ পাশাপাশি উচ্চারণ বা পাশাপাশি লেখা।

১৯। ইয়া নাবী সালামু আলাইকা-ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা, ছলাতুল্লাহি আলাইকা। এই শব্দে সবাই মিলে দরূদ পড়া।

২০। দরূদে সাইয়্যেদিনা শব্দ যোগ করা।

২১। ৩০ পারা দরূদের কিতাব রচনা করা।

২২। দরূদে তাজ পাঠ করা।

২৩। দরুদে মাহী রচনা ও পাঠ করা।

২৪। দরূদে হাজারী পাঠ করা।

২৫। দরূদে তুনাজ্জিনা পাঠ করা।

২৬। দরূদে শিফা পাঠ করা।

২৭। দরূদে ফুতুহাত পাঠ করা।

২৮। দরূদে রু'ইয়াতি নবী পাঠ করা।

২৯। দরূদে খায়ের পাঠ করা।

৩০। বানোয়াট বিভিন্ন আমল, দু'আ ও যিকির-আযকার যা মকছূদুল মো'মিনীন, নিআমুল কুরআন ও আমালে নাজাত পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়।

৩১। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তাসবীহ সমূহ যা আমাল নাজাতে রয়েছে।

البدع المتعلقة بالتقاليد والعادات

প্রথা ও রসম রেওয়াজগত বিদ'আত:

১। কাফিরদের সাদৃশ্যতা পোষণ করা, তাদের প্রতীকে, সংস্কৃতিতে, পূঁজা অর্চনায়, মেলা, উৎসবে ও পোষাকে।

২। ঝড়-তুফান, জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদিকে আল্লাহর আযাব-গযব না বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আখ্যা দেয়া। তাওবা-ইস্তিগফার না করে বাজেট ও সেনাবাহিনী দ্বারা মোকাবিলার ঘোষণা করা।

৩। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ঝড়-তুফানের সময় হৈ চৈ ও জোর আওয়াজে ডাকাডাকি করা হয়। ঢাক-ঢোল পিটা হয়।

৪। বেগানা মহিলাদের সাথে হ্যাণ্ডশেক বা মুসাফাহা করা।

৫। বাম হাত দিয়ে খানা খাওয়া ও পান করা।

৬। হাতের কব্জি তৈরী ও চোখ অঙ্কনের মাধ্যমে বদনজর ঠেকানোর রেওয়াজ।

৭। বরকত কামনার জন্য বিভিন্ন সংখ্যা (বেজোর সংখ্যার) গুরুত্ব দান।

৮। এপ্রিল ফুল পালন করা।

৯। ইসরা মে'রাজ উদযাপন করা।

১০। শবে বরাত উদযাপন করা।

১১। শবে বরাতের রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে এরূপ বলা ও বিশ্বাস করা।

১২। রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী বা সীরাহ মাহফিল, র‌্যালী, জশনে জুলুস করা।

১৩। কৃসমাস ডে বা বড় দিন (যিশু খৃষ্টের জন্মোৎসব) পালন করা। খৃষ্টানদের এই দিন উপলক্ষে উপহার ও উপঢৌকন দেয়া।

১৪। মুহাররম উপলক্ষে হুসাইন (রা.) এর জন্য মাতম ও তাযিয়াহ করা, হুসাইনের হত্যাকাহিনী ও কারবালার ঘটনা আলোচনা করা।

১৫। ইসলাম যিন্দা হোতা হায় হার কারবালাকে বাদ– এ প্রবাদ বাক্য বলা ও বিশ্বাস করা।

১৬। ছাহাবী মুয়াবিয়া এবং তার পুত্র ইয়াযীদকে গালাগালি করা ও ঘৃণা করা।

১৬। রজব মাসের প্রথমে রোযা রাখা।

১৭। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ছাড়া বাৎসরিক অন্য কোন ঈদ বা উৎসব উদযাপন করা।

১৮। দুই ঈদের দিন ব্যাপকভাবে কবর যিয়ারত করা।

১৯। বাংলা, ইংরেজী বা আরবী নববর্ষ পালন করা।

২০। নবী (সা.) ও মুসলিম জাতির জন্য মক্কা বিজয় বিরাট জয় হওয়া সত্ত্বেও তা সহ অন্য কোন বিজয় দিবস পালন করা।

২১। দেশের বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস পালন করা।

২২। পহেলা বৈশাখ পালন করা।

২৩। ভাষা দিবস পালন করা।

২৪। থার্টি ফার্ষ্ট নাইট পালন করা।

البدع المتعلقة برمضان والصيام
রমাযান ও রোযা সম্পর্কীয় বিদ‘আত:

১। শুধু রমাযান মাসে নামায পড়া ও ইবাদাত করা।

২। রমাযান মাসে রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও গর্হিত কাজ বা গুনাহের কাজ চালিয়ে যাওয়া।

৩। রোযার শুধু শারিরিক উপকারীতা বলা।

৪। ছিয়ামরত অবস্থায় ঘুম ও অলসতায় সময় কাটানো।

৫। রোযাদারের ঘুমও ইবাদত (যঈফ হাদীছ ভিত্তিক) এমন কথা বিশ্বাস ও চর্চ্চা করা।

৬। ইফতার ও সাহরীতে রকমারী খানা-পিনার মহড়া (আয়োজন) করা।

৭। অত্যন্ত দুর্বল হাদীছের ভিত্তিতে এরূপ বিশ্বাস করা যে, এ মাসে একটি নফল ইবাদাত অন্য মাসের একটি ফরয ইবাদাতের সমতুল্য ও একটি ফরয ইবাদাত অন্য মাসের সত্তরটি ফরযের সমতুল্য।

৮। এ মাসকে তিন দশকে ভাগ করা। প্রথম দশক রাহমাতের দ্বিতীয় দশক মাগফিরাতের এবং তৃতীয় দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির।

৯। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিতরাহ দেয়া।

১০। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ভিন্ন নামায মনে করা।

১১। এগার রাকআতের বেশী তারাবীহ পড়া।

১২। শবে কদরের রাত্রে কদরের (বিশেষ) নামায পড়া।

১৩। সহুর (সাহরীর) রান্নার আযান দেয়া।

১৪। শুধু রমাযানে ফজরের পূর্বে আযান দেয়া, এবং অন্য ১১ মাসে না দেয়া।

১৫। নামায না পড়ে রোযা রাখা।

১৬। সূর্য ডুবার পরও অধিক সতর্কতার অজুহাতে ২/১ বা ততোধিক মিনিট বিলম্বে ইফতার করা।

১৭। রোযা ইফতারের জন্য দাওয়াত করলে দাওয়াত কারী তার রোযার ছওয়াব পেয়ে যাবে এ আশঙ্কায় দাওয়াতে না যাওয়া।

১৮। ইফতারের পূর্বে একাকী দু'আ না করে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা।

১৯। ভুলক্রমে দিনের বেলা খানা-পানি বা যৌনসম্ভোগ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় মনে করা বা ফাতওয়া দেয়া।

২০। রোগজনিত কারণে বমি হলে রোযা ভঙ্গ হয় মনে করা।

২১। ক্ষত ও ঘা থেকে রক্ত নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হয় মনে করা।

২২। মসজিদ ছাড়া বাড়ী বা অন্য কোথাও ই'তিকাফ জায়িজ মনে করা।

২৩। দশদিনের কম সময় বা রোযা ছাড়া ই'তিকাফ হবে না এমন মনে করা।

২৪। তারাবীহতে কুরআন খতম জরুরী মনে করা।

২৫। তিন রাতের বেশী জামাতে তারাবীহ পড়া যাবে না এরূপ ধারণা করা।

২৬। জামাতে তারাবীহ পড়াই যাবে না এরূপ ধারণা করা।

২৭। ক্বিয়াম, ক্বিরাআত ও রুকু-সাজদাহ সংক্ষিপ্ত বা হাল্কা করে তার পরিবর্তে ১১ এর বদলে রাকআত সংক্ষা বেশী ২০ রাকআত তারাবীহ পড়া।

البدع المتعلقة بالزكاة والصدقة
যাকাত ও ছদাকাহ বিষয়ক বিদ'আত:

১। নিসাব নির্ধারণ ছাড়া – (যে কোন পরিমাণের) সম্পদের উপর যাকাত ফরয মনে করা।

২। সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট বা সর্ব নিম্নমানের মাল আদায় করা।

৩। যাকাত থেকে পলায়নের জন্য টাল-বাহানার আশ্রয় নেয়া।

৪। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা।

৫। যাকাতকে ঐচ্ছিক মনে করা।

৬। কাপড় বিতরণ বা খানা খাদ্যের দ্বারা যাকাত দেয়া।

৭। পাওনা টাকা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে যাকাতের মধ্যে গণ্য করা।

৮। যাকাতের অর্থ দ্বারা শ্রমিককে নিজের স্বার্থে খাটানো।

৯। যাকাত ও ছদাকার সম্পদ দেয়ার পর খোঁটা দেয়া।

১০। হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া সম্পদকে যাকাতের মধ্যে গণ্য করা।

১১। যাকাত বিতরণের প্রদর্শণী করা।

১২। টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু দ্বারা ফিতরার যাকাত আদায় করা।

১৩। ঈদের সলাতের পর যাকাতুল ফিতর আদায় করা।

১৪। ধান ও পচনশীল খাদ্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করা।

১৫। নামায-রোযা না করে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা।

১৬। বেনামাযী ও বেরোযাদারকে যাকাতুল ফিতর বা যাকাতের সম্পদ দান করা। অসুস্থতার কারণে রোযা না রাখলে তাকে দেয়া যাবে।

১৭। যাকাতুল ফিতর এর জন্য সাধারণ সম্পদের নিছাব শর্ত করা।

১৮। শাক-সব্জির যাকাত দিতে হবে এরূপ ধারণা।

১৯। গবাদি পশুর যাকাত দেয়া প্রযোজ্য মনে করা।

২০। খাজনা ও ট্যাক্সের কারণে যাকাত মাফ মনে করা।

২১। বছরের জন্য খাদ্য খোরাক এর পরিমাণের পর উদ্বৃত্ত টার ওশর দিতে হবে এমন ধারণা করা।

২২। অর্ধ ছা ও প্রধান খাদ্য দ্বারা ফিতরাহ দেয়া।

البدع المتعلقة بالحج والعمرة
হজ্জ ও উমরাহ বিষয়ক বিদ‘আত:

১। পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করা বা বিনা কারণে হজ্জ বিলম্বিত করা।

২। বেনামাযী, বেরোযাদার ও যাকাত অনাদায়কারী ব্যক্তির হজ্জ করা।

৩। উমরাহকে বা রামাযান মাসে উমরাহ্ পালনকে ফরয হজ্জের বিকল্প মনে করা বা ছোট হজ্জ বলা।

৪। মীকাতের পূর্বে সফর আরম্ভের সময় বা বিমানবন্দর থেকে ইহ্রাম বাঁধা বা লাব্বায়িকা তালবিয়া পাঠ করা।

৫। টঙ্গী মাঠের ইজতিমাকে গরীবদের হজ্জ বলা বা আরাফাতের ইজতিমার সাথে তুলনা করা।

৬। পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া অন্য কিছুকেও সেলাইমুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করা।

৭। হজ্জ পালনের নিয়ত থাকা সত্ত্বেও ইহ্রামবিহীন অবস্থায় মদীনা যাওয়া।

৮। মদীনা যিয়ারাতকে হজ্জের অংশ মনে করা।

৯। হজ্জ সফরে নবী (সা.) এর কবর দেখাকে মুখ্য উদ্দেশ্য বানানো।

১০। মক্কা-মদীনা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে হজ্জে যাওয়া।

১১। হজ্জ সফরে গমণকারীকে নবী (সা.)-এর নিকট সালাম পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া।

১২। ৮ই যিলহজ্জের পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা।

১৩। ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ছাড়া বা অকারণে দম দেয়া।

১৪। ৮ই যিলহজ্জের পূর্বে বা হজ্জের পর নিজের বা অপরের জন্য একাধিক উমরাহ পালন করা।

১৫। ১০ ই যিলহজ্জের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করা।

১৬। ১১ ও ১২ তারিখে মিনায় রাত যাপন না করা।

البدع المتعلقة بعيدي الفطر والأضحى

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সংশিষ্ট বিদ‘আত :

১। বাৎসরিক উপরোক্ত দুই ঈদ ছাড়া অন্য কোন ঈদের অস্তিত্ব স্বীকার করা। যেমন ঈদে মীলাদুন্নবী।

২। ৬ তাকবীরে নবী (সা.) ঈদের সলাত আদায় করেছেন এমন তথ্য পরিবেশন করা বা বিশ্বাস করা।

৩। ১২ তাকবীর ছাড়া ঈদের নামাযই বাত্বিল বা অশুদ্ধ মনে করা।

৪। মসজিদের ভিতর ঈদের নামায পড়া। তবে শারঈ ওজরের কারণে জায়িয।

৫। মহিলাদের ঈদের মাঠে না নেয়া বা তাদের জন্য ঈদের মাঠে যাওয়ার ব্যবস্থা না করা।

৬। মহিলাদের ঈদের মাঠে না যেয়ে পাড়া-গ্রামের মসজিদে স্বতন্ত্র ঈদের জামাআত করা। কোন পুরুষ ব্যক্তি জামাত পড়ালেও বিদ'আত হবে।

৭। সূর্য উঠার পর ঘন্টার পর ঘন্টা বিলম্বিত করে ঈদের ছলাত পড়া। খুব জোর সূর্য উঠার আধা ঘন্টা পর ঈদের সলাত পড়া উচিত। তবে ঈদুল আযহার তুলনায় ঈদুল ফিতর কিছুটা বিলম্বিত করা যায়।

৮। ঈদুল আযহার দিন অর্ধ প্রহর রোযা রাখা বা রোযার নিয়ত করা।

৯। মুক্বীমের জন্য কোন অবস্থায়ই শরীক কুরবানী দেয়া যাবে না, এরূপ ধারণা করা।

১০। সামর্থ থাকা সত্বেও মুসাফির বা মুক্বীম অবস্থায় শরীকে কুরবানী দেয়া।

১১। বেনামাযী, বেরোযাদার, যাকাত অনাদায়কারীর কুরবাণী দেয়া।

১২। ক্বুরবাণীর প্রদর্শনী করা।

১৩। ক্বুরবানী দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যিলহাজ্জের প্রথম তারিখ থেকে নখ, লোম ও চুল কাটা থেকে বিরত না থাকা।

১৪। কুরবানীর সামর্থ রাখে না এমন ব্যক্তি প্রথম তারিখ থেকে নখ, লোম ও চুল কাটা থেকে বিরত থেকে দশ তারিখে এগুলো কাটলে কুরবানী আদায় হবে বা কুরবানীর ছওয়াব পাবে এরূপ ধারণা করা। (ভিত্তিহীন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত)

১৫। সকল ঈদের সেরা ঈদ নবীজীর জন্ম ঈদ ধারণা করা। জঘন্য ধরণের বিদ'আত।

১৬। সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও ধারকর্য ও কষ্ট করে গোস্ত খাওয়ার জন্য কুরবাণী দেয়া।

البدع المتعلقة بالفرق والأحزاب والتنظيمات
বিভিন্ন দল ও সংগঠন কেন্দ্রীক বিদ'আত:

১। মুসলিম সমাজকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা।

২। এক মুসলিম থেকে অন্য মুসলিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা।

৩। মুসলিমদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করা।

৪। মুসলিমদের মাঝে পরস্পর সহযোগীতা বন্ধ করা।

৫। বহু দল ও নেতার জন্মের কারণে সাধারণ মুসলিম সমাজের দিশেহারা হওয়া।

৬। ঐক্য বিনষ্ট ও শক্তি খর্ব করা।

৭। পরস্পরের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ ছড়ানো।

৮। একাধিক জনের বায়আত করা।

৯। গভীর জ্ঞান চর্চ্চা ব্যাহত ও বন্ধ হয়ে যাওয়া।

১০। আল্লাহ ও ইসলামের ভিত্তি না হয়ে সংগঠন বা দলীয় ভিত্তিতে অলা-বারা বা শত্রুতা-মিত্রতা কায়েম হওয়া।

১১। পরস্পরের মাঝে কাদা ছুড়াছুড়ি গীবত ও বদনাম বিনিময়।

১২। ভ্রাতৃত্ববোধ ক্ষুন্ন।

১৩। ক্বুরআনের বহু আয়াত ও নবী (সা.) এর বহু হাদীছ আমলের পথে বাঁধা সৃষ্টি করা।

১৪। প্রত্যেকটি সংগঠনের ইসলামী জামাআত বলে দাবী করা। এতে করে একাধিক জামআতের অস্তিত্ব স্বীকৃতি দেয়া হয় অথচ ইসলামে একটি মাত্র জামাআত স্বীকৃত বহু জামাআত নয়।

১৫। দলীয় নেতাদের (ছোট ছোট আলিমদের) তাক্বলীদ বা অন্ধানুসরণের জন্ম।

১৬। উপরোক্ত বিদ'আত যেহেতু জন্ম দেয় এ জন্য প্রচলিত সকল সংগঠনই বিদ'আত, এমনকি জামাআতুল মুসলিমীন নামেও যতগুলো সংগঠন হয়েছে সেগুলোও বিদ'আত। অতএব প্রচলিত দল ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে যারা ক্বুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান আহরণ, আমল ও দাওয়াতে নিয়োজিত তারাই নাজাত প্রাপ্ত দল, তারাই ঐক্যবদ্ধ এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে জামাআতুল মুসলিমীন।

البدع المتعلقة بالسلام والمصافحة
সালাম মুসাফাহা সম্পর্কিত বিদ'আত

১। কাফির ও বেনামাযীদের প্রথমে সালাম দেয়া।

২। শুধু বিশেষ বিশেষ ও পরিচিতদেরকে সালাম প্রদান করা।

৩। সাক্ষাতের সময় সালামের পূর্বে কথা বলা।

৪। দুই দুই চার হাতে মুসাফাহা করা।

৫। সালাম নিয়ে ঠাট্টা মসকরা করা।

৬। আদাব, বা নমস্কার বলে বিধর্মীদের সালাম জানানো।

৭। সালামের পরিবর্তে শুভ সকাল, শুভ মধ্যাহ্ন (দুপুর) বা শুভ সন্ধ্যা এ জাতীয় কথা বলা।

৮। শুধু হাত বা অন্য কোন ইশারায় সালাম জানানো। তবে মুখে উচ্চারণপূর্বক ইশারার মাধ্যমে সালাম জানানো হলে এতে সমস্যা নেই।

৯। শুধু আসার সময় সালাম মুসাফাহা করা সুন্নাত সম্মত মনে করা, যাওয়ার সময় সুন্নাত সম্মত মনে না করা।

১০। বেগানা নারীর সাথে মুসাফাহা করা।

১১। পিতা-মাতা নিজ সন্তানদের বা সন্তানদের নিজ পিতা-মাতাকে সালাম না দেয়া ও মুসাফাহা না করা।

১২। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সালাম না দেয়া।

১৩। পায়ে সালাম করা।

১৪। কারো পায়ে বা শরীরের কোন অঙ্গে পা লাগলে সালাম করা।

১৫। সালামের পরিবর্তে বা সালামসহ কদমবুসী করা।

البدع المتعلقة بالقرآن والسنة
কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত বিদ‘আত

১। কুরআন ও ছহীহ সাব্যস্ত হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ লাগানো বা দ্বন্দ থাকতে পারে ধারণা করা।

২। কুরআনের ভিতর কমবেশী বা বিকৃতি ঘটেছে এমন ধারণা পোষণ করা। যেমন শীআ রাফেযীরা করে থাকে। তারা মনে করে আসল কুরআন ৯০ পারা ও ১৭ হাজার আয়াত বিশিষ্ট।

৩। যঈফ ও জাল হাদীছ আমল করা।

৪। ক্বুরআন ও হাদীছের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং ছালেহীন এর বুঝ তথা ক্বুরআন-সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মৌলনীতি ও সূত্রাবলী ছাড়া বুঝার ও আমলের চেষ্টা করা এবং ফাতওয়া দেয়া।

৫। হাদীছের ভিতর যঈফ ও জাল থাকা অস্বীকার করা বিদ'আত ও মূখতা।

৬। বিবেকের সাথে ক্বুরআন সুন্নাহর সামঞ্জস্যতা তালাশ করা এবং তার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বর্জন করা।

৭। ক্বুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা।

৮। হাদীছ অমান্য করে ক্বুরআন মানার দাবী করা।

৯। ইজমা ক্বিয়াসকে ক্বুরআন-সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়া।

১০। মাযহাব বা কোন ইমামের কথাকে ক্বুরআন-সুন্নাহর উপর অগ্রাধিকার দেয়া।

১১। ক্বুরআন-সুন্নাহর বিধান বা শাসনকে কোন যুগ বা ভূখণ্ডের জন্য সীমাবদ্ধ করা এবং বর্তমান ও ক্বিয়ামত কাল পর্যন্ত প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন উপযোগী মনে না করা।

البدع المتعلقة بالجهاد
জিহাদ ও সংগ্রামঃ

১। বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক রাজনীতির আওতায় অনুষ্ঠিত ভোটকে জিহাদ ও সংগ্রাম ধারণা করা।

২। জিহাদকে সন্ত্রাস বা চরমপন্থা মনে করা।

৩। মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমনকি নামধারী মুসলিম (যাদেরকে মুনাফিক বলা যায়) এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা। তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে হবে।

৪। শর্তবিহীন ভাবে জিহাদ বিদ'আত ও সন্ত্রাসী কাজ।

৫। প্রকাশ্য ইমামের নেতৃত্ব ছাড়া জিহাদ। যেমন গোপন নেতার নেতৃত্বে বা একাকী বা কয়েকজন মিলে জিহাদ করা। তবে আক্রান্ত হলে সেটা ভিন্ন কথা।

৬। নিয়মাবলী ছাড়া শুধু নির্দেশ ও ফযীলতের ভিত্তিতে জিহাদ করা।

৭। প্রেক্ষাপট ও ন্যূনতম সামর্থ ছাড়া জিহাদ করা।

৮। মুসলিম ও কাফির পক্ষ পরিপূর্ণভাবে ছাঁটাই হওয়া ছাড়া যুদ্ধ করা।

৯। নবী (সা.) ও ছাহাবায়ে কেরামের জিহাদকে ডাকাতি, ছিনতাই এর সাথে তুলনা করা।

১০। জিহাদ রহিত হয়ে গেছে বলে বিশ্বাস ও মন্তব্য করা।

شروط لا إله الا الله محمد رسول الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর শর্ত সমূহঃ

এগুলো হলো ইসলামের ও ঈমানের শর্তাবলী। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছের আলোকে কালিমার ৮টি শর্ত পাওয়া যায়।

১। ইলম অর্জন করাঃ এই কালিমা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় রুকনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ না করলে এই কালিমার উপর আমল করা যাবে না। ফলে এই কালিমাহ অকেজো ও নিষ্ক্রিয় বলে বিবেচিত হবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকৃতি দেয়ার পূর্বে তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন:

فَٱعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ

অবগতি বা জ্ঞান লাভ কর যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। – সূরা মুহাম্মাদ ১৯।

হাদীছেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এই শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة (رواه مسلم)

উছমান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এই বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে মারা যাবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। – মুসলিম।

এ শর্তের বিপরীত হল অজ্ঞতা : কেউ যদি কালিমার অর্থ, মর্ম ও নির্দেশনা সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞান অর্জন না করে তবে তার ক্ষেত্রে কালিমা নিষ্ক্রিয় বা অকেজো। এমতাবস্থায় সারাজীবন ধরে কালিমার শতবার

কেন সহস্র, লক্ষ বার উচ্চারণ, আউড়িয়ে ও যিকির করে মু’মিন-মুসলিম হতে পারবে না।

২। অত্র কালিমাকে সত্যায়ণ করতে হবে: কালিমা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং সেই জ্ঞান অনুযায়ী কালিমার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। কোন একটি বিষয় মিথ্যা জানলে কালিমার শর্ত ক্ষুন্ন হবে। রাসুল (সা.) এর যুগের মুনাফিকরা আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর উপর মৌখিক স্বীকৃতি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর দ্বারা ঈমান এনেছিল। এই কালিমার দাবী অনুযায়ী বাহ্যিক ভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ছদাকাহ, খয়রাত এমনকি অনেকে জিহাদের জন্যও বের হতো। কিন্তু যেহেতু তারা এসব মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো না যার জন্য তাদেরকে আল্লাহ কাফির, মুনাফিক্ব, মুশরিক ও বেঈমান বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

আর লোকদের মধ্যে অনেকেই বলে আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপরে ঈমান এনেছি অথচ তারা মু’মিন নয়। – বাকারাহ ৮।

আল্লাহ আরো বলেন:

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

(হে রাসূল!) আপনার নিকট যখন মুনাফিক্বরা আসে তখন বলে যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তো জানেনই যে, নিশ্চয়ই আপনি তাঁর রাসূল। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, মুনাফিক্বরা (তাদের সাক্ষীতে) নি:সন্দেহে মিথ্যাবাদী। – সূরা মুনাফিকুন ১।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এই শর্তটি কালিমার স্বীকৃতিদান ও জ্ঞান লাভের সাথে সত্যবাদিতার শর্তারোপ করেছেন।

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ قال لبيك وسعديك قال: يامعاذ، قال لبيك وسعديك قال قال: ما من أحد يستشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار (متفق عليه)

আনাস (রা.) থেকে বর্নিত। একদা মুআয (রা.) নবী (সা.) এর বাহনের পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূল (সা.) বললেনঃ হে মুআয! তিনি (রা.) সাড়া দিয়ে বললেন (লাব্বাইকা ও সাআদাইকা) উপস্থিত আছি আপনার খিদমতে হাজির আছি। আবার রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ হে মুআয! তিনি (রা.) বললেনঃ আমি উপস্থিত আছি, আপনার খিদমতে হাজির আছি। তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন হে মুআয! তিনি বললেনঃ আমি উপস্থিত আছি, আপনার খিদমতে হাজির আছি। তিনি বললেন, অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ যে কেউ আন্তরিক সত্যবাদিতার সাথে এই সাক্ষ্য দান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। – বুখারী ও মুসলিম।

এ শর্তের বিপরীতে হলোঃ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। যদি কেউ কালিমার কোন বিষয় তথা আলাহ ও রাসূল (সা.) সংশিষ্ট কোন বিষয় যেমন কুরআন ও ছহীহ হাদীছে পরিবেশিত কোন সংবাদ বা তথ্য, নিয়মাবলী, আদেশ, নিষেধ, নেকী, গুনাহের বিষয়কে মিথ্যা মনে করে তবে তার ক্ষেত্রে কালিমা অকেজো ও নিস্ক্রিয় হবে। ফলে সে ব্যক্তি মুসলিম বা মু'মিন হতে পারবে না।

৩। ইয়াক্বীন বা অকাট্য বিশ্বাস বা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করাঃ ইয়াক্বীন হলো দ্বিধা সন্দেহ ও সংকোচের বিপরীত শব্দ অর্থাৎ এই কালিমাহ ও তার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সংকোচ ও সন্দেহাতীতভাবে ইয়াক্বীন বা বিশ্বাস করতে হবে। শুধু সত্য জানলেই হবে না বরং সত্য জানার পর সন্দেহ ও সংকোচ করা চলবে না। আলাহ বলেনঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَاهَدُوا۟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ

মু'মিন তো কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমান এনে দ্বিধা-সংকোচ ও সন্দেহ করে নি। আর তাদের মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করে প্রকৃতপক্ষে এরাই হলো সত্যবাদী। – সূরা হুজুরাত ১৫।

ক্বিয়ামতের দিন মুনাফিক্বরা পুলছিরাত পার হওয়ার সময় দারুন সংকটময় ও করুণ অবস্থায় পড়বে। তার কারণ হিসাবে তারা তাদের দ্বিধা সংকোচের কথা উল্লেখ করবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَ ٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغرَّتْكُمُ ٱلأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ

সেদিন দেখবেন মু'মিন ও মু'মিনাহদের নূর তাদের সম্মুখ ও ডান দিকগুলোকে আলোকিত করে চলবে। (বলা হবে) আজ তোমাদের সুসংবাদ হলো জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, তারা তার ভিতর চিরদিন বসবাস করবে এটাই হল বিরাট সফলতা। সেদিন মুনাফিক্ব নর ও মুনাফিক্ব নারীরা মু'মিনদের লক্ষ করে বলবে তোমরা একটু আমাদের জন্য অপেক্ষা কর তোমাদের নুর থেকে কিছু আলো সংগ্রহ করি। বলা হবে পিছনে ফিরে যেয়ে নূর সংগ্রহ কর। পিছনে দেখামাত্র একটি আড় বা পর্দা স্থাপন করা হবে। তার একটি দরজাও থাকবে যার অভ্যন্তরে রহমত ও সামনের বাহিরাংশে শাস্তির ব্যবস্থা। তারা (মুনাফিক্বরা) মু'মিনদেরকে আহবান করবে এই বলে– আমরা কি তোমাদের সঙ্গে (বসবাস করে) ছিলাম না? তারা (মুমিনরা) বলবে হ্যাঁ, সত্য। কিন্তু (ধর্মীয় ক্ষেত্রে) তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করেছ, অপেক্ষা করেছ, দ্বিধা সংকোচ করেছ এবং অবান্তর আশা-আকাঙ্খা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে। এমতাবস্থায় তোমাদের নিকট আলাহ্র হুকুম (অর্থাৎ মৃত্যুর আদেশ) এসে পড়েছে, এভাবে প্রতারিতকারী তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করেছে।

– সূরা হাদীদ ১২-১৪।

ছহীহ্ হাদীছের দলীল :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة (رواه مسلم)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, এবং আমি আল্লাহর রাসূল" এই দু'টি সাক্ষ্য দ্বিধা

সংকোচ না করে যদি কোন বান্দা প্রদান করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। – মুসলিম।

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) (ঘটনা সম্বলিত হাদীছে) আবু হুরাইরা (রা.)কে বলেছিলেন:

فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة (رواه مسلم)

এই প্রাচীরের পিছনে যার সঙ্গে সাক্ষাত হবে সে যদি অন্তরের ইয়াক্বীনের সাথে দ্বিধাহীন চিত্তে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও। – মুসলিম।

ইমাম বুখারী অনুচ্ছেদের ভিতর মুআল্লাক ভাবে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

عن ابن مسعود الصبر نصف الإيمان واليقين الايمان كله (رواه البخاري)

ধৈর্য হলো ঈমানের অর্ধাংশ এবং ইয়াক্বীন দ্বিধা সংকোচ মুক্ত বিশ্বাস হলো পরিপূর্ণ ঈমান। – বুখারী মুআল্লাকভাবে।

এই শর্তের বিপরীত: কেউ এই কালিমার মূল বিষয় আল্লাহ এবং রসুল তথা তাদের বাণী কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত কোন বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ সংশয় পোষণ করে তবে তার কালিমাহ অকেজো ও নিস্ক্রিয় বলে গণ্য হবে। ফলে সে মুসলিম ও মু'মিন বলে গণ্য হবে না।

৪। গ্রহণ করা: কালিমা لا إله إلا الله এর অর্থ বুঝে বিশ্বাস ও ইয়াক্বীন পোষণই যথেষ্ট হবে না। বরং কালিমাহকে তথা তার সংশ্লিষ্ট সব কিছুকে আন্তরিকভাবে পরিগ্রহণ করতে হবে। কালিমার দাবী অনুযাযী যে সমস্ত দায়িত্ব বা কর্তব্যভার অর্পিত হবে তা সানন্দে মনে-প্রাণে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

কারণ তদানিন্তন যুগের (নবী (সা.) এর যুগের) কাফিররা কালিমার অর্থ ও মর্ম বুঝার পরও গ্রহণ করেনি অহঙ্কার ও পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার কারণে।

তারা বুঝেছিল যে, لا إله إلا الله محمد رسول الله এর অর্থ ৩৬০টি মুর্তি ভেঙ্গে ফেলে শুধুমাত্র এক আল্লাহর উপাসনা করতে হবে। এটা বুঝার পর

তারা সেই কালিমার দাওয়াত গ্রহণ করেনি। বরং প্রত্যাখ্যান করেছিল এই বলে: أَجَعَلَ ٱلآلِهَةَ إِلَـٰهاً وَاحِداً إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

সে কি সমস্ত উপাস্য এক উপাস্যে সীমিত করে ফেলল এটা ভারী আশ্চর্যের বিষয়। –সূরা ছোয়াদ ৫।

إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوٓاْ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

যখন তাদেরকে বলা হতো لاإله إلا الله আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই তখন তারা অহঙ্কার বশত: তা গ্রহণ করতো না আর বলত – কি আমরা এক পাগল, কবির কথায় আমাদের উপাস্য গুলিকে ছেড়ে দিব?

–সূরা ছাফফাত ৩৫-৩৬।

হাদীছেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এই শর্ত করেছেন:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار (رواه مسلم)

সাহাবী আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ (সা.) বলেছেন: সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন এই উম্মাতের (মানবগুষ্ঠির) যে কেউ ইয়াহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক আমার উপর ও আমার সাথে প্রেরিত বস্তুর (কুরআন ও হাদীছের) উপর ঈমান আনয়ন না করে মৃত্যু বরণ করলে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। –মুসলিম।

এ শর্তের বিপরীত হচ্ছে প্রত্যাখ্যান: কালিমার সংশিষ্ট যাবতীয় গ্রহণ করার অর্থ কুরআন ছহীহ হাদীছ তথা ইসলামী শরীয়তের কোন একটি বিষয় প্রত্যাখ্যান করা কালিমাহ অকেজো ও নিষ্ক্রিয় বিবেচিত হবে। এ অবস্থায় বিজড়িত ব্যক্তি মুসিলম বা মু'মিন হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

৫। মুহাব্বাত বা ভালবাসা প্রদর্শন: অর্থাৎ এই কালিমা ও তার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে ভাল বাসতে হবে। কোন প্রকার অনীহা, বিদ্বেষ, অপ্রীতি ও অপ্রিয়তা প্রদর্শন করা চলবে না, নইলে কালিমার শর্ত ক্ষুন্ন করা হবে। আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সা.) তার বান্দা

ও রাসূল” এই সাক্ষ্য দিতে হবে মুহাব্বাতের সাথে অর্থাৎ আলাহ ও রাসূল (সা.) কে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভালবাসতে হবে এবং তাদের ভালবাসার দাবী তখনই সঠিক বলে বিবেচিত হবে যখন তাঁদের পছন্দ মোতাবেক আমল করা হবে তারা তাদেরকে ভালবাসার যে পন্থা দিয়েছেন সেই পন্থায় ভালবাসতে হবে। তারা যা করা ভাল বাসেন তা করার জন্য সর্বদা বাধ্য থাকবে। কেননা ভালবাসার দাবী তুলে যদি ভালবাসার পাত্রের রুচির বিরুদ্ধে চলা হয়, সে যা করতে ভালবাসে তা ভাল না বাসা হয়, সে যা পরিত্যাগ করতে ভালবাসে তা পরিত্যাগ না করা হয়, সে দাবী একেবারে অহেতুক ও মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। এই মর্মে দলীল হিসাবে কয়েকটি আয়াত ও হাদীছ উদ্ধৃত হলো:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ

হে রাসূল! বলূন, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার তোমরা মন্দাভূত হওয়াকে ভয় কর, বাড়ী-ঘর যা তোমাদের নিকট সন্তে াসজনক এগুলোই আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল ও জিহাদ ফী সাবিলিলাহর চেয়ে অধিক প্রিয়তর হয় তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহর (আযাব গযবের) নির্দেশের। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

– তাওবাহ ২৪।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلَّهِ

লোকদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ ব্যতীত শরীক ধারণ করে, তাদেরকে তারা আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবেসে থাকে কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকেই সর্বাধিক ভালবাসে। – সূরা বাকারাহ ১৬৫।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

আর যারা কাফির হয়েছে তারা সর্বনাশাগ্রস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাদের আমলগুলিকে নিস্ফল করে দিয়েছেন। এটা (কাফির হওয়া ও আমল বিনষ্ট হওয়া) এই জন্য যে, তারা আল্লাহর অবতারিত বস্তু (কুরআন ও হাদীছ) কে অপছন্দ ও ঘৃণা জেনেছে। তাই তাদের আমলগুলোকে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। – সূরা মুহাম্মাদ ৮-৯।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশী ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। – সূরা আলে-ইমরান ৩১।

হাদীছ থেকে দলীল :

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجدبهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب أليه مما سواهما' ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله' ومن كره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار (متفق عليه)

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্টর সমাহার ঘটবে সে তার মাধ্যমে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করবে। (১) যার নিকট আলাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) সর্বাধিক প্রিয়তর। (২) যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে (দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয়) শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসে। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক কুফরী থেকে মুক্তি লাভের পর আবার সেই কুফরীতে ফিরে যাওয়া এমনি ঘৃণা ও অপছন্দ করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।

– সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان (رواه أبو داود)

আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ভালবাসল আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণা করল, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দান করল, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দান করা থেকে বিরত থাকল সেই ব্যক্তি তার ঈমান পরিপূর্ণ করল। – আবু দাউদ।

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين (متفق عليه)

আনাস (রা.) থেকে বর্নিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয়তর না হই ।

– সহীহ বুখারী, মুসলিম ।

من أحيا سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى فى الجنة

যে আমার সুন্নাতকে জিন্দা করে প্রকৃতপক্ষে সেই আমাকে ভালবাসে । আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে ।

– তিরমিযী ।

৬। ইখলাছ বা বিশুদ্ধচিত্ততা: অন্তরের খুলুছিয়াতের (একনিষ্ঠতার) সাথে এই কালিমার উপর আমল করতে হবে । দুনিয়াবী কোন লোভ-লালসা বা স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নয় । বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল ময়লা থেকে কালিমা ও তার সংশ্লিষ্ট ফরয নফল ইবাদতকে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ করতে হবে । বাহ্যিক ময়লা বলতে সকল প্রকার বড় শিরক ও ছোট শিরক থেকে কালিমা ও তার দাবী অনুযায়ীকৃত আমলকে মাহফুয (সংরক্ষিত) রাখতে হবে । আভ্যন্তরীণ ময়লা বলতে লোক দেখানো ও শ্রুতি অর্জন বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আমল করা ।

আজ অনেকে বিপদ আপদে পড়লে আল্লাহ ও তার ঘর মাসজিদ বাদ দিয়ে মাযার কবরে দৌড়াচ্ছে সেখানে দু'আ করছে, সন্তান ভিক্ষা করছে, চাকুরী চাচ্ছে, পশু জবাই করছে ও মান্নত মানসা করছে, এর পরও শুধু মৌখিক لا إله إلا الله এর উচ্চারণের উপর ভরসা করে কিংবা মুসলমানের ঘরে জন্মলাভ করেছে তাই এই ধারণা করছে যে, মুসলমান রয়েই গেছি । তার এই খাঁটি শিরকী আচরণের মাধ্যমে যে لا إله إلا الله একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ইখলাছ ক্ষুন্ন করেছে এটা লক্ষই করে না ।

অথচ রাসূল (সা.) পরিস্কার ভাষায় এই শর্তটির ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন । তিনি (সা.) বলেছেন:

أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه او نفسه (رواه البخاري)

কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত (সুপারিশ) লাভের ঐ ব্যক্তির সৌভাগ্য হবে যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর ঘোষণা দিয়েছে অন্তরের খুলুছিয়াতের সাথে অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্তে। – বুখারী।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা কালিমা ও কালিমা হতে উৎসারিত সকল ইবাদতে এই শর্তটি আরোপ করেছেন।

তিনি বলেন: فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّين أَلاَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ

আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খাঁটি করত: তার ইবাদত কর। অবগত হও যে, একমাত্র আল্লাহর জনই হলো খাঁটি দ্বীন। – সূরা যুমার ২-৩।

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাছীর (র.) বলেছেন:

أى فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا يصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نظير ولهذا قال تعالى: (ألا لله الدين الخالص) اي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وجهه لا شريك له (ابن كثير 49/4)

একমাত্র আলাহর ইবাদত কর যিনি একক, শরীকহীন, আর এদিকে মানব জাতিকে ডাক এবং অবহিত কর যে, শুধু তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, তাঁর শরীক, সমকক্ষ ও সমপর্যায়ের কেউ নেই। এ জন্যই বলেছেন (ألا لله الدين الخالص) খাঁটি দ্বীন আলাহরই জন্যই। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আমলের মধ্যে শুধু ঐ আমলই গৃহীত হবে যেই আমলটিকে আমলকারী শরীকহীন সেই এক আল্লাহর জন্য করবে। – ইবনু কাছীর ৪/৪৮।

قال قتادة في قوله تعالى (ألا لله الدين الخالص) شهادة أن لا إله إلا الله - ابن كثير

বিখ্যাত তাবেঈ ও মুফাসসির ক্বতাদাহ বলেছেন যে, আল্লাহর জন্য খাঁটি দ্বীন অর্থ এই সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। – ইবনু কাছীর ৪/৪৮।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلقَيِّمَةِ

তাদেরকে (ইতিপূর্বে নবীগণকে ও তাদের উম্মতকে) শুধু এই হুকুম দেয়া হয়েছিল তারা যেন আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খাঁটি করতঃ একনিষ্ঠ ভাবে তারই ইবাদত করে এবং ছলাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। আর এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত সঠিক দ্বীন। – সূরা বাইয়্যিনাহ ৫।

৭। আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করাঃ কালিমার শর্ত সমূহের মধ্যে এটাও একটা শর্ত যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সা.) তার বান্দা ও রাসূল" এই স্বীকৃতি দেয়ার পর আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (সা.) এর যাবতীয় হুকুম আহকাম, বিধি-বিধানের ও ফায়সালার নিকট আত্মসমর্পণ করা অনিবার্য হয়ে যায়। কালিমার উচ্চারণ ও স্বীকৃতির পর যদি আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ ও ফায়সালার নিকট আত্মসমর্পণের প্রবণতা না পাওয়া যায় তবে কালিমার শর্ত ক্ষুন্ন হওয়ায় তার ক্রিয়া-ও নষ্ট হবে। তাই আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে আত্মসমর্পণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

তোমরা ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এবং আত্মসমর্পণ কর তার (বিধানের) নিকট আমার শাস্তি আসার পূর্বে। অত:পর (এসে গেলে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। – সূরা যুমার ৫৪।

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ

আর যে ব্যক্তি তার চেহারাকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করবে সৎকর্মশীল অবস্থায় ঐ ব্যক্তিই ধারণ করল শক্ত হাতল (কড়া)।

– সূরা লুকমান ২২।

বিখ্যাত তাবেঈ ইবনে আব্বাসের কৃতিছাত্র মুজাহিদ বলেছেনঃ العروة الوثقى অর্থাৎ শক্ত হাতল অর্থ এখানে ঈমান। সুদ্দী বলেছেনঃ ইসলাম।

– ইবনু কাছীর ১/১৩৯।

ইবনু কাছীর ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ থেকে العروة الوثقى এর তাফসীর "ইসলাম" বর্ণনা করেছেন। এবং এই তাফসীর স্বয়ং রাসুল (সা.) করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। – ইবনু কাছীর ১/ ৩১৯-৩২০।

আল্লাহ অন্যত্র আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের ব্যাপারে শক্তভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً

কোন ব্যাপারে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ফায়সালা করে ফেললে সে ব্যাপারে কোন মু'মিন ও মু'মিনার ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) খোঁজ করা আদৌ চলবে না। আর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে সে স্পষ্ট পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে। – আহযাব ৩৬।

অন্যত্র রাসূলের (সা.) ফায়সালা অমান্য কারীরা মু'মিন নয় দ্ব্যর্থহীন ভাবে তাগিদ যুক্ত ভাষায় পরিস্কার করে বলেছেন:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

আপনার প্রতিপালকের শপথ তারা মুমিন নয়, যারা তাদের মাঝে সংঘটিত বিবাদ-বিসংবাদে আপনাকে ফায়সালা দানকারী (বিচারক) নির্ধারণ করে দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার কৃত ফায়সালাকে শিরোধার্য ভাবে না মানে। Ñ wbmv 65|

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به (رواه فى شرح السنة) وقال النووى في الاربعين في هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনোবৃত্তি আমার আনীত বস্তু (কুরআন-হাদীছের) অনুকূলে না হয়।

ইমাম বাগাভী শারহুস সুন্নাহ কিতাবে বর্ণনা করেছেন, ইমাম নবী আরবাঈন গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল-হুজ্জা নামক কিতাবে এর সনদ সহীহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আলবানী এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। আলবানী গবেষণাকৃত মিশকাত ১/৫৯-১৬৭নং। তবে সনদ দুর্বল হলেও এর অর্থ ও মর্ম পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সমর্থিত।

৮। আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয় অস্বীকার করতে হবে:

শুধু "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই" এ কথা বলে ক্ষান্ত হলে চলবে না। বরং আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর ইবাদত করা হয় অস্বীকার করতে হবে। শুধু মৌন অস্বীকার নয় প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতে হবে।

যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের পুজা করে বা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করে যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদ, খৃষ্টান, কবর-মাযার, পীর-দরবেশ ও অলি পুজারীদের ভ্রান্তি, ভ্রষ্টতা ও আল্লাহদ্রোহিদের আল্লাহদ্রোহিতা সুস্পষ্টভাবে মানুষের নিকট তুলে ধরে তার প্রতিবাদ করতে হবে। প্রয়োজনে সামর্থ থাকলে জিহাদও করতে হবে। আল্লাহ বলেন :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

যে ব্যক্তি ত্বাগুতকে (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে) অস্বীকার করত: আলাহর উপর ঈমান আনল সেই ধারণ করলো (ইসলামের) মজবুত হাতল যা ছিন্ন হবার বা ভাঙ্গার মত নয়। – সূরা বাকারাহ ২৫৬।

ইবনু কাছীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন:

أى من خلع الأنداد والأوثان وما يدعوا إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সমকক্ষতার দাবীদার দেবতাসমূহ, এবং প্রত্যেক ঐ বস্তু শয়তান আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদতের জন্য আহবান করে তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করবে এবং এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে তিনি ব্যতীত আর কেউ প্রকৃত উপাস্য নেই, সেই ব্যক্তিই ধারণ করলো মজবুত হাতল। – ইবনু কাছীর ১/১৩৯।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই বলে ঘোষণা দিল এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করল তার জান ও মাল হারাম হয়ে গেল। তার হিসাব নিকাশ আলাহর উপর ন্যাস্ত। – মুসলিম।

نواقض الشهادتين

لا إله إلا الله محمد رسول الله

দুই সাক্ষ্যবাণী “লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”–

এর ক্রিয়া বিনষ্টকারী পাপসমূহের আলোচনাঃ

লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ। এই সাক্ষ্যদ্বয় প্রদান করলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করা যায় বা এটা হলো প্রথম ও প্রধান ক্রিয়া। প্রবেশ করে ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্য শর্ত হলো সেই সাক্ষ্যদ্বয়ের দাবী হিসাবে অনিবার্য ভাবে তাদের হুকুম পালন করতে হবে। তাদের নির্দেশ মোতাবেক যা ফরয বা ওয়াজিব বলে জানা যায় তা অবশ্যই পালন করতে হবে। উক্ত কালিমার বিরোধী কোন পাপ কাজে লিপ্ত বা জড়িত হওয়া যাবে না। অন্যথায় কালিমার ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে।

এটা সহজেই বুঝে আসার কথা যখন ইসলামে প্রবেশের দরজা পাওয়া গেল যেটা হলো উক্ত কালিমাহ। তাহলে তা থেকে বের হওয়ারও দরজা থাকবে। আর এটাই স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত কথা। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, আমাদের নিকট শুধু বক্তা ও আলিমগণ ইসলামে প্রবেশের উপায় এবং কালিমার ফযীলত ও কিছু উপকারীতা বলে ক্ষান্ত হন। ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরজাগুলি চিহ্নিত করেন না। করলেও আংশিকভাবে গবেষণাসমৃদ্ধ ভাবে নয়। অথচ প্রবেশের দরজা একটি ও বের হওয়ার দরজা অনেক।

পাঠকবৃন্দের বোঝার জন্য কথাটা আরো পরিস্কারভাবে বাস্তব উদাহরণ সহ বলছি। ধরুন একটি অপরিচিতা নারীর কথা– বিবাহের পূর্বে একজন পুরুষের জন্য তার সাথে খোলামেলা ভাবে চলাফেরা করা, তাকে নিয়ে বসবাস করা, চিত্ত বিনোদন করা এমনকি দেখাটাও ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এমনকি লোক সমাজেও এই দৃশ্য অসহনীয়। কিন্তু দু’টি সাক্ষী রেখে মুখে একটি কালিমার মাধ্যমে উপরোক্ত বাধা উঠে যায়। বরং এরপর উপরোক্ত আচরণ না করাই দোষণীয়। শুধু মুখে উচ্চারণকৃত কিছু কথার

মাধ্যমে অবস্থার এমন পরিবর্তন হলো। আবার এই নারীটিকে একটি মুখের কথা (ত্বালাক) তিন মাসে তিনবার বললে কিংবা কারো মতে (যদিও ২ নম্বরের কথা) একবারে "তিন তালাক দিলাম" বললে ঐ নারী ঠিক পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়েও শক্ত হারাম হয়ে যায়। শক্ত হারাম এই জন্য বললাম যে, পূর্বে তাকে বিবাহ করার জন্য এই শর্ত ছিল না যে, অন্য জায়গায় বিবাহের পর তালাকপ্রাপ্তা হতে হবে কিন্তু এই শর্ত ছাড়া ঐ নারীকে পুনর্বার বিবাহ জায়েয নয়।

আরো কিছু ধর্মীয় উদাহরণ:

১। নামায বা ছলাত নির্ধারিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়। এই নামায বিরোধী কিছু বিষয় রয়েছে যা ঘটলে নামায নষ্ট বা ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন ইচ্ছাকৃত কথা বলা, খাওয়া ও পান করা।

২। ওযূ: কিছু নিয়মাবলীর মাধ্যমে করতে হয়। আবার নির্দিষ্ট কিছু ভঙ্গকারী কারণ রয়েছে এর কোন একটি ঘটে গেলে ওযূ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

৩। অনুরূপভাবে রোযা, হজ্জ, উমরা, ইতিকাফ ইত্যাদি ভঙ্গের কারণ রয়েছে। যা আমরা জানি বা ইচ্ছা করলেই জেনে নিতে পারি। কারণ এ সব বিষয়ের উপর আলোচনা হয় বহু লিখা বই পুস্তকও রয়েছে। কিন্তু ইসলাম ভঙ্গের কারণের বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা ও বই পুস্তক লেখালেখি হয়নি। যার জন্য কার কি কারণে ইসলাম ভঙ্গ হয় বা হয়ে রয়েছে বা হচ্ছে তা জানার উপায় নেই।

ইদানিং এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান বিস্তার হচ্ছে। অথচ উপরোক্ত আমলসমূহ ভঙ্গের কারণের চেয়ে ইসলাম ভঙ্গের কারণ জানা বেশী প্রয়োজন। এটা অত্যন্ত যুক্তিভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত কথা যে, যে জিনিস গঠন করতে হয় তার পতন ও বিলুপ্তির সম্ভাবনা ও কারণ অবশ্যই থাকবে।

পাঠকবৃন্দ এবার আপনাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, লা ইলাহা ইলাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য দিলে যেমন ইসলামে প্রবেশ করা যায় তেমনি এমন কিছু কথা ও কাজ রয়েছে যা বললে ও করলে ইসলাম থেকে বেরিয়ে কাফির কিংবা মুশরিক হয়ে যায়। এ সকল কথা ও কাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্তই আবশ্যক। ঐ সব ব্যাপারে আল্লাহর নিকট তার ওযর কৈফিয়ত চলবে না কারণ এগুলো ইসলামের মৌলিক বিষয়ের

অন্তর্ভূক্ত। আর ইসলামের মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা মুসলিম জাতির প্রতিটি সদস্যের বা ব্যক্তিবর্গের জন্য ফরযে আইন। স্বয়ং রাসূল (সা.) বলেছেন:

طلب العلم فريضة على كل مسلم (رواه ابن ماجه والبيهقي في الشعب)

জ্ঞান লাভ করা প্রতিটি মুসমিের জন্য ফরয।

–ইবনু মাজাহ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের অমৌলিক (فروعي) ইলম শিক্ষা করা ফরযে কিফায়াহ বা যথেষ্টমূলক ফরয। এর দলীল সূরা তাওবাহর ১২২ নং আয়াত

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

কেন প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি-দল বেরিয়ে যায় না দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য। যাতে করে ফিরে এসে নিজেদের সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে– হতে পারে তারা (আল্লাহ বা জাহান্নাম সম্পর্কে) সাবধানতা অবলম্বন করবে। –তাওবাহ: ১২২।

এগুলোকে ইসলাম ও ঈমানভঙ্গকারী কারণ বলে। এ ধরণের দশটি কারণ আক্বীদাহ বিশেষজ্ঞগণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। এ সমস্ত কারণের কোন কোনটিতে একাধিক পয়েন্ট রয়েছে সেগুলোকে স্বতন্ত্র কারণ হিসাবে উল্লেখ করতে গেলে কারণগুলো দশেরও বেশী হবে। তাই তো মাক্কায় অবস্থিত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা দারুল হাদীছের সুযোগ্য শিক্ষক বিশিষ্ট আক্বীদাহবিদ আলেমে দ্বীন "শাইখ জামিল যাইনু" তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব তাওজীহাতু ইসলামীয়াহ-তে ঈমানভঙ্গের ২৬টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, শাইখ বিন বায ও অপরাপর আলিমগণ ১০টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত ১০টি কারণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

জেনে রাখুন, ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ দশটি:

প্রথম: আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ শিরকে অপরাধ ক্ষমা করেন না কিন্তু এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন ।" – সূরা নিসা : ৪৮ ।

তিনি আরো বলেন:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

অর্থ: "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকেহারাম করে দিবেন আর তার আশ্রয় স্থল হবে জাহান্নাম । আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই ।" – সূরা মায়েদাহ : ৭২ ।

শিরকের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা । যেমন জ্বিন অথবা কবরের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা ।

আল্লাহ বলেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ *

তোমার প্রতিপালকের জন্য ছলাত আদায় কর এবং কুরবাণী কর ।
– সূরাহ কাওছার – ২ ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لعن الله من ذبح لغير الله (رواه مسلم)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য পশু যবেহ করে তার প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন ।" – মুসলিম ।

সুতরাং এ পশু জবাই বা কুরবাণী যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তবে তা বড় শির্ক বলে গণ্য হবে । অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, কারো কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই শির্ক । উল্লেখিত বিষয়গুলির দলীল নিম্নরূপ:

আল্লাহ বলেন:

وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً *

"আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং তার সাথে আর কাউকে আহবান করো না। – সূরা জ্বীন: ১৮।

আল্লাহ আরো বলেন:

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُو رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً

"বলুন: শুধু আমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রার্থনা করি আর তার সাথে কাউকেও শরীক করি না। – সূরা জ্বীন ২০।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

الدعاء هو العبادة (صحيح ابو داود 1329)

দুআই হচ্ছে ইবাদত। – ছহীহ আবু দাউদ ১৩২৯।

সুতরাং দু'আ বা প্রার্থনা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট করা যাবে না।

আল্লাহ বলেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা শুধু তোমরাই ইবাদত করি এবং শুধু তোমরাই সাহায্য চাই।

–সূরা ফাতিহা : ৫।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

وإذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله (رواه احمد والترمذي)

যখন কিছু চাইবে আল্লাহর নিকট চাইবে এবং যখন সাহায্য ভিক্ষা করবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করবে।

– হাদীছটি ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

" এতো শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়, সে তেমাদেরকে ভয় দেখায় তার বন্ধুদের খবরদার তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না, আমাকে ভয় করবে যদি তোমরা মু'মিন হও"। – সূরা আলে-ইমরান : ১৭৫।

আলাহ্ বলেন:

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আর শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি মু'মিন হয়ে থাক ।
– সূরা মায়েদাহ: ২৩ ।

আল্লাহ বলেন:

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

আর তোমরা যা ব্যয় কর অথবা মান্নত কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন, আর স্বেচ্ছাচারীদের জন্য কোন সাহায্য কারী নেই । – সূরা বাকারাহ : ২৭০ ।

আল্লাহ বলেন:

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে আক্রান্ত করেন তাহলে তিনি ব্যতীত কেউ নেই তা অপসারনকারী, আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণ দানে ধন্য করেন তাহলে কেউ নেই তার অনুগ্রহ ফিরাবার । – সূরা ইউনুস: ১০৭ ।

দ্বিতীয়: যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে মাধ্যম সাব্যস্ত করল, তাদের ডাকল, সুপারিশ কামনা করল, তাদের উপর ভরসা করল সে সকলের ঐক্যমতে কুফরী করল ।

দলীল: আল্লাহ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي ٱلأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"আর তারা আল্লাহ ব্যতীত (অনেক বিষয়) এমন ব্যক্তি ও বস্তুর উপাসনা করে যারা তাদের ক্ষতিও করতে পারেনা, উপকারও করতে পারে না । তারা বলে ওরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী । বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যকার এমন সংবাদ দিতেছ যা তিনি জানেন না, আল্লাহ মহা পবিত্র এবং যার সঙ্গে শরীক স্থাপন কর তার থেকে তিনি উর্ধ্বে । – সূরা ইউনুস: ১৮ ।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

أَلاَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰ

আর যারা তাঁকে ব্যতীত অলী আউলিয়া ধারণ করেছে (এবং প্রার্থনা ও মান্নত মানসা ইত্যাদি ইবাদত সাব্যস্ত করে) তারা বলে আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে। –সূরা যুমার : ৩।

তৃতীয় : যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সে কুফরী করল।

দলীল: আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম নবীর আদর্শ সম্পর্কে বলেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَ ٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

"নিশ্চয়ই ইবরাহীম এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদের মাঝে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। যখন তাঁরা তাঁদের স্বজাতিকে বলেছিলেন: নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করে থাক তা থেকে মুক্ত, আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম। আর আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বৈরীতার সূচনা হলো যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। – সূরা মুমতাহিনা: ৪।

চতুর্থ: যে ব্যক্তি মনে করে যে, অন্যের হেদায়েত (পথ নির্দেশনা) নবীর (সা.) হেদায়েতের চেয়ে পরিপূর্ণ অথবা তার বিধান নবীর বিধানের চেয়ে উত্তম। উদাহরণ স্বরূপ যে ব্যক্তি তাগুতের বিধানকে নবীর বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে সে কাফির।

দলীল আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

"আপনি কি ওদেরকে দেখেননি যারা এ দাবী করে যে, আপনার নিকট এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে তদুপরি তারা তাগুতের নিকট বিচার কামনা করে অথচ তাদেরকে তা

অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। আর শয়তান চাই তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করতে। যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো, তখন মুনাফিকদের দেখে থাকবেন তারা আপনার থেকে চরমভাবে বিমুখ হচ্ছে। – সূরা নিসা: ৬০-৬১।

আল্লাহ আরো বলেন:

أَفَحُكْمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে আর কে উত্তম বিধান দানকারী রয়েছে। – সূরা মায়েদাহ : ৫০।

পঞ্চম: যে ব্যক্তি রাসুলের (সা.) আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করল সে কুফরী করল– যদিও সে ওটি নিজে আমল করে।

দলীল আল্লাহ বলেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে নাখোশকারী বিষয়ের অনুসরণ করেছে, এবং তাকে সন্তুষ্টকারী বিষয়কে ঘৃণা করেছে, যার ফলে তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। – সূরা মুহাম্মদ : ২৮।

ষষ্ঠ: যে ব্যক্তি রাসুলের (সা.) দ্বীনের কোন কিছুকে অথবা ছওয়াব অথবা আযাব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করল সে কুফরী করল।

এর প্রমাণ আলাহর বাণী:

قُلْ أَبِٱللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم

বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নির্দশনসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে? ওযর পেশ কর না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। – সূরা তাওবাহ ৬৫-৬৬।

সপ্তম: যাদু। এর মধ্যে রয়েছে ভেলকিবাজী এবং ভালবাসা সৃষ্টি করে বলে কথিত রিং যে ব্যক্তি এ কাজ করল অথবা এতে সন্তুষ্ট হল সে কুফরী করল।

এর প্রমাণ আলাহর বাণী:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

আর তারা কাউকে এ কথা না বলে শিখাত না যে, “আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফ্‌রী করো না।” Ñ সূরা বাক্বারাহ : ১০২।

অষ্টম ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম জাতিকে হেদায়েত করেন না।

– সূরা মায়েদাহ : ৫১।

নবম ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, কিছু লোক মুহাম্মাদের (সা.) শরীয়ত থেকে বের হতে পারে, যেমন খিযির মুসার (আ.) শরীয়ত থেকে বের হয়েছিলেন – সে কাফির।

দলীল: আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلاَمُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।

– সূরা আল-ইমরান ঃ ১৯।

অন্যত্র বলেন:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ

“যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে। – সূরা আলে-ইমরান : ৮৫।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي وبما ارسلت به إلا كان من أصحاب النار (رواه مسلم)

“রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঐ যাতের শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত রয়েছে, এই উম্মতের ইহুদী হোক আর খৃষ্টান হোক আমার সম্পর্কে শোনার পর যদি আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি

ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করে তবে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য হবে। – মুসলিম।

দশম ঃ আলাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া। দ্বীন শিখে না আমলও করে না।

এর প্রমাণ আলাহর বাণী ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

"যে ব্যক্তিকে তার প্রভূর আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে তার চেয়ে বড় যালিম কে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" – সূরা সাজদাহ : ২২।

শাইখ জামিল যাইনুর ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহঃ

(১) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ করা:

যথা নবীদের, মৃত আউলিয়াদের নিকট তাদের মৃত্যুর পর বা গায়েব অবস্থায় দু'আ করা।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ

অর্থাৎ (আর তাঁকে ছাড়া এমন কাউকে ডেক না, যে না করতে পারবে তোমার কোন উপকার আর না করতে পারবে কোন ক্ষতি। আর যদি তা কর তবে অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মুশরিকদের)।
– সূরা ইউনুস: ১০৬ ।

রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে বলেছেন:

من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار (رواه البخاري)

অর্থ:(যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যায় যে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তার সমকক্ষ জ্ঞান করে ডাকত) সেআগুনে প্রবেশ করবে (জাহান্নামে)
–বুখারী।

(২) তাওহীদের কথা শুনে যাদের মন সংকুচিত হয়ে যায় তারাই একমাত্র তাঁর নিকট দু'আ করা বা বিপদে সাহায্য চাওয়া থেকে দূরে থাকে (অথবা অপছন্দ করে)। আর প্রশস্ত করে দেয়

অন্তরকে– রাসুল (সা.) কিংবা মৃত আউলিয়ার নিকট বা জীবিত গায়েবের (অনুপস্থিত) কারও নিকট দু'আ করার সময় এবং সাহায্য চায় তাদেরই কাছে।

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকোচিত হয়ে যায় আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়।

– সূরা যুমার :৪৫।

এ আয়াত ঐ সমস্ত লোকদের জন্য প্রযোজ্য যারা ঐ সকল ব্যক্তিদের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হয় যারা একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

যেহেতু জানে যে, ওহাবীরাই মানুষকে তাওহীদের দিকে ডাকে।

(৩) রাসূল (সা.) অথবা কোন ওয়ালীর নামে যবেহ করা শির্ক।

আল্লাহ তাআলা বলেন: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ *

অর্থ তুমি তোমার প্রভূর উদ্দেশ্যে ছলাত আদায় কর আর যবেহ কর।

– সূরা কাওসার: ২।

لعن الله من ذبح لغير الله (رواه مسلم)

রাসূল (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করে। আল্লাহ তার উপর লা'নত বর্ষণ করেন। – মুসলিম।

(৪) কোন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে (নৈকট্য) লাভ ও ইবাদতের নিয়তে মান্নত করা। কারণ মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা যাবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً

হে পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে মান্নত করলাম। – সূরা আলে-ইমরান ৩৫।

(৫) নৈকট্য লাভ ও ইবাদতের নিয়তে কোন কবরের চতুর্পাশে প্রদক্ষিণ বা তওয়াফ করা । এটা শুধু কা'বা শরীফের জন্য নির্দিষ্ট ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

আর তারা যেন বেশী বেশী তাওয়াফ করে সুসংরক্ষিত গৃহের ।

– সূরা হাজ্জ ২৯ ।

(৬) আলাহ ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ

একমাত্র তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক ।

– সূরা ইউসুন ৮৪ ।

(৭) জেনে বুঝে কোন রাজা বাদশাহ বা সম্মানীত কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে ইবাদতের নিয়তে রুকু বা সিজদা করা । কেননা রুকু ও সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ইবাদত ।

(৮) ইসলামের পরিচিত ভিত্তি সমূহ হতে কোন ভিত্তিকে অস্বীকার করা ।

যথা: ছলাত, যাকাম ছওম ও হাজ্জ । অথবা ঈমানের ভিত্তি সমূহের কোন একটি ভিত্তিকে অস্বীকার করা । আর ঐগুলো হলো: আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালের উপর ঈমান আনার সাথে সাথে তাকদীরের ভাল মন্দের উপর ঈমান আনা । এগুলো ছাড়াও দ্বীনের অন্যান্য অত্যাবশকীয় কার্যসমূহ যা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত বলে সর্বজন বিদিত এমন বিষয়ের কোন একটি অস্বীকার করা ঈমান ধ্বংসের কারণ ।

(৯) ইসলামকে ঘৃণা করা, অথবা তার কোন শিক্ষাকে ঘৃণা করা চাই তা ইবাদতের ক্ষেত্রেই হউক অথবা মুআমেলাত (আদান প্রদান) বা অর্থনৈতিক কিংবা চরিত্রগত বিষয়ের ক্ষেত্রে হোক ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ

এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। – সূরা মুহাম্মাদ ৯।

(১০) ঠাট্টা বিদ্রুপ করাঃ কুরআন এর কোন অংশ অথবা হাদীছের বিশুদ্ধতা এবং তার নির্দেশনা– যার উপর বিদ্যানগণ ঐকমত্য হয়েছে কিংবা ইসলামের কোন সর্বসম্মত হুকুম আহকামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা।

আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

বলুন, তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছিলে? ছলনা করোনা তোমরা কাফের হয়ে গেছ ঈমান আনার পর। – সূরা তাওবা ৬৫-৬৬।

(১১) জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের কিংবা সর্বসম্মত বিশুদ্ধ হাদীছের কোন অংশ বা তথ্যের অস্বীকৃতি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া অপরিহায্য করে।

(১২) মহান প্রতিপালককে গালি-গালাজ বা ভর্ৎসনা করা অথবা দ্বীনকে অভিশাপ দেয়া। রাসুল (সা.)কে গালি দেয়া অথবা তাঁর কোন অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কিংবা তাঁর আনীত বিধান এর সমালোচনা করা। এই সমস্ত কার্যসমূহের কোন একটি কেউ করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

(১৩) আল্লারহ পবিত্রতম সুন্দর নাম সমূহ অথবা তাঁর অতি উত্তম গুণাবলীসমূহ বা কার্যসমূহ যা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা অজ্ঞতা এবং ভুল ব্যাখ্যা ব্যতীত অস্বীকার করা।

(১৪) সমস্ত রাসুল (সা.) এর উপর ঈমান না আনা– যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। অথবা তাদের কাউকেও তুচ্ছ ধারণা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

আমরা তাঁর রাসূলগণের কারো মাঝেই পার্থক্য করি না।

– সূরা বাকারাহ ২৮৫।

(১৫) আল্লাহ তায়ালার প্রবর্তিত বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান দ্বারা বিচার করা ঃ যদি এই ধারণা করে যে, এই যুগে ইসলামের নীতি উপযোগী নয় অথবা মানব রচিত আইনকে জায়েয মনে করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ

আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে বিধান জারি করে না, তারাই কাফির। – সূরা মায়েদাহ ৪৪।

(১৬) ইসলাম বহির্ভূত আইনে বিচার প্রার্থী হওয়া ও ইসলামী বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়া। ইসলামী বিচারে অন্তরে গভীর সংকোচ বোধ করা ও কষ্ট পাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً.

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদে বিচার ভার তোমার উপর অর্পন না করে। অত:পর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়। – সূরা নিসা ৬৫।

(১৭) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে শরঈ আইন ও বিধান প্রবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করা। ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আদর্শকে সঠিক বলে মেনে নেয়া। যথা একনায়কতন্ত্র, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ

তাদের কি এমন কিছু অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে এমন বিধান প্রণয়ণ করে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। – সূরা শুরা : ২০।

(১৮) আল্লাহ কর্তৃক বৈধকৃত বিষয়-বস্তুকে অবৈধ করা বা অবৈধকৃত বিষয়কে বৈধ করা। যেমন যেনাকে বৈধ করা অথবা সূদকে বৈধ বলা ভুল ব্যাখ্যা ব্যতীত।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا

আর আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন।
– সূরা বাকারাহ ২৭৫।

(১৯) ধ্বংসাত্মক মতবাদ এর উপর ঈমান আনা বা বিশ্বাসী হওয়া যথাঃ নাস্তিক্যবাদ, ইয়াহুদীবাদ, মাসুনীয়া, মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র। ধর্মহীনতা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ যা আরবের অমুসলিমদেরকে অনারব (আজমী) মুসলিমদের উপর প্রাধান্য দেয় (অনুরূপভাবে বর্ণবাদও)।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করবে, তবে সেটা তার থেকে গৃহীত হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে। – সূরা আলে-ইমরান ৮৫।

(২০) দ্বীনের পরিবর্তন করা এবং ইসলাম ছেড়ে অন্য কোন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ

আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায় অতঃপর কাফির অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তবে এরূপ লোকদের আমল সমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হয়ে যায়। – সূরা বাকারাহ ২১৭।

নবী (সা.) এর বাণী:

من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخاري)

যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। – বোখারী।

(২১) ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা নাস্তিকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য সহযোগীতা করা।

আল্লাহ বলেন:

لاَّ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً

মু'মিনরা যেন মু'মিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ করলে তা ভিন্ন ব্যাপার। – সূরা আল-ইমরান ২৮।

(২২) ঐ সমস্ত নাস্তিক যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে অথবা ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান যারা রাসূল (সা.) এর উপর ঈমান আনেনি তাদের কাফির না বলা। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের কাফির বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أُوْلَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ *

নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির তারা জাহান্নামের অগ্নিগর্ভে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট।
– সূরা বাইয়্যেনাহ ৬।

(২৩) কিছু কিছু সুফীবাদী বা পীরেরা ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ (সর্বেশ্বরবাদ) এর প্রবক্তা যার মর্ম হলো জগতে আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই (অর্থাৎ জগতে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ) এমনকি তাদের সর্দারদের একজন বলেছে কুকুর ও শুকর সবই আমাদের ইলাহ, মাবুদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে আরও বলেছে গীর্জার

পাদ্রী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। তাদের সর্দার মানছূর হালাজ বলেছিল, আমিই তিনি তিনিই আমি। ফলে আলেমরা তাকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তাকে হত্যা করা হয়।

(২৪) দ্বীনকে রাষ্ট্রীয় বিষয় হতে পৃথক করা, অথবা এ কথা বলা যে, ইসলামে রাজনীতি নেই। কেননা এতে কুরআন, হাদীছ এবং রাসুল (সা.) এর জীবনাদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়।

(২৫) কতক সুফীদের কথাঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া পরিচালনার চাবি কিছু কিছু আউলিয়াদের হাতে অর্পন করেছেন যাদের কুতুব বলা হয়, এ ধারণা অবশ্যই আল্লাহর কার্যাবলীর মধ্যে শিরক বলে পরিগণিত।

এটা আলাহর এ বাণীর বিপরীত:

لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ

আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠী তাঁরই (আল্লাহর) নিকট সংরক্ষিত।

– সূরা যুমার : ৬৩।

(২৬) নিশ্চয়ই এসব ইসলামভঙ্গকারী কারণসমূহ অযু ভঙ্গকারী কারণ সমূহের মত। তাই যদি কোন মুসলমান এগুলোর কোন একটিও বিশ্বাস করে কিংবা আমল করে তবে তার নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এবং উক্ত কর্মকে ত্যাগ করতে হবে। আর মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর নিকট তাওবা করতে হবে যদি তাওবা না করে তবে আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ

অর্থঃ যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। – সূরা যুমার ৬৫।

এ সব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী বা ভারত্বপূর্ণ বা ভয় প্রভাবিতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি নিরূপায় ও বাধ্য তার কথা ভিন্ন। এগুলো সবই অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সচরাচরই ঘটে

থাকে। মুসলমানদের উচিত এগুলো থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা। যে সব কাজ আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় সেগুলো থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

জ্ঞাতব্য: ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলোর মধ্যে একটি বা একাধিক কারণ কারো নিকট পাওয়া গেলেও তাকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ কাফির হওয়ার শর্তাবলী ও প্রতিবন্ধকের অনুসন্ধান না করা হবে। অন্যথায় কাফির বিধান দাতার উপরই এ বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। শর্ত ও প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো অত্র গ্রন্থের "কাফির আখ্যাদানের ফিতনাহ্ ও তার নিয়মাবলী" শিরোনামের আওতায় দেখুন পৃঃ ২৫১।

وسائل ارتكاب نواقض الإسلام

ঈমান ভঙ্গের কারণে জড়িত হওয়ার মাধ্যম সমূহ :

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহে জড়িত হওয়ার মাধ্যম চারটি।

(ক) কথার মাধ্যমে জড়িত হওয়া। بالقول

যেমন আল্লাহকে গালি দেয়া বা তার ত্রুটি বর্ণনা করা। আল্লাহর কোন ফায়সালা বা সিদ্ধান্তকে ভুল বলা।

১। আল্লাহকে গালি দেয়া বা তাকে গালি দেয়ার মাধ্যম হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থঃ আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তাহলে তারা বাড়াবাড়ি করে মুর্খতার কারণে আল্লাহকে গালি দিবে। – সূরা আন্‌আম: ১০৮।

যুগ বা সময় ও আল্লাহর কোন প্রকৃতিকে গালি দেয়া আল্লাহকে গালি দেয়ার শামিল। রাসূলুলল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى: يؤذينى ابن آدم’ يسب الدهر وأنا الدهر’ بيدى الأمر أقلب الليل والنهار’ (رواه البخاري- كتاب التوحيد ص 472/93 رقم 749-

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে যুগ বা সময়কে গালি দেয়, আর আমিই যুগ বা সময়। সকল নির্দেশ আমার হাতে রয়েছে। আমিই রাত্রি ও দিনকে পরিবর্তন করি।

–বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৯৩ পৃষ্ঠা।

২। রসূলুলাহ (সা.)কে গালি দেয়া, অথবা যে কোন নবী বা রাসূলকে গালি দেয়া।

৩। তার ফিরিশতাদেরকে গালি দেয়া। তাঁদের দায়িত্ব পালনে খামখেয়ালী করা বা ত্রুটি করার অপবাদ দেয়া।

৪। নিজে কিংবা অন্য কারো ব্যাপারে গায়েব অদৃশ্যমান বিষয় জানার দাবী করা।

৫। নিজে কিংবা অন্য কারো ব্যাপারে নবুওতের দাবী করা। কারণ মুহাম্মাদ (সা.) এর পর কোন নবী আসবে না।

৬। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা দু’আ করা। অথবা যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয় সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া ও আশ্রয় চাওয়া।

৭। আল্লাহর কোন বিধান বা তাঁর কোন কাজ, ইবাদাত, নাম ও গুণ অস্বীকার করা।

৮। গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা।

৯। কথা দ্বারা প্রকাশ করে ইসলাম ধর্ম, দ্বীন মানার কারণে কোন মুসলিম ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও সংঠনকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা।

১০। সব ধর্ম সমান মর্যাদার বলা। ধর্ম নিরপেক্ষতা, কম্যুউনিজম, পুজিবাদ, সমাজতন্ত্র, ও গণতন্ত্রের সমর্থন, প্রশংসা, গুণকীর্তন করা এবং একে প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান করা ও চেষ্টা করা।

১১। আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বা মিথ্যা বলা।

১২। আল্লাহকে অস্বীকার করা।

১৩। আল্লাহর বা তার রাসূলের ত্রুটি ধরা ও বর্ণনা করা। যেমন এরূপ বলা যে, আল্লাহ যুলুম করেন, আল্লাহ ফকীর, আল্লাহ বখীল (কৃপণ) কিছু কিছু বিষয় তিনি জানেন না, বা পারেন না।

১৪। আল্লাহ কোন কিছু ফরয করেননি।

(খ) কাজ ও আচরণের মাধ্যমে জড়িত হওয়াঃ بالفعل

১। কোন জীবিত ও মৃত ব্যক্তি, মুর্তি, শহীদ মিনার, গাছ, পাথর, অগ্নি শিখা, শিখা অনির্বাণ, কবর ও মাজারকে রুকু করা, মাথা নোয়ানো, কুর্ণিশ করা, সাজদাহ করা। অথবা হিন্দুদের মত ফুল দেয়া বা ভোগ ও ভক্তি দেয়া।

২। কুরআন ও হাদীছ অথবা কোন ধর্মীয় বিশুদ্ধ গ্রন্থ যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা লিখিত– তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অবমাননার উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারা, নিক্ষেপ করা, চাই পাক পবিত্র জায়গায় হোক চাই নাপাক জায়গায়। অথবা পদদলিত করা, আগুণ দ্বারা পোড়ানো।

৩। যাদু শেখা ও চর্চা করা বা কাউকে শিক্ষা দেয়া বা যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করা।

৪। বৈধ জেনে ও বিশ্বাস করে মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা এবং এ ব্যাপারে সমর্থন ও সহযোগীতা করা।

৫। ইসলাম ধর্ম অথবা ইসলামী বিষয়ে বা ইসলাম মানার কারণে কাউকে হেয় করা, হাত, পা, ঠোঁট, চক্ষু, ভ্রু কুঞ্চিত করে, মুখ ভ্যাংচিয়ে, থু থু ফেলা, হাতের আঙ্গুল ও পা ইত্যাদি দ্বারা ইঙ্গিত করা, বিদ্রুপ করা।

৬। যে কোন বিধর্মীকে তার ধর্ম পালনে উৎসাহিত করা ও সহযোগীতা করা।

৭। যে কোন বিধর্মীকে নিজ ধর্মের উপর অটল থাকতে দেয়া, মানবাধিকার বলে স্বীকৃতি দেয়া।

৮। ইসলামের দিকে আহবানকে সাম্প্রদায়িকতা বলা।

(গ) অন্তর ও বিশ্বাসের মাধ্যমে ঃ بالقلب

১। এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর শরীক, সহযোগী আছে।

২। জীবিত ও মৃত ব্যক্তি ও বস্তুকে অদৃশ্য থেকে উপকার অপকার করতে পারে ধারণা করা, তাকে ভয় করা, তার প্রতি আশা ভরসা রাখা।

৩। ব্যভিচার, চুরি, সুদ-ঘুষ ও মদ্যপান হালাল বিশ্বাস করা।

৪। ইসলামে নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয় বা ব্যক্তি ও বস্তু হালাল ও জায়িয বিশ্বাস করা।

৫। ইসলামে হালাল ও জায়িয বিষয় ব্যক্তি ও বস্তুকে হারাম ও অবৈধ বিশ্বাস করা।

৬। ফরয সলাত (নামায) ইসলামের ফরয নয় এমন মনে করা।

৭। এক ওয়াক্ত ছলাত ও রমাযানের একটি রোযাও ছেড়ে দেয়া চলবে এমন ধারণা করা।

৮। সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যাকাত না দিলেও চলবে মনে করা।

৯। হজ্জ না করলেও চলবে এমন ধারণা করা।

১০। নিজের বা অন্যের জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়া বৈধ মনে করা।

১১। ইসলাম ধর্ম যেমন মুসলিমদের মান্য করা অপরিহার্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য নিজ নিজ ধর্ম পালন করা বৈধ বা অধিকার আছে ধারণা করা।

১২। ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান ও উৎসাহিত করা ও তার জন্য পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করাকে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ (খারাপ অর্থে) সন্ত্রাস ইত্যাদি শব্দে আখ্যায়িত করা।

১৩। ইসলাম সম্পর্কে নুন্যতম জ্ঞান মৌলিক বিষয় সমূহ ওয়াজিব ফারায়িয, হালাল-হারাম, কবীরা গুনাহসমূহের জ্ঞান অর্জন না করে ও তদানুযায়ী আমল না করে ইসলাম ধর্ম মানার পাশাপাশি অন্য ধর্ম বা অন্য ধর্মের কিছু অংশ পালন করা বৈধ মনে করা।

১৪। মুসলিম হয়ে কোন ব্যক্তিকে পেশা ও চাকরীর অজুহাতে হলেও অন্য ধর্মে দীক্ষিত করা বা দীক্ষিত হওয়ার জন্য উৎসাহ ও সহযোগিতা করা।

১৫। কোন গায়রুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে) আল্লাহর চেয়ে বেশী ভালবাসা, ভক্তি সম্মান করা যেমন কোন ব্যক্তি, নেতা-নেত্রী, দল, ছবি, প্রতিকৃতি, জাতীয় প্রতীক, মুর্তি, শহীদ মিনার, পতাকা, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও ভুখণ্ড ইত্যাদি।

(ঘ) সন্দেহ ও সংশয়ের মাধ্যমে। الشك

যেমনঃ

১। আলাহ্‌র অস্তিত্ব আছে কি নেই, এ বিষয়ে সন্দিহান হওয়া।

২। পুনরুত্থান সত্য কি মিথ্যা, এ বলে সন্দেহ পোষণ করা।

৩। জান্নাত ও জাহান্নাম বলে কিছু আছে কি নেই সন্দেহ করা।

৪। মুহাম্মাদ (সা.) সত্যিকার নবী কি নয়?

৫। আলাহ্‌ সত্য বা সত্য নয়।

৬। নবী সত্য না সত্য নয়। তিনি সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী?

৭। মুহাম্মাদ (সা.) শেষ নবী হওয়ায় সন্দেহ পোষণ করা।

৮। মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরে নবী আসতেও পারে বলে সন্দেহ করা।

৯। মুসায়লামা, আসওয়াদ আনাসী, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ভণ্ড নবী নাও হতে পারে বা সত্য নবী হতেও পারে মনে করা।

১০। পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত, রামাযানের ছিয়াম পালন, যাকাত প্রদান, কা'বায় হজ্জ পালন ফরয বা ওয়াজিব হওয়ায় সন্দেহ পোষণ করা।

১১। ফিরিশতা ও জ্বীন জাতি বলে কোন সৃষ্টি আছে কিনা তা সন্দেহ করা ইত্যাদি।

ضابط معرفة الكفر والشرك الأكبر والأصغر

(كفر دون كفر وشرك دون شرك)

বড় কুফরী ও শির্ক এবং ছোট কুফরী ও শির্ক চেনার মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা

এবার কালিমার ক্রিয়া বিনষ্টকারী তথা ইসলাম বিনষ্ট কারী পাপগুলির উল্লেখ করার পর ছোট কুফরী ও বড় কুফরী বা ছোট শিরক ও বড় শিরক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার একান্ত প্রয়োজন মনে করছি। কারণ ঐ পাপগুলি কারো দ্বারা সংঘটিত হলে কালিমার ক্রিয়া বিনষ্ট হলো বা ইসলাম বিনষ্ট হলো এ কথার অর্থ দাড়ায় যে, সে ব্যক্তি কাফির কিংবা মুশরিক হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন আসবে কেমন কাফির, বড় কাফির না ছোট কাফির বা মুশরিক?

হাদীছে বিভিন্ন ব্যাপারে ও আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুলাহ (সা.) কাফির,জান্নাত হারাম, আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়, বা মু'মিন নয় বা ঈমান নেই ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ সকল শব্দের তাৎপর্য কি? কুফরী কি কুফরী নয়? কুফরী হলে ছোট কুফরী নাকি বড় কুফরী এ সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা আলিমরাও দিশেহারা হন। আবার অনেকে জ্ঞান না থাকার কারণে ভারসাম্যহীন ব্যাখ্যা করে থাকেন।

উপরোল্লিখিত বিষয়ে পাঠক বৃন্দের বুঝার সুবিধার্থে নবী (সা.) এর দু' চারটি হাদীছ উল্লেখ করছি:

১। سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

মুসলিম ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করা পাপাচারী ও তার সাথে লড়াই করা কুফরী। –বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ।

২। لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض (رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي و النسائي)

আমার পরে তোমরা একজন আর একজনের গর্দান মেরে (অর্থাৎ হত্যা করে) কাফিরে পরিণত হয়ো না।

– বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৩। اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن فى النسب والنياحة على الميت (اخرجه مسلم)

মানুষের মাঝে দু'টি আচরণ কুফরী, বংশের ত্রুটি বর্ণনা করা ও মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করে কাঁদা। –মুসলিম।

৪। من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام
وفي رواية ليس من رجل يدعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر (اخرجه البخاري ومسلم وابو داود)

যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী করবে তার জন্য জান্নাত হারাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে – যে কোন ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতা ব্যতীত অন্যের পুত্র দাবী করবে সে কাফির হয়ে

যাবে । – বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ।

৫ । من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك - اخرجه الترمذي وحسنه وابوداود وأحمد والحاكم وصححه على شروطها

যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর) শপথ করবে কাফির কিংবা মুশরিক হবে । – তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান বলেছেন । আবু দাউদ, আহমাদ, হাকিম, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছেন ।

৬ । إن الرقى والتمائم والتولة شرك (رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى)

ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবয, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে, আকর্ষণ-বিকর্ষণ সৃষ্টি করার মন্ত্র বিশেষ (তিওয়ালাহ) শিরক । – আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, হাকিম । বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ঐক্যমত পোষণ করেছেন ।

৭ । لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن

যিনাকারী যিনায় রত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না, চোর চুরি করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না । মদ পানকারী মদ পান করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না । – বোখারী ও মুসলিম ।

৮ । والله لا يؤمن والله لا يؤمن الذى لا يأمن جاره بوائقه (اخرجه البخاري ومسلم)

আল্লাহর শপথ ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয় যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না । – বোখারী ও মুসলিম ।

৯ । أى عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم (اخرجه مسلم)

যে ক্রীতদাস তার মালিকের নিকট থেকে পলায়ন করবে তাদের নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত সে কাফির । – মুসলিম ।

এ সমস্ত হাদীছের অর্থে নানা মনির নানা মত পরিদৃষ্ট হয় ।

মুরজিয়াহ ও খারেজীদের নিকট ঈমানের স্তর ও স্বরূপ একটি যার জন্য ঈমান কম ও বেশী হওয়ার কোন অবকাশ নেই। এমনিভাবে কুফর এর স্তর একটিই। উক্ত কথার উপর ঐক্যমত হওয়ার পর উপরোক্ত হাদীছগুলির অর্থে বিরাট মত পার্থক্য দেখা যায়। মুরজিয়াগণ ঐ সমস্ত হাদীছের শরীয়তী নির্দেশকে বাত্বিল করে দিয়ে শুধু আভিধানিক নির্দেশকে সাব্যস্ত করে থাকে।

ফলে ঐ হাদীছগুলিতে পাপের কারণে কাফির হওয়ার ক্ষেত্রে বলে থাকে রুপক কাফির (كفر مجازى) প্রকৃত কাফির (كفر حقيقى) নয়। কারণ তাদের নিকট কাফির শুধু ঐ ব্যক্তি যার সম্পূর্ণ ঈমান ধ্বংস হয়ে গেছে। উক্ত হাদীছ গুলির অর্থ হলো ঐ সকল পাপকার্য নিষিদ্ধ করা বা ঐ সকল পাপের জন্য শক্ত হুমকি প্রদান করা। ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সংবাদবাহি হিসাবে বলা হয় নাই। – যাওয়াবেতুত তাকফীর ১৮২।

পক্ষান্তরে খারেজীগণ ঐসমস্ত হাদীছের শরীয়তী নির্দেশের সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে যে কোন কাবীরাহ গুনাহের কারণে খাঁটি ও প্রকৃত কাফির হওয়ার পক্ষপাতি। ফলে উক্ত হাদীছে যে সমস্ত পাপের কারণে কাফির বলা হয়েছে সেই কাফির বলতে প্রকৃত কাফির উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিস্কৃত। – যাওয়াবিতুত তাকফীর ১৮২।

উক্তরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে খাঁটি ইসলামপন্থীদের তথা আহলুস সুন্না ওয়াল জামাআতের মত হলো মাধ্যমপন্থী।

কারণ তাঁদের নিকট দ্বীনের স্তর হলো তিনটি ইসলাম ঈমান ও ইহসান। যেমনটি হাদীছে জিবরীলে এসেছে। এই তিনটির সমন্বয় রূপকে দ্বীন বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

এই আগন্তক হলেন জিবরীল। তোমাদের নিকট এসেছিলেন (মানুষ বেশে) তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য। – ছহীহ বুখারী।

দ্বীনের তিনটি স্তরকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে, যার নিকট ইহসান অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত ও বিশুদ্ধভাবে (আল্লাহকে হাযির নাযির জ্ঞান করে সুন্দর ও বিশুদ্ধভাবে) যে ইবাদত করে তিনি মুহসিন হওয়ার ফলে মু'মিন ও মুসলিম উভয় স্তরই অর্জন করেছেন। অর্থাৎ তিনি দ্বীনের তিনটি স্তরই অর্জন

করেছেন। কারণ ইহসান সর্বোচ্চ স্তর হলে ঈমান ও ইসলাম তার অধীনে এসে যায়। এমনিভাবে যিনি মু'মিন হতে পেরেছেন তিনি মুসলিমও কিন্তু মুহসিন নাও হতে পারেন। কারণ ঈমান হলো দ্বিতীয় নম্বর স্তর। কিন্তু মুসলিম হলে মু'মিন ও মুহসিন নাও হতে পারে। এই দৃষ্টিকোন থেকেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَـٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا

পলীবাসীগণ বলেছে আমরা ঈমান এনেছি, বলুন তোমরা এখনো ঈমান আননি। বরং এ কথা বল যে, আমরা মুসলিম হয়েছি। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। –সূরা হুজুরাত ১৪।

উপরোক্ত কথার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণত: ঈমানের দু'টি স্তর আছে।

এক: ইসলাম- যেটা হলো দ্বীনের মূল বা সাধারণ ইসলাম।

দুই : বিশেষ ঈমান (বা বৈশিষ্ট মণ্ডিত ঈমান)

প্রথম স্তরের বিলুপ্তির সাথে সাথে দ্বিতীয় স্তরের বিলুপ্তি হওয়া অনিবার্য। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের বিলুপ্তির সাথে সাথে প্রথম স্তর বিলুপ্ত হওয়া অনিবার্য নয়। এমনিভাবে কুফরীরও দু'টি স্তর আছে।:

এক: বড় কুফরী যা ইসলাম থেকে বহিস্কৃত করে আর তা সেই ঈমানের বিপরীত যে ঈমানকে উপরোক্ত আয়াতে ইসলাম বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

দুই: ছোটো কুফরী (كفر دون كفر) যা ইসলাম থেকে বহিস্কৃত করে না আর তা হলো বিশেষ (বৈশিষ্ট মণ্ডিত) ঈমানের বিপরীত যা - ইসলামের স্তরের উর্ধ্বে

উপরোক্ত কথার আলোকে বলবো যে, যদি কোন হাদীসে ও আয়াতে সাধারণ ভঙ্গিতে কাউকে কুফর বিশেষণে বিশেষিত করা হয় তবে তার অর্থ সরাসরি ইসলাম হতে বহিস্কৃতকারী বড় কুফরী বলে আখ্যা দেয়া অনিবার্য নয়। এমনিভাবে ঈমান নেই বা মু'মিন নয় বললে শুধু এটা বুঝা ঠিক হবে না যে তার সম্পূর্ণ ঈমান বিলুপ্ত হয়েছে, বরং এও সম্ভাবনার অবকাশ আছে

যে, হয়ত বৈশিষ্টপূর্ণ ওয়াজিব ঈমান বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু ইসলাম বিশেষণে বিশেষিত করা হবে।

উপরোক্ত কথার আলোকে বলতে পারি– যেনাকারী যেনা (ব্যভিচার) করার সময় চোর চুরি করার সময়, মদ্যপায়ী মদ্যপানের সময় মু'মিন থাকে না অর্থ ইসলাম থেকে বহির্ভূতকারী ঈমান না থাকা নয় বরং সেই বিশেষ বৈশিষ্ট মণ্ডিত ঈমান না থাকা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সে ঐ সময় মুসলিম কিন্তু মু'মিন নয়।

এমনিভাবে গায়রুল্লাহর নামে কসম করলে মু'মিন থাকে না, কাউকে কাফির বললে দু'জনের যে কোন একজনের ঈমান থাকে না বা কাফির হয়ে যায়, পলায়নকৃত কৃতদাস ফিরে না আসা পর্যন্ত মু'মিন থাকে না বা কাফির হয়ে যায়, বংশের ক্রুটি বর্ণনা ও মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা কুফরী ..... ইত্যাদি। এ সমস্ত হাদীছে ঈমান না থাকার অর্থ ইসলাম থেকে বহির্ভূত কারী বা কাফির বলতে ইসলাম থেকে বহির্ভূতকারী বড় কুফরী নয়। বরং সেই বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত ঈমান না থাকা উদ্দেশ্য যাকে ছোট কুফরী (كفر دون كفر) বলা যেতে পারে।

ضوابط معرفة الكفر والشرك الأصغر من الأكبر

বড় কুফর ও শিরক এবং ছোট কুফর ও শিরক চেনার পন্থা:

বড় কুফর ও শিরক যা ইসলাম ধর্ম থেকে বহিস্কার কারী তা মূল দ্বীন তথা আলাহর একত্ব ও মৌলিক শরীয়তের পরিপন্থী। কিন্তু ছোট কুফর ও শিরক এবং বৈশিষ্টপূর্ণ ঈমানের ঘাটতি হচ্ছে উপরোক্ত প্রকারের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ভুক্ত যার মাধ্যমে মুল দ্বীন ধ্বংস হয় না। আবার ঐ পর্যায়েরও পাপের অন্তর্ভূক্ত নয় যা সহজেই (বিভিন্ন সৎ আমলের প্রভাবে) ক্ষমা হয়ে যায়।

পন্থা ১: দলীলেই উল্লেখ থাকা যে এটি ছোট শিরক বা বড় শিরক। এটিই হলো সবচেয়ে মজবুত প্রমাণ সাপেক্ষে স্পষ্ট পন্থা। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر' قالوا يا رسول الله ' ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء - رواه أحمد' وحسن اسناده ابن حجر عسقلانى في بلوغ المرام

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে যে বিষয়টির ভয় বেশী করি তাহচ্ছে ছোট শিরক। তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন: লোক দেখানো আমল।

– ইমাম আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু হাজার আসকালানী বুলুগুল মারাম গ্রন্থে এর সনদকে হাসান বলেছেন।

পন্থা ২: স্পষ্ট দলীল দ্বারা যে সকল বিষয় শিরক বলে সাব্যস্ত হয়েছে, অথচ অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তা ইসলামী মিল্লাত থেকে বহিস্কারকারী নয় তাহলে তা ছোট শিরক বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি দ্বীন থেকে বহিস্কারকারী সাব্যস্ত হয় তবে তা হবে বড় শিরক। অনুরূপভাবে স্পষ্ট দলীল দ্বারা যে সকল বিষয় কুফর বলে সাব্যস্ত হয়েছে অথচ অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তা দ্বীন থেকে বহিস্কারকারী নয় তাহলে তা হবে ছোট কুফর। কিন্তু যদি দ্বীন থেকে বহিস্কারকারী দলীল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তা হবে বড় কুফর।

উদাহরণ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

"মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া পাপাচারী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।"

অপর হাদীছে এসেছে, নবী (সা.) বলেছেন:

لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

তোমরা একে অপরকে হত্যা করে কাফির অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হয়ো না।

উপরোক্ত হাদীছ দু'টির মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে, মু'মিন ব্যক্তির সাথে লড়াই করা বা তাকে হত্যা করা কুফর। কিন্তু সুরা হুজুরাতের ৯ নং আয়াত দ্বারা বুঝা যায় এটা এমন কুফর যা দ্বীনের গণ্ডি থেকে বের করে না। অতএব উক্ত কুফর বলতে ছোট কুফরী উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا۟ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ

যদি মু'মিন সম্প্রদায়ের দু'টি দল লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তবে তোমরা উভয় দলের মাঝে আপোষ মিমাংসা করে দাও। যদি একদল অপরদলের

উপর বাড়াবাড়ি করে তবে তোমরা বাড়াবাড়ীকারী দলটির সাথে ঐ পর্যন্ত লড়াই কর যে পর্যন্ত সে আল্লাহর নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে ।

–সূরা হুজুরাত -৯ ।

অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত হাদীছে উল্লেখিত কুফর বলতে ঐ কুফর উদ্দেশ্য নয় যা ইসলাম থেকে বহিস্কার করে । বরং এ কুফর বলতে ছোট কুফর উদ্দেশ্য । যার সাথে ঈমান বিদ্যমান থাকে । কারণ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত দল দু'টিকে ঈমানদারদের দল বলে উল্লেখ করেছেন ।

অনুরূপ পর্যায়ের কুফর হল রাসূল (সা.)এর এ হাদীছে উল্লেখিত কুফর: নবী (সা.) বলেছেন:

من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما' وفى رواية: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما (رواه البخارى ومسلم والترمذى وابوداود)

যে ব্যক্তি তার ভাইকে– এই কাফির বলে সম্বোধন করে তাহলে এ কথা দুজনের যে কোন একজনের উপর বর্তাবে । অন্য বর্ণনায় এসেছে: এক ব্যাক্তি যদি তার ভাইকে কাফির বলে আখ্যা দেয় তবে একথা তাদের দুজনের যে কোন একজনের উপর বর্তাবে ।

–এ হাদীছটি বুখারী মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ এ হাদীছের অর্থ এভারে করেছেন যে, কাফির বলা কালে সম্বোধনকৃত ব্যক্তিকে তার ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং নবী (সা.) বলেছেন উক্ত কথা দু'জনের যে কোন একজনের উপর বর্তাবে । যদি কাফির বলার কারণে সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হত তাহলে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় থাকত না । –যাওয়াবিতুত তাকফীর ৯৬ পৃষ্ঠা ।

পন্থা: ৩ : এমনিভাবে ব্যভিচারী ও চোর সম্পর্কেও বলা হবে । ব্যভিচার ও চুরির সময় তার ঈমান না থাকার অর্থ তারা কাফির মুশরিক নয় । কারণ তাদের ব্যভিচার ও চুরি সাব্যস্ত হওয়ার পর মু'মিন গণ্য করে তাদের প্রতি ব্যভিচার ও চুরির শাস্তি (বেত্রাঘাত বা রজম ও হাত কাটা) কায়েম করা হয় । মুরতাদ বা ধর্মচ্যুত হওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় না ।

পন্থা-৪: কুফর ও শিরক বলতে ছোট কুফর ও ছোট শিরক উদ্দেশ্য হয় যদি তা نكرة অর্থ ر "র" অক্ষর তানভীন যুক্ত হয় । যেমন: كفرٍ' كفرًا' كفرٌ আর যদি শব্দটি معرف باللام আলিফ লাম যুক্ত হয় যেমন الكفر ও الشرك

তাহলে এই কুফর বলার উদ্দেশ্য বড় কুফর ও বড় শিরক যা ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেয়। যেমন : নবী (সা.) এর বাণী:

بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (رواه مسلم والترمذى وأبوداود)

একজন মুসলিম ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফর এর মাঝে পার্থক্য হলো ছলাত। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ।

অত্র হাদীছে আলিফ লাম দ্বারা الكفر ও الشرك আল-কুফর ও আশ্-শিরক শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হওয়ায় ছলাত পরিত্যাগ কারীকে গবেষক হাক্কানী আলিমগণ কাফির ও ইসলাম থেকে বহিস্কৃত বলেছেন।

এ নির্দেশনার সমর্থনযোগায় অপর আরেকটি হাদীছ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (رواه الترمذي والنسائى)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমাদের মাঝে ও তাদের (কাফির ও মুশরিকদের) মাঝে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হলো ছলাত। অতএব যে ব্যক্তি ছলাত পরিত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

– হাদীছটি তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু উপরোল্লিখিত হাদীছে ছলাতকে কাফির ও মুসলিমের মাঝে সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে, অতএব তা ছেড়ে দেয়া নিশ্চয়ই বড় কুফরীই হবে।

পন্থা-৫: অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে এবং নিয়ত ও উদ্দেশ্য সাপেক্ষে ছোট কুফর ও ছোট শিরক এবং বড় কুফর ও বড় শিরক হয়।

যেমন:

১– রিয়া (الرياء) বা লোক দেখানো আমল: কোন আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে শুরু করার পর যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্য জড়িত হয় তাহলে এটা হবে শিরক আছগার। কিন্তু যদি আমলকারী আমলটি কেবল মাত্র লোক দেখানো উদ্দেশ্যেই করে তা হবে বড় শিরক বা বড় মুনাফিক্বী যার জন্য সে ইসলাম থেকে বহির্ভূত ও খারিজ হয়ে যাবে।

২– তাবিজ কবচ: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

من تعلق تميمة فقد أشرك (رواه الحاكم وصححه الألبانى في صحيحه 4929)

যে ব্যক্তি গায়ে তাবিজ ধারণ করে সে শিরক করে। – হাদীছটি আহমাদ বর্ণনা করছেন এবং আল্লামা আলবানী ছহীহ প্রমাণ করেছেন (wmt mnxnvn nv`xQ bs 492)|

কেউ যদি এ আক্বীদাহ বা বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাবিজের শক্তি ও ক্ষমতা আছে বিপদ ঠেকানোর, কল্যাণ আহরণের অত:পর আল্লাহর প্রতি ভরসা না করে তাবিজের উপর ভরসা করে তাহলে তা বড় শিরক হবে। আল্লাহর প্রতি ভরসা না করে তাবিজের উপর ভরসা রাখার নিদর্শন হলো তাবিজ ধারণ কারীর আলাহর ইবাদত না করা, তাঁর শরণাপন্ন না হওয়া এবং তার নিকট দু'আ প্রার্থনা না করা। আর যদি তাবিজধারণকারী আলাহর প্রতি ভরসা করে কিন্তু তাবিজকে অসীলা বা মাধ্যম মনে করে তবে তা হবে ছোট শিরক। অসীলাহ মনে করলেও ছোট শিরক এই জন্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একে শিরক বলেছেন।

অসীলা দু'প্রকার। (১) শিরক বিহীন বৈধ অসীলাহ যেমন দু'আ কালাম পাঠ ও তা দ্বারা ঝাড় ফুক করা এবং ঔষধ সেবন ও প্রয়োগ করা। এ ধরণের অসীলা গ্রহণ করা এ জন্য বৈধ যে, নবী (সা.) থেকেও এ সবের অনুমতি এসেছে। (২) অবৈধ ও শিরকী অসীলা: যেমন মদ বা যে কোন হারাম বস্তুর অসীলা গ্রহণ। কেননা রাসূল তা হারাম করেছেন। তাবিজ, চুড়ি, রিং, বালা, আংটি ও সুতা ইত্যাদির অসীলাহ গ্রহণ। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সবকে শিরক বলেছেন।

৩– গায়রুল্লাহর নামে শপথ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (رواه الترمذي 1535 ' وابوداود 2351'
وصححه الالبانى فى الجامع الصغير 6080)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শপথ করে সে ব্যক্তি কুফরী বা শিরক করে। –হাদীছটি তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী ছহীহ প্রমাণ করেছেন ছহীহুল জামি' হাদীছ নং ৬০৮০।

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর শপথ অপেক্ষা অন্য কিছু যেমন সন্তান, পিতা-মাতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির শপথ কে বেশী বড় বা আস্থাপূর্ণ মনে করে তবে তা হবে বড় শিরক। কিন্তু যদি তা মনে না করে তবে তা হবে ছোট শিরক।

৪। আল্লাহর সাথে সমকক্ষতা জ্ঞাপক ভাষা ও বাক্য সমূহ। যেমন:

(ক) ما شاء الله وشئت আল্লাহ যা চেয়েছেন ও আপনি।

(খ) هذا من الله ومنك

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ও আপনার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত।

(গ) أنا بالله وبك

আমি আল্লাহর কারণে ও আপনার কারণে (টিকে বা বেঁচে) আছি।

(ঘ)مالي إلا الله وأنت আল্লাহ ও আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

(ঙ) أنا متوكل على الله وعليك

আমি আলাহ্র ও আপনার উপর ভরসা করি।

(চ) لو لا أنت لم يكن كذا وكذا

আপনি না থাকলে আমার এই এই কাজ হতো না।

(ছ) الله فى السماء وانت فى الأرض

আমার জন্য আল্লাহ আসমানে ও যমীনে আপনি রয়েছেন।

এ সমস্ত বাক্য ব্যবহার কারী যদি সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমপর্যায় মনে করে তবে বড় শিরক হবে। কিন্তু যদি সৃষ্টিকে কেবল মাধ্যম বা অসীলা মনে করে তবে ছোট শিরক হবে। আর সৃষ্টিকে অসীলা মনে করে বাক্যের শব্দ ও ভঙ্গি পরিবর্তন করে বললে কোন প্রকার শিরক হবে না।[৭]

যেমন: ما شاء الله ثم شئت

আল্লাহ যা চেয়েছেন অত:পর আপনি চেয়েছেন। দলীল:

عن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا (ما شاء الله وشاء فلان) ولكن قولوا (ماشاء الله ثم شاء فلان) (رواه أبو داود بسند صحيح (4980

---

[7] নোট: (১) টীকা: বাক্যের ভিতর যে واو অক্ষর রয়েছে তার পরিবর্তে ثم ব্যবহার করলে বাক্যটি শিরকমুক্ত হয়ে যাবে। কারণ واو অক্ষর যা সম্বন্ধসূচক অব্যয় এর অর্থ "ও" এটি তার পূর্ব ও পরের দু'জনকে সমান বুঝায় অথচ সৃষ্টি ও স্রষ্টা সমান নয়। কিন্তু ثم অব্যয়টি যার অর্থ উভয়ের মাঝে ব্যবধানসহ সম্বন্ধসূচক শব্দ, যার অর্থ অতঃপর। সুতরাং এর দ্বারা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সমতা বুঝায় না। –ফাতহুল মাজীদ ৬০২পৃষ্ঠা।

হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন: তোমরা ما شاء الله وشاء فلان আল্লাহ যা চেয়েছেন ও অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে (তাই হয়েছে) এরূপ বলো না। তবে এমনটি বলতে পার ما شاء الله ثم شاء فلان আলাহ্ যা চেয়েছেন অত:পর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে। হাদীছটি আবু দাউদ ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। – সিলসিলাহ ছাহীহাহ হাদীছ নং ৪৯৮০।

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) উপরোক্ত বাক্যগুলি সম্পর্কে বলেন:

وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده (من مدارج السالكين ضوابط التكفير (194

এ কথাগুলো কখনো কখনো প্রবক্তা অনুসারে ও তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বড় শিরকও হতে পারে। Ñ gv`vwiRym mv‡jKxb Gi nvIqvjvq hvIqvweZzZ ZvKdxi 194|

৬। যে সব শিরককে সাহাবায়ে কিরাম ছোট শিরক বলে বুঝেছেন, তা ছোট শিরক বলেই গণ্য হবে।

নবী (সা.) বলেছেন:

الطيرة شرك’ وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل (رواه أحمد وابوداود 3910’ والترمذى 1614’ وابن ماجة 3538)

পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা শিরক, ইবনু মাসউদ (রা.) বলেছেন: আমাদের এমন অনুভূতিকে আল্লাহ তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে দূর করে দিতেন।
–হাদীছটি আহমাদ, আবু দাউদ (হাদীছ নং ৩৯১০) তিরমিযী (হাদীছ নং ১৬১৪) ইবনে মাজাহ (হাদীছ নং ৩৫৩৮) বর্ণনা করেছেন।

فتنة التكفير وضوابطه

কাফির আখ্যা দানের ফিতনাহ ও তার নিয়মাবলী

কাফির আখ্যা দানের বিধান:

কারো নিকট ইসলাম ভঙ্গের কারণ বা কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, মুরতাদ হওয়ার কারণ পাওয়া গেলেই তাকে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক্ব ও মুরতাদ বলা যাবে না, বরং উল্লেখিত গুণাবলী প্রযোজ্য হওয়ার জন্য তার

বিভিন্ন অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। বিনা পর্যালোচনায় কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও মুরতাদ বলা যাবে না? অন্যথায় নিজেই তার অধিকারী হবে।

أولا : أدلة التحذير من الكتاب

প্রথমত: কাফির আখ্যা দান বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার সতর্ক বাণী ঃ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম প্রদান করে তাকে বলো না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা পার্থিব সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুত: আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও এমনি ছিলে ইতিপূর্বে: অত:পর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন। – সূরা নিসা ঃ ৯৪।

عن ابن عباس، قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ...}. إلى آخرها، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح' تفسير ابن كثير 704/1-

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বণী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি ছাগল পাল চরাতে চরাতে নবী (সা.) এর একটি সাহাবী দলের (যারা সম্ভবত: যুদ্ধের সফরে ছিলেন) পাশ দিয়ে অতিক্রম করা কালে তাদেরকে লক্ষ্য করে সালাম প্রদান করল। তারা ধারণা করে বললেন: এ লোক কেবল আমাদের থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সালাম দিয়েছে। এ বলে তারা তাকে হত্যা করলেন এবং তার ছাগলগুলো গণিমতের মাল হিসাবে নবী (সা.)এর নিকট উপস্থিত করলেন। অত:পর আয়াতটি নাযিল হয়।

– হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান ছহীহ বলেছেন (তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৭০৪ পৃষ্ঠা)।

ثانيا : أدلة التحذير من السنة

দ্বিতীয়তঃ কাফির আখ্যা দান বিষয়ে নবী (সা.) এর সতর্কবাণী ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما (أخرجه البخاري: (6103و6104)

যে কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করলে, তার এ বাক্য তাকে সহ দুজনের একজনের দিকে ফিরে আসবে।

– বুখারী, ৬১০৩,৬১০৪।

তিনি আরো বলেন ঃ أيما رجل كفر رجلا فأحدهما كافر -

যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিলে তাদের দু'জনের যে কোন একজন কাফির হিসাবে গণ্য হবে।"

– ইমাম আহমাদ, সহীহ সনদে (২/৩৩,৪৭, ৬০,১০৫) বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরো বলেছেন :

إذا قال الرجل لصاحبه: يا كافر ' فإنها تجب على أحدهما ' فإن كان الذي قيل له كافرا فهو كافر ' وإلا رجع إليه ما قال

যদি কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এই কাফির। তাহলে তার এ উক্তি তাদের দু'জনের উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। যাকে কাফির বলা হয়েছে সত্যই যদি সে কফির হয় তাহলে সে কাফির। অন্যথায় কাফির বলে সম্বোধনকারীই কাফির হয়ে যাবে। – আহমাদ (২/৪৪,৪৭,৬০,১০৫)।

তিনি আরো বলেন :

لا يرمي رجل بفسوق ' ولا يرميه بالكفر ' إلا ارتدت عليه ' إن لم يكن صاحبه كذلك -

আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত তিনি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছেন: কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পাপাচারী ও কাফির বলে সম্বোধন করে আর যদি সম্বোধনকৃত ব্যক্তি সেরূপ না হয় তাহলে তার এ উক্তি তার (সম্বোধনকারীর) দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। – বুখারী, ৬০৪৫।

উপরোক্ত হাদীছগুলোতে নবী (সা.) মুসলিমদেরকে কাফির প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান করেছেন। কারণ কাফির হয়ে যাবে এমন কোন কাজ না করলে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া না জায়েয।

ثالثا : ظاهرة التكفير وبعض دواعيه

তৃতীয়তঃ কাফির আখ্যা দানের প্রবণতা ও কতিপয় কারণ :

শাইখ আবু আনাস আলী ইবনে হুসাইন আবু লূয বলেন:

لقد انتشر في هذا الزمان إطلاق الكفر واللعن والتفسيق على المسلمين بدون ضوابط شرعية وبدون فقه وتثبة' وهذا لا شك أمر خطير جدا' فلا يجوز تكفير المسلم بمجرد وقوعه في خطأ أو معصية ولو كانت هذه المعصية من الكبائر ما لم يستحل ذلك – (مقدمة فتنة التكفير: 6)

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান যুগে মুসলমানদেরকে অভিশাপ দেয়ার এবং কাফির আখ্যা দানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতিমালা ও জ্ঞান চর্চার কোন পরোওয়া করা হচ্ছে না। নিসঃসন্দেহে বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক কোন প্রকার গুনাহ সংঘটিত হওয়ার কারণে (হালালকে হারাম না জানলে) তাকে কাফির সম্বোধন করা যায় না। যদিও তার অপরাধ বা গুনাহটি কবীরাহ গুনাহর অন্তর্ভূক্ত হয়।

– ফিৎনাতুত তাকফীর গ্রন্থের ভূমিকা : ৬।

শাইখ আলবানী বলেন ঃ

إن مسألة التكفير ليس فقط للحكام' بل وللمحكومين أيضا هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج- منها فرقة لا تزال موجودة الآن باسم آخر وهي: (الاباضية)........

শুধুমাত্র সরকার প্রধানদেরকে নয় বরং সাধারণ মুসলমানদেরকেও কাফির আখ্যাদানের বিষয়টি একটি অতি পুরাতন ফিতনা, ইসলামের মধ্যে খারেজী নামের একটি দল এরূপ ফিতনার আবির্ভাব ঘটায়। বর্তমান যুগেও বিভিন্ন নামে তাদের অনুসারী রয়েছে তাদের একটি দল হচ্ছে " ইবাযিয়া"। এমনকি তারা মাসজিদের ইমাম, খাতীব, মুয়াযযিন ও খাদিমদেরকে কাফির আখ্যা দিচ্ছে। তাদেরকে যদি বলা হয় এদেরকে সহ বিভিন্ন মাদরাসা ও

ইসলামী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে কি অপরাধের জন্য কাফির আখ্যা দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বলেঃ তাদেরকেও কাফির আখ্যা দেয়া হচ্ছে এ কারণে যে, তারা সেই সব সরকারের হুকুমে সন্তুষ্ট যারা আল্লাহর বিধান ছেড়ে অন্য কিছুর দ্বারা ফায়সালা করছে। Ñ kvBL Avjevbx iwPZ MÖš' Ò wdZbvZzZ ZvKdxiÓ 12 I 22|

তিনি বলেন :

فإن استحل ذلك فإنه يحكم بكفره' فإن زنى أو سرق أو شرب الخمر فلا يقال بأنه كافر

কোন ব্যক্তি জেনে শুনে গুনাহর কাজকে হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি যেনা করে অথবা চুরি করে অথবা মদ্যপান করে তবুও তাকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এসব হারাম কর্মকে হালাল মনে না করবে। তবে এ সব গুনাহে জড়িত হওয়ার কারণে তাকে ফাসিক বলা যাবে। – ফিতনাতুত তাকফীর গ্রন্থের ভূমিকা : ৬।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এমন দলীল প্রমাণ পেয়ে যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) যেসব বস্তুকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন সে সবকে হারাম হিসাবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না তখন তাদেরকে কাফির ও মুরতাদ হিসাবে হুকুম লাগানো যাবে।

কোন ব্যক্তি যদি মনে প্রাণে হারামকে হালাল হিসাবে গণ্য করে অথচ আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে কাফির হিসাবে হুকুম লাগানোর কোন উপায় নেই। কারণ এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) এর বাণীতে বর্ণিত শাস্তির আওতায় পড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما -

“ যে কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করলে, তার এ বাক্য তাকে সহ দুজনের একজনের দিকে ফিরে আসবে।”

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই সাহাবীর প্রসংস উল্লেখ করতে পারি যিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। যখন এক মুশরিক দেখল যে, সে এ মুসলিম সাহাবীর তরবারীর আওতায় পড়ে গেছে তখন সে বলে ফেলল আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই। সাহাবী তার এ কথার দিকে কর্ণপাত না করে বেপরওয়া ভাবে তাকে হত্যা করে ফেলল। যখন এ সংবাদ রাসূল (সা.) এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি কঠোর ভাষায়

নিন্দা জ্ঞাপন করলেন। সে সাহাবী যুক্তি পেশ করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! সে তো হত্যার ভয়ে তা বলেছে। তখন রাসূল (সা.) বললেন, (তুমি কি তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেখেছ?!)

এ থেকে বুঝা গেল যে, বিশ্বাসগত কুফরের আমলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বরং তার সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। আমরা ফাসিক, ফাজির, ব্যভিচারী, চোর ও সূদখোরের অন্তরে কি আছে তা জানতে সক্ষম নই। অতএব এসব পাপের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিতে পারি না। – ফিতনাতুত তাকফীর : ২৬।

এ প্রসঙ্গে আমরা এখানে একটি হাদীছ উল্লেখ করতে পারি। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

(من بدل دينه فاقتلوه) أخرجه البخاري برقم (3017) من حديث ابن عباس رضي الله عنه -

যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে তোমরা তাকে হত্যা কর।" –হাদীছটি ইমাম বোখারী (৩০১৭) ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

অতএব যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগ না করবে তাকে হত্যা করা হারাম। তবে ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী হিসাবে তাকে গণ্য করা যাবে এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া গেলে সেটা ভিন্ন কথা।

শাইখ আলবানীর দৃষ্টিতে কুফর আখ্যাদানের দু'টি কারণ ঃ

১। ইসলামী বিষয়ে অজ্ঞতা ও দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতা।

২। সঠিক ইসলামী দাওয়াতের মূলনীতি ও শারঈ নীতিমালা সঠিক ভাবে না বুঝা। –শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ " ফিতনাতুত তাকফীর" ১৩।

আল্লামা ইবনু উছাইমীন আরেকটি কারণ সংযোজন করেছেন। সেটি হচ্ছে:

৩। অসৎ উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে অসৎ বুঝের অধিকারী হওয়া। – ফিতনাতুত তাকফীর:২০।

رابعا: بعض أدلة التكفير يين والرد عليها

চতুর্থত ঃ কাফির আখ্যা দানের পক্ষের দলীল ও তার খণ্ডন ঃ

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কর্তৃক সরকার বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে কাফির আখ্যাদানের মূলে যে দলীলটি দেয়া হয় সেটি হচ্ছে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীঃ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়সালা করবে না তারাই কাফির।" – সূরা মায়েদাহ : ৪৪।

অথচ আমরা জানি যে, আয়াতটির শেষ অংশের শাব্দিক ভিন্নতার সাথে আরো দু'টি বিধান উল্লেখ করা হয়েছে:

الظالمون আয-যালিমুন (আয়াত ৪৫) ও الفاسقون আল-ফাসিকুন (আয়াত ৪৭)। সেই চরমপন্থী দলের অনুসারীরা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে শুধুমাত্র ১ম আয়াতটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে (فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ) এবং এ আয়াত দ্বারা সরকারের আনুগত্য থেকে বের হওয়া যাবে– এমতকে বৈধতা প্রদান করেছে। তাদের আক্বীদাহ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা ফায়সালা না করে সে কুফরী করল। তার মাঝে ও ইসলাম বহির্ভূত ইয়াহুদ, খৃষ্টান সহ অন্যান্য মুশরিকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।
– ফিতনাতুত তাকফীর : ১৭।

উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ ঃ

উক্ত আয়াতে যে, বলা হয়েছে "তারাই কাফির" এ কুফর দ্বারা আসলে কি বুঝানো হয়েছে? এর দ্বারা কি সেই কুফরকে বুঝানো হয়েছে যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়? নাকি অন্য কিছু?

কারণ কখনও কখনও কুফর দ্বারা আমলের ক্ষেত্রে কুফরকে (কুফরে আমালী) বুঝানো হয়ে থাকে। যা ইসলাম থেকে বের করে না। কিন্তু ই"তিক্বাদী (বিশ্বাসগত) কুফর ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীরে এসেছে।

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله:(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ) قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به فهو ظالم فاسق (انظر ابن كثير 86/85)

আলী বিন ত্বালহাহ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর বাণীঃ যারা আলাহর অবতীর্ণ করা বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা শাসন করে তারা কাফির" এর মর্ম হচ্ছে যারা আলাহর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার বশত: বর্জন করে তারা কাফির। কিন্তু আল্লাহর বিধানকে যথাযোগ্য স্বীকার করার পর যদি তা দ্বারা শাসন না করে তবে যালিম ও ফাসিক্ব।

– তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৮৫/৮৬।

অপর এক বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ

(ليس الكفر الذي تذهبون إليه' إنه ليس كفرا ينقل عن الملة' هو كفر دون كفر)

তোমরা এ কুফর দ্বারা যে অর্থ বুঝাতে চাচ্ছ তা নয়। এটি এমন কুফর নয় যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। বরং এ কুফর দ্বারা বড় কুফরের নিম্ন পর্যায়ের কুফরকে বুঝানো হয়েছে। –ইমাম হাকিম এটিকে "আল-মুসতাদরাক" ২/২১২ বর্ণনা করে বলেছেন: আছারটি শাইখাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ, ইমাম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনু কাছীর তার তাফসীর গ্রন্থে ইবনু আবী হাতিম সূত্রে আছারটির প্রথম বাক্যটি উল্লেখ করে বলেছেন : এর সনদ হাসান।

ইবনু আব্বাস (রা.) যাদেরকে সম্বোধন করে কথাটি বলেন সম্ভবত তারা সেই খারেজী সম্প্রদায় যারা আলী (রা.) এর নেতৃত্ব হতে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরিণতিতে তারা মু'মিনদের রক্ত প্রবাহিত করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে এমন কিছু ঘটিয়েছিল যা তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে করেনি। অথচ বিষয়টি সেরূপ নয় যেরূপ তারা ধারণা করেছিল। বরং এটি সেই কুফর যে কুফর দ্বারা কেউ ইসলাম থেকে বের হয় না। – ফিতনাতুত তাকফীর : ১৯।

ইবনু আব্বাস (রা.)–এর মতের স্বপক্ষে কতিপয় হাদীছ ও আয়াত

শাইখ ইবনু উছায়মীন (র.) বলেন: শাইখ আলবানী সহ আরো অনেক আলেম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত এ আছারটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীছের মধ্যে এর সত্যতার প্রমাণ মিলে। নবী (সা.) বলেছেন ঃ

(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) رواه البخاري ومسلم

কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা হচ্ছে কুফরী। – বুখারী ঃ ৪৮, মুসলিম ঃ ৬৪, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) হতে এ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

সকল সালাফদের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত এই যে, কোন মুসলিমকে হত্যাকারীর কুফরী এমন কুফরী নয় যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما -

মুমিনদের দু'টি দল যদি লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দিবে ...।

কিন্তু আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছারটিকে যারা পছন্দ করে না তারা বলে যে, এ আছারটি গ্রহণযোগ্য নয়, ইবনু আব্বাস (রা.) হতে সহীহ ভাবে বর্ণিত হয়নি।

خامسا: كشف شبهات أدلة التكفير وضوابطه

পঞ্চমত ঃ কুফর প্রতিপন্ন করার দলীলের সংশয় নিরসন ও তাকফীরের নিয়মাবলী ঃ

কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন পাপকর্ম বা কবীরাহ গুনাহে জড়িত হওয়ার কারণে কাফের হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও বিদিত স্পষ্ট কোন রুকন ও ফরয অস্বীকার না করে। যেমন : নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। অথবা কোন স্পষ্ট বিদিত গুনাহর কাজকে হালাল মনে না করে। যেমনঃ আল্লাহকে গালি দেয়া, রাসূলকে গালি দেয়া, কুরআনকে পদদলিত করা ও অবমাননার জন্য পুড়িয়ে ফেলা, ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, প্রতারণা ও মিথ্যা বলাকে বৈধ জানা ইত্যাদি।

কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় ইসলামের প্রতি অতি উৎসাহী কিছু যুব সমাজ বিভিন্ন পাপকর্মের কারণে অপর মুসলিম ও গোষ্ঠিকে কাফির বলে থাকে। বিশেষভাবে দেশের শাসকগোষ্ঠীকে – কুরআনের বিধান দ্বারা শাসন না করার কারণে তাদেরকে কাফির মনে করে। এবং এ ক্ষেত্রে তারা কুরআনের সূরা মায়েদার ৪৪-৪৫ ও ৪৭ আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে।

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ *

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ

আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন করবে না তারা কাফের ... তারা জালেম... তারা ফাসেক। (এই আয়াতের অর্থ ও বিশদ ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

উল্লেখ্য যে, কুরআনের বিধান দ্বারা শাসন না করার কারণে শাসকগোষ্ঠীকে কাফের মনে করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে অনিবার্য মনে করে এবং দেশে বর্তমান প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য জঙ্গী তৎপরতা চালিয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত আয়াত কেন্দ্রীক তাদের বুঝ ব্যবস্থা ও সে বুঝ অনুযায়ী পরিচালিত জঙ্গী তৎপরতার মূলে রয়েছে মুর্খতা ও অজ্ঞতা। তার কারণ কুফরী কাজ করার পরও কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফির প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলী তার ভিতর না পাওয়া যাবে এবং অন্তরায় সমূহের বিলুপ্তির প্রমাণিত না হবে।

سادسا : شروط التكفير وموانعه

ষষ্ঠত: কাফির বিধান প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলী ঃ

১। العلم – مانعه الجهل والشبهة জ্ঞান থাকা ঃ

যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হচ্ছে সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন হাদীছের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান না থাকে তাহলে কুফরী কাজের জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে তাকে উপযুক্ত পন্থায় সংশয়মুক্ত জ্ঞান দান করতে হবে। উপযুক্ত পন্থায় সংশয় মুক্ত জ্ঞান না দিয়ে কাফির বললে নিজেই কাফের হয়ে যাবে।

কারণ: কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফির বলা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন :

أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করবে, সত্যিকার অর্থে সে যদি কাফির না হয় তাহলে সম্বোধনকারী ব্যক্তিই কাফির হয়ে যাবে।" – মুসলিম: ৬০।

২। الاختيار – مانعه الاضطرار والإكراه ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা :

যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে। সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন হাদীছের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা না থাকার কারণে কুফরী কাজ করে তবে কাফির হবে না।

৩। الذكر والتعمد – مانعه النسيان والخطأ স্মরণ ও ইচ্ছা থাকা :

যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন হাদীছের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে সে অপরাধে জড়িত হওয়া প্রমাণিত হতে হবে। যদি অনিচ্ছায় বা ভুলক্রমে উক্ত অপরাধে জড়িত হয় তবে তাকে কাফির বলা যাবে না।

অতএব, উপরোক্ত কুরআন ও হাদীছের প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সরকার ও সরকারী দায়িত্বশীলদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রুটি ও পাপ থাকলেই বা কুফর ও শির্ক করলে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআনের বিধান অনুযায়ী শাসন করতে না পারলে ঢালাও ভাবে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে আনুগত্য ত্যাগ করা ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যাবে না। বরং এর পূর্বে তাদেরকে উপযুক্ত পন্থায় দাওয়াত দিয়ে ইলম দান করতে হবে ও সংশয় দুর করতে হবে। এরপরও যদি না মানে তবে সামর্থ থাকলে ঐ শাসকদের সরিয়ে আল্লাহর বিধান বুঝে ও প্রয়োগ করবে এমন শাসকগোষ্ঠিকে ক্ষমতায় বসাতে হবে। আলাহ তাদেরকে ও সকল মুসলিমকে সঠিক বুঝ ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

سابعا : أقوال الأئمة فى التحذير عن التكفير

সপ্তমতঃ কুফর আখ্যাদান হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের উক্তি

১। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন ঃ নিরানব্বই দিক থেকে যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যাদানের সম্ভাবনা থাকে আর এক দিক থেকে তার ঈমানদান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে মুসলমানের উপর ভাল ধারণা পোষণ করার লক্ষ্যে তাকে ঈমানদার হিসেবেই আমি গণ্য করব।

– ফিতনাতুত তাকফীর ৬২ পৃষ্ঠা।

২। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহ.) জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিচারক ও আলেমদের বলতেন: তোমরা যে সব কথা বল আমি যদি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই কাফির হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে কাফির আখ্যা দিতে পারছি না। কারণ তোমরা আমার দৃষ্টিতে অজ্ঞ।

– ফিতনাতুত তাকফীর ৬৩ পৃষ্ঠা।

৩। ইমাম নব্বী সহীহ মুসলিমের ভাষ্য গ্রন্থে বলেছেন ঃ জেনে রাখুন! হক্বপন্থীদের মাযহাব এই যে, গুনাহের কারণে ক্বিবলাপন্থী কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। এমনকি প্রবৃত্তি ও বিদ'আতের অনুসারী খারেজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য সম্প্রদায়কেও কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কোন কিছুকে জেনে শুনে অস্বীকার করবে সে ধর্মত্যাগী ও কাফির। তবে যদি নব মুসলিম হয় অথবা দূরবর্তী এমন কোন গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী হয় যার নিকট ইসলামের সমস্ত নিয়মকানুন পৌঁছেনি সে কাফির হবে না। তাকে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অবহিত করার পরেও যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে। অনুরূপ ভাবে যদি যেনা অথবা মদ পান অথবা হত্যাসহ বিভিন্ন ধরণের হারাম কর্মকে জেনে শুনে হালাল মনে করে তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে। – ফিতনাতুত তাকফীর ৬২ পৃষ্ঠা।

৪। ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেন ঃ কখনও কখনও মৌখিক কথা কুফরীর পর্যায়ভূক্ত হয়। এর ফলে এ কথার প্রবক্তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যেতে পারে এভাবে যে, যে ব্যক্তি এরূপ বলবে সে কাফির। কিন্তু যে ব্যক্তি এ কথা বলেছে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপক্ষে এমন দলীল প্রতিষ্ঠিত না হবে যা তাকে কফির হিসাবে প্রমাণ করে। – ফিতনাতুত তাকফীর ৭৩ পৃষ্ঠা।

৫। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব (রহ.) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী বিধান সম্পর্কে না জেনে আব্দুল কাদির জিলানী অথবা সাইয়্যিদ বাদাবীর কবরে সিজদাহ করে, তাহলে তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না। তবে ইসলামের বিধান ও দলীল সম্পর্কে জানার পরেও যদি সিজদাহ করে তাহলে সে কাফির। – ফিতনাতুত তাকফীর ৬৩ পৃষ্ঠা।

৬। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন ঃ সেই সব মুসলিমদেরকে আমরা কাফির আখ্যা দিতে পারি না কারণ তাদের নিকট

কাফির আখ্যা দানের দলীলগুলো স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা হয় নি। কেননা তাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ দাঈ নেই যারা জনগণের দ্বারপ্রান্তে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম। – ফিতনাতুত তাকফীর ৭৪ পৃষ্ঠা।

৭। শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বায (রহ.) বলেন ঃ খারেজী সম্প্রদায় গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দিয়েছে এবং গুনাহগারদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায় ও শাস্তির দিক থেকে (অর্থাৎ তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী) খারেজীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছে। কিন্তু তারা তাদেরকে কুফর ও ঈমান উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্থান দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ সবই ভ্রষ্টতা। আহলুস্ সুন্নাহগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাই চির সত্য। আর তা হচ্ছে এই যে, কোন মুসলিমকে গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহকে হালাল না জানবে।

–ফিতনাতুত তাকফীর ৫৯ পৃষ্ঠা।

৮। মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আল-উছামীন: তিনি বলেন, মুসলিম ব্যক্তিকে কুফর প্রতিপন্ন করার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। (১) যে বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কাফির বলা হবে সে বিষয়টির কুফরী হওয়ার দলীল প্রমাণিত হতে হবে। (২) যে ব্যক্তি এ কুফরীর সাথে জড়িত তার জন্য কুফর বিধান প্রযোজ্য হবে। শর্ত বিদ্যমান না থাকার কারণে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা ও হেফাযত করুন।

৯। জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররামের খত্বীব মাওলানা উবায়দুল হক বলেন ঃ একজন মুসলমান ইসলামী আইনে বিচার কাজ চালানোর চেষ্টা করবেন – এটা তার ধর্মীয় দায়িত্ব। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র ও বিচার প্রক্রিয়া থাকার কারণে কেউ যদি তা করতে না পারেন এবং প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকেই বিচারকাজ চালান তবে তাকে কাফির বলা যাবে না, আল্লাহদ্রোহী বলা যাবে না। বরং ইসলামী আইনের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেই কেবল একজন মুসলমান কাফির হয়ে যেতে পারে। প্রচলিত আইনে বিচারকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ শরীয়তের বিবেচনায় সর্বোচ্চ ফাসিক হতে পারেন। আর ইসলামী আইনেও কোন ফাসিকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়।

– সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও চরমপন্থা .... মিসবাহ ফাউণ্ডেশন, পৃষ্ঠা ১২।

بعض المعاصى الاساسية المضادة للتوحيد والإيمان
তাওহীদ ও ঈমানের পরিপন্থী মৌলিক কিছু বিষয়।
أولا: الشرك وأنواعه
প্রথমত: শিরক: শিরকের সংজ্ঞা প্রকারভেদ ও পরিণতি

সংজ্ঞা: যে কথা, কাজের ও ভাবের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা হয় তার কোন একটি কথা, কাজ ও ভাব আলাহ্ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য কিংবা রসম রেওয়াজ হিসাবে করাকে শির্ক বলা হয়। শির্ক বিভিন্নভাবে হতে পারে। আল্লাহর প্রভূত্বে, দাসত্বে, নাম ও গুণাবলীতে।

শির্কের দু'টি অর্থ রয়েছে:

(১) تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه

যে সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য সেগুলোর ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে সাব্যস্ত করা।

এ অর্থের ভিত্তিতে শিরক তিন প্রকার:

الشرك في الربوبية বা রব তথা সৃজন- রক্ষণ পালন ও বিবর্তন এ আল্লাহর সাথে শির্ক

الشرك في الألوهية বা ইবাদতে শির্ক

الشرك في الاسماء والصفات বা নাম ও গুণাবলীতে শির্ক।

(২) اتخاذ غير الله مع الله إلها معبودا مطاعا

আনুগত্য এবং ইবাদতের উপযুক্ত ইলাহ হিসাবে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে গ্রহণ করা। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদত বা আনুগত্য করে সে মুশরিক। আল্লাহ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا

তারা ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। – সূরা ফুরকান ৫৫।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? – সূরা শুআরা ২১।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। – সূরা ফাতিহা ৪।

শির্কের প্রকারভেদ:

শির্ক প্রধানত: দুই প্রকার আকবার (বড়) ও আসগার (ছোট)

শিরকে আকবার: আল্লাহর জন্য যে সমস্ত ইবাদত করা হয় তার কোন একটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য সাব্যস্ত করাই হলো শির্কে আকবার। যেমন আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ডাকা, বিপদমুক্তির জন্য দু'আ করা, কোন কবর মাযারে সিজদা বা রুকু করা, অলি বা কবরে শায়িত ব্যক্তির জন্য মান্নত করা, টাকা-পয়সা ও মোমবাতি দান করা। কবর-মাযার ও অলির নিকট পশু কুরবাণী দেয়া বা তাকে কেন্দ্র করে ওরশ করা বা তাতে খরচ করা ইত্যাদি।

শির্কে আকবারের প্রকারভেদ: তাওহীদের প্রকারভেদ ও তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে যত ধরণের হতে পারে, শির্কও তত ধরণের বা তত প্রকার হওয়াই স্বাভাবিক। এ জন্য বলতে পারি যে, শির্কে আকবার নিম্নোক্ত তিন প্রকারে বিভক্ত:

১। শির্ক ফির রবুবিয়াহ – প্রভূত্বের ক্ষেত্রে শিরক

২। শির্ক ফিল উলুহিয়াহ – দাসত্বের ক্ষেত্রে শির্ক

৩। শির্ক ফিলআসমা ওয়াসসিফাত– আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে শির্ক

শির্কে আসগার: আল্লাহর জন্য কোন ইবাদত করতে গিয়ে ইবাদতের ভিতর অন্য কোন স্বার্থ এসে পড়া, কিংবা অনিচ্ছায় শির্কযুক্ত কিছু ঘটে যাওয়া যেমন নামায পড়ার ভিতর, মানুষ দেখানো ইচ্চা বা সুনাম নেয়ার ইচ্ছা জাগা। হঠাৎ করে এ কথা বলা যে, যদি আল্লাহ ও আপনি চাইতেন তবে আমার এই কাজ উদ্ধার হতো। রোগমুক্তি যাদু-টোনার

প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাবিজ কবজ ব্যবহার করা, কিংবা তামার চুড়ি ব্যবহার করা, সুতা পড়া, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নামে শপথ করা। কোন কিছু থেকে বরকত আসতে পারে এই ধারণা রাখা। কোন কিছুর ব্যাপারে শুভ-অশুভের ধারণা রাখা।

শির্কে আকবার এর প্রকার ভেদঃ

(১) الشرك في الدعوة দাওয়াতের মধ্যে শির্ক, আল্লাহর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করার ন্যায় غير الله গাইরুল্লাহর কাছে চাওয়া। দলীলঃ

وَقَالَ رَبُّكُمْ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদতে অহঙ্কার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে। – সূরা গাফির ৬০।

ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ.

তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সঙ্গোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। –সূরা আ'রাফ ৫৫।

অতএব মৃতব্যক্তি বা অনুপস্থিত এর নিকট কিছু চাওয়া যাবে না। তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে গাইরুল্লাহর নিকট চাওয়া শির্কে পর্যবসিত হবে।

(১) أن يكون النداء حقيقيا لا مجازا আহবান রূপক না হয়ে বাস্তবিক হওয়া।

(২) أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সক্ষম নয় এমন বিষয় হওয়া।

(৩) أن يكون غائيا عن المسؤول জিজ্ঞাসিত ব্যাক্তি প্রার্থীর নিকট থেকে অদৃশ্য হওয়া।

দুআকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করার স্বপক্ষে কুরআনে অগণিত আয়াত রয়েছেঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পুজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্ত ও তার ডাকে সাড়া দিবে না। তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো

তাদের পুজা সম্পর্কেও বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে।
– সূরা আহক্বাফ ৫-৬।

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ

যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। – সূরা মু'মিনুন ১১৭।

(২) شرك النية والإرادة والقصد নিয়ত ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শির্ক) স্বীয় আমল দ্বারা গাইরুল্লাহকেই উদ্দেশ্য করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে:

قُلْ يَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ * لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ *

বলূন, হে কাফেরগণ! আমি ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর। – সূরা কাফিরুন ১-২।

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ

যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমরা তাদের দুনিয়াতেই আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কম করা হবে না। – সূরা হুদ ১৫।

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

আপনি বলুন! আমার নামায আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আলাহ্‌রই জন্য। – সূরা আনআম ১৬২।

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰ

আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। – সূরা যুমার ৩।

৩। شرك الطاعة আনুগত্যে শির্ক, হুকুম এবং বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে غيرالله গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّه

আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। – সূরা আন'আম ৫৭।

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

আর আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফায়সালা করুন।

– সূরা মায়েদাহ ৪৯।

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ

যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের, যালিম ও ফাসিক্ব। – সূরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭।

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ

তাদের তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত। – সূরা তাওবা ৩১।

أَلاَ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْرُ

জেনে রেখ তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।

– সূরা আ'রাফ ৫৪।

৪। شرك المحبة ভালবাসার শির্ক, ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহকে অন্যের সাথে সমকক্ষ করা, বা আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার বানানো। পবিত্র কুরআনে এসেছে:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যাস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। – সূরা বাকারাহ ১৬৫।

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাকে ভালবাসবে। Ñ m~iv gv‡q`v 44|

রাসূল (সা.) বলেছেন:

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার কেউ হতে পারবে না যতক্ষণ তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ও অন্যান্য লোক সকল থেকে আমি (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার নিকট অধিক প্রিয় না হব।

৫। الشرك فى الخوف ভয়ের মধ্যে শির্ক, ভয় করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা। যেমন আল্লাহ বলেন:

فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকেই ভয় কর। – সূরা আলে-ইমরান ১৭৫।

فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي

কাজেই তাদের ভয়ে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় কর। Ñ m~iv evK¡vivn 150|

৬। خوف طبيعي সহজাত ভয়, যেমন সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, বাঘ বা অন্য ভয়ঙ্কর বস্তু দেখে মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়া শিরকী ভয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়।

৭। الشرك في التوكل ভরসায় শির্ক, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা শির্কের অন্তর্ভূক্ত। কেননা আল্লাহ বলেন:

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لاَ يَمُوتُ

আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই।
– সূরা ফুরকান ৫৮।

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। –সূরা মায়েদা ২৩।

وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

ভরসাকারীদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। – সূরা ইবরাহীম ১২।

দুনিয়াবী কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন মানুষের উপর নির্ভর এ জাতীয় শির্কের অন্তর্ভূক্ত। অসীলামূলক নির্ভরতায় কোন দোষ নেই।

শির্কে আসগর এর প্রকার সমূহঃ

১। قولي মৌখিকভাবে যেমন غير الله গাইরুল্লাহ এর নামে শপথ করা। عبد النبي আব্দুন নবী عبد الرسول আব্দুর রাসূল নামে কাউকে ডাকা ইত্যাদি।

২। فعلي কর্মের সাথে সম্পৃক্তঃ যেমন গণকের কাছে যাওয়া, তার কথায় বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

৩। قلبي অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্টঃ যেমন সুনাম ও খ্যাতি অর্জন, লোক দেখানোর জন্য এবং দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আমল করা। উক্ত শির্ক অবস্থা ভেদে আকবার এ রুপান্তরিত হতে পারে। যেমন কারো আমলের উদ্দেশ্য যদি শুধু দুনিয়া হয় এবং পরকালের প্রতি যদি তার কোন ভ্রুক্ষেপ না থাকে তবে শির্কে আকবার ধরা হবে।

শুধু সম্পদের উদ্দেশ্যে ভালো কাজ করা, যেমন : হজ্জ করা টাকার জন্য জিহাদ করা গণীমতের জন্য, ইলম শিক্ষা করা পদের জন্য, কুরআন মুখস্ত করা ইমামতির জন্য এগুলো শির্কে আসগর এর পর্যায়ে পড়বে।

الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر

শির্কে আকবার ও আছগরের মধ্যে পার্থক্যঃ

১। শির্ক আকবারের মাধ্যমে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফির বা মুশরিক হয়ে যায়। কিন্তু শিরকে আছগরের কারণে তা হয় না।

২। শির্ক আকবার বিশেষ তাওবাহ ছাড়া ক্ষমার অযোগ্য কিন্তু শির্কে আছগারকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাওবাহ ছাড়াই ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৩। শিরকে আকবারের কারণে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে কিন্তু শিরকে আসগরের কারণে ক্ষণস্থায়ী হবে। আবার আল্লাহ ইচ্ছা কবলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

৪। শিরকে আকবারের কারণে জীবনের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু শিরকে আছগরের কারণে যে কাজে এই শির্ক পাওয়া যাবে শুধু সেটাই ধ্বংস হবে, অন্যান্য আমল অবশিষ্ট থাকবে।

৫। শিরকে আকবারে জড়িত ব্যক্তির জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে তার জান-মালের নিরাপত্তা নেই। কিন্তু শিরকে আছগরে জড়িত ব্যক্তির জন্য পুর্ণ নিরাপত্তা থাকবে।

خطورة الشرك

শির্কের ভয়াবহ পরিণাম:

আল্লাহর নাফরমানী সমূহের মধ্যে শিক হলো সবচেয়ে বড় নাফরমানী। এ জন্যই পবিত্র কুরআনে এসেছে:

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। – সূরা লুকমান ১৩।

আর রাসুল (সা.) বলেছেন:

ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله -

আমি কি তোমাদের কে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ কোনটি তা বলে দেব না ? তা হলো আল্লাহ্ তাআলার সাথে শিরক করা।

এ কারণে যে ব্যক্তি শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أُوْلَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ *

আহলে কিতাব ও মুশরিকের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারা সৃষ্টির অধম। – সূরা বাইয়েনাহ ৬।

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। – সূরা মায়েদা ৭২।

إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না, তবে তিনি ক্ষমা করেন এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। – সূরা নিসা ৪৮।

শিরক যাবতীয় আমল নষ্ট করে দেয়। যেমন আল্লাহ পাক রাসুল (সা.)কে সম্বোধন করে বলেছেন:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিস্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের একজন হবেন। – সূরা যুমার ৬৫।

রাসুল (সা.)কে যদি আল্লাহ পাক শিরক সম্পর্কে এমন কড়া সূরে বলে থাকেন, তাহলে অন্যদের ব্যাপারে বিষয়টি কত মারাত্মক, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

بعض الأعمال الشركية
প্রচলিত কতিপয় শির্কী কার্যাবলী:

১। السحر (যাদু) রাসুল (সা.) বলেছেন: من سحر أشرك

যে যাদু করে, সে শির্ক করে।

২। الكهانة (ভাগ্য গণনা) রাসূল (সা.) বলেছেন:

من أتى عرافا فسأله عن شيئ لم تقبل له صلاة أربعين يوما – رواه مسلم أحمد

যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল চল্লিশ দিনপর্যন্ত তার সলাত কবুল করা হবে না। –ছহীহ মুসলিম।

অপর বর্ণনায় আছে: যদি গণককে সত্য মনে করে তবে ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর নাযিলকৃত সমস্ত বিষয়ের সাথে কুফরী করল।
মুসনাদে আহমাদ, ছহীহুল জামি হাদীছ নং ৫৩৫৯।

রাশি গণনার যত পদ্ধতি দেশে প্রচলিত রয়েছে, যেমন টিয়াপাখির মাধ্যমে, হাতের আঙ্গুলের রেখার মাধ্যমে পাথরকণা নিক্ষেপ, অক্ষর গণনা সহ অন্যান্য সবগুলো এ ধরণের শির্কের অন্তর্ভূক্ত হবে।

৩। النشرة যাদুর মাধ্যমে যাদু ভাঙ্গা বা জ্বীন ছাড়ানো শির্ক। তবে দুআ এবং কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে এটা জায়েয।

৪। التنجيم গ্রহ, নক্ষত্র, তারকারাজীর চলাচলের উপর ভিত্তি করে কিছু বলা। উহা দু'প্রকার:

১। علم تأثير প্রভাব ফেলার জ্ঞান যা শির্কের অন্তর্ভূক্ত।

২। علم تسيير চলার জ্ঞান যা জায়েয। যেমন কিবলা ও রাস্তা চেনা।

৫। الاستسقاء بالأنواء তারকারাজীর বদৌলতে বৃষ্টি চাওয়া বা বৃষ্টি হয়েছে বলা। এজন্য مطرنا بنوء كذا كذا আমরা এই এই তারকার দ্বারা বৃষ্টি পেয়েছি বলা জায়েয নেই। আর যদি مطرنا فى نوء كذا كذا এই এই তারকার উদয়ের মধ্যে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি বলে তবে জায়েয।

৬। تطير কোন জিনিষকে শুভ অশুভ মনে করা। রাসুল (সা.) বলেছেন: الطيرة شرك অশুভ লক্ষণ মনে করা শির্ক।

কয়েকটি কারণে উহা হারাম ঃ

(১) ক্ষতি বা উপকারকে غير الله গাইরুল্লাহ এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়।

(২) غيرالله গাইরুল্লাহ এর উপর তাওয়াককুল সৃষ্টি করে।

(৩) غيرالله গাইরুল্লাহ এর সাথে অন্তর সম্পৃক্ত হয়।

(৪) ভয় বা অস্থিরতা সৃষ্টি হয় যার কারণে দায়িত্ব পালন থেকে মানুষ বিরত থাকে।

৭। التميمة তাবিজ লাগানো, কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর জন্য তাবিজ সর্বসম্মতি ক্রমে হারাম। আর বিশুদ্ধ মতে কুরআনের দ্বারা তাবিজ দেয়াও জায়েয নয়। যেহেতু রাসূল (সা.) বলেছেন:

من تعلق تميمة وكل اليه

যে তাবিজ ঝুলানো তাবিজের প্রতিই তাকে নির্ভরশীল করে দেয়া হয়।

– হাদীছের সনদে কিছু দুর্বলতা আছে।

وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك

অন্য বর্ণনায়– যে তাবিজ ঝুলালো সে শির্ক করলো।

সাঈদ বিন যুবায়ের বলেন: ইবনু মাসউদ (রা.) বলেছেন ঃ

من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة

যে কারো থেকে তাবিজ কেটে দিল সে যেন একটি গোলাম আযাদ করে দিল।

এ জাতীয় কথা সাহাবী হতে শোনা ব্যতীত বলা সম্ভব নয়।

৮। الرقي (ঝাড়ফূঁক) এটা জায়েয হওয়ার জন্য শর্তাবলী হলো:

(১) আলাহর কালাম, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং রাসুল (সা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত কথা দ্বারা হতে হবে।

(২) আরবী ভাষায় হতে হবে।

(৩) অর্থবোধক হতে হবে।

(৪) এর উপর নির্ভর করা যাবে না।

(৫) এর কোন প্রভাব রয়েছে এ বিশ্বাস রাখা যাবে না, বরং আলাহর হুকুমেই হচ্ছে এ বিশ্বাস রাখতে হবে।

উপরোক্ত শর্তাবলী ছাড়া ঝাড়ফূঁক করা শির্ক।

পবিত্র কুরআনে এসেছে:

قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ

বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আলাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? – সূরা যুমার-৩৮।

হাদীছে এসেছে:

ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة فقال: انزعها فانها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحك أبدا

বিশ্বনবী (সা.) কোন এক ব্যক্তির হাতে তামার বালা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? সে বললো এটা দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্য (প্রতিশেধক) তখন রাসূল (সা.) বললেন এটা খুলে ফেল। কেননা এটা দুর্বলতা বাড়িয়ে দেবে। আর যদি তুমি এটা হাতে ধারণসহই মৃত্যুবরণ কর তবে কখনই মুক্তি পাবে না।

بعض الشركيات الخرافية المنتشرة فى المجتمع

সমাজে বিদ্যমান কিছু কুসংস্কার মূলক ছোট শিরকের বর্ণনা :

অবস্থা বিশেষে এ সব ছোট শিরকও বড় শিরক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এতে আল্লাহ ব্যতীত বিভিন্ন সৃষ্টির ও কার্যকলাপের ভিত্তিতে

ভাগ্য নির্ণয় ও মঙ্গল-অমঙ্গল যাচাই করা হয়। মুসলিম সমাজে এরূপ কুসংস্কার মূলক বহু শিরকের ছড়াছড়ি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু তুলে ধরা হলো:

(১) বিয়ের আগে কন্যার বাড়ীতে গিয়ে কন্যার পায়ের ছাপ দেখা।

(২) বিয়ে ঠিক হবার পর বরের বাড়ীতে কোন ক্ষতি হলে কনেকে অলক্ষ্মী বলে ধারণা করা।

(৩) আগুন পুজার ন্যায় কুলাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে কনের চেহারার সামনে ঘুরানো।

(৪) সন্তান হবার পূর্বে সুন্দর বাচ্চার ছবি দেখলে বাচ্চা সুন্দর হবে ধারণা করা।

(৫) গর্ভবতী অবস্থায় কোন কিছু খেতে ইচ্ছা করলে তা না খেলে বাচ্চার লালা পড়বে বলে ধারণা করা।

(৬) গর্ভাবস্থায় সুর্যগ্রহণ লাগা দেখলে সন্তান পঙ্গু হবে মনে করা।

(৭) গর্ভাবস্থায় সুর্যগ্রহণ থাকা কালীন কোন কিছু না খাওয়া, খেলে সন্তান রাক্ষুসের মত খাবে (অতিরিক্ত খাবার খাবে) বলে ধারণা করা।

(৮) গর্ভাবস্থায় কোন মৃতকে দেখলে অমঙ্গল হবে মনে করা।

(৯) ব্যবসাতে প্রথম দিন ক্রেতাকে বাকী না দেয়া। এ ধারণায় যে ব্যবসায়ে ক্ষতি হবে।

(১০) সকালে দোকান খুলে ও সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালানো ও মাসজিদ থেকে পানি এনে ছিটানো মঙ্গলজনক মনে করা।

(১১) সকালে ও সন্ধ্যায় বাকী না দেয়া।

(১২) সব সময় ক্যাশ খালি না রেখে কিছু টাকা রেখে দেয়া।

(১৩) পরীক্ষার সময় এলে ডিম, মিষ্টি ইত্যাদি গোল জাতীয় খাবার না খাওয়া। খেলে পরীক্ষায় গোল পাওয়ার আশঙ্কা।

(১৪) কলমে হুজুর বা ইমাম সাহেবের নিকট হতে ফুঁ দিয়ে নিয়ে যাওয়া।

(১৫) পরীক্ষায় পাস করার জন্য তাবীজ নেয়া।

(১৬) শনিবার দিন কোথাও যাওয়া ঠিক নয় তাতে অমঙ্গল হবে মনে করা।

(১৭) শনিবার নতুন বউকে মায়ের বাড়ীতে যেতে না দেওয়া।

(১৮) মঙ্গলবার কোন আত্মীয় মারা গেলে উক্ত বারেই তিনজন আত্মীয় মরবে ধারণা করা।

(১৯) পায়ে তিল থাকলে নাকি বিদেশে যাবার সুযোগ হয়।

(২০) ঘাড়ে তিল থাকলে তার মৃত্যু জবাই বা ফাসীর মাধ্যমে হয়।

(২১) ঠোটের নীচে তিল, কানের নীচে তিল ও মশা থাকলে নাকি অমঙ্গল হয়।

(২২) চোখ টেরা থাকলে ভাগ্যবান হওয়া মনে কর।

(২৩) নাক চ্যাপ্টা(বোচা) থাকলে বেশী করে বিয়ের প্রস্তাব আসে মনে করা।

(২৪) মেয়ের বাপের মত চেহারা হলে ভাগ্যবান হবে বলে মনে করা।

(২৫) হাত চুলকালে টাকা আসবে বলে মনে করা।

(২৬) তাহাজ্জুদ নামাযের সময় বিভিন্ন ভয়ঙ্কর বস্তু দেখানো হয় মনে করা।

(২৭) সেই নামাযীর পিছনের দিক থেকে কেউ ডাকলে, ভয়ে যদি নামায ছেড়ে দেয় তাহলে সে মারা যাবে, না হয় পাগল হয়ে যাবে মনে করা।

(২৮) বাড়ীর সামনে কাক ডাকলে কেউ মারা গেছে বা যাবে, কাক এরূপ সংবাদ নিয়ে এসেছে মনে করা।

(২৯) বিড়াল ও কুকুর কাঁদলে ক্ষতি ও বিপদ আছে এরূপ মনে করা।

(৩০) বাড়ীর বাইরে যাবার সময় যদি কাপড় কিছুতে আটকে যায় বা কোন কিছু পড়ে যায় বা সামনে দিয়ে বেড়াল যায় তাহলে তখন বাইরে গেলে বিপদ হবে এরূপ ধারণা করা।

(৩১) যাবার সময় পিছন দিক থেকে ডাকলে বিপদ n‡e Giƒc g‡b Kiv|

(৩২) মাথার বালিশ পায়ের নিচে বা বালিশ টপকে গেলে তাতে ঘুমালে ঘাড় ব্যথা করবে মনে করা।

(৩৩) মুরুব্বীরা কোন কিছু করতে না বললে তা করলে অমঙ্গল হবে, কুরআন ও হাদীছ নিয়ে তা বিবেচনা না করে বিশ্বাস করা।

(৩৪) খাবার সময় জিহবায় কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিয়েছে ও কাশি উঠলে কেউ তাকে স্মরণ করছে মনে করা।

(৩৫) নজর লাগবে বলে খাবার আগে কিছু খাবার ফেলে দিয়ে খাওয়া শুরু করা।

(৩৬) প্লেটের সম্পূর্ণ খাবার শেষ না করে তথাকথিত ভদ্রতার নামে কিছু রেখে দেয়া।

(৩৭) খাবার আগে কেউ খোটা দিলে সে খাবার না খাওয়া।

(৩৮) সন্ধ্যার পর বাজার থেকে মাছ আনলে মাছের সাথে দু'টো জ্বিন আসে মনে করা।

(৩৯) ছোট্ট শিশুরা নতুন হাঁটা শিখতে শুরু করলে তার উপর দিয়ে বিভিন্ন ফল,পিঠা, ছোট ছোট টুকরো করে ঘরে বা বারান্দায় ফেলা। এরূপ করলে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে মনে করা।

(৪০) ছোট্ট বাচ্চার জন্মের পর তার বিছানার নীচে উক্ত বাচ্চার মামার পায়ের চামড়ার জুতার টুকরা, লোহা জাতীয় জিনিষ ও শুকনো মরিচ রাখা।

(৪১) ছোট্ট বাচ্চাদের নতুন দাঁত উঠলে যে প্রথমে দেখবে তার সবাইকে ক্ষীর খাওয়াতে হবে মনে করা।

(৪২) বাচ্চারা যদি ঘর বা বারান্দা ঝাড়ু দেয় তাহলে মেহমান আসবে মনে করা।

(৪৩) বাচ্চাদের গায়ে লাঠি বা ঝাড়ুর ছোঁয়া লাগলে জ্বর আসবে মনে করা এবং গায়ে পানি ছিটিয়ে দেয়া।

(৪৪) ভয় পেলে লবণ পানি খাওয়ানো

(৪৫) বাচ্চাদের টপকিয়ে গেলে আর বড় হবে না মনে করা।

(৪৬) নজর থেকে বাঁচার জন্য শিশুদের কপালে, পায়ের তলায় কাজলের টিপ লাগানো।

(৪৭) কারো স্মরণের সাথে সাথে উপস্থিত হলে তার দীর্ঘ হায়াত আছে বলে মনে করা।

(৪৮) ঘুম থেকে উঠে উমুকের মুখ না দেখা।

(৪৯) মৃত ব্যক্তির কল্যানের জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়ানো।

(৫০) মুত্যু ঠেকানোর জন্য ছেলে সন্তানের কান ছিদ্র করা ও রিং পরানো।

(৫১) উল্লু বা হুতুম প্যাঁচা ছোট শিশুর রক্ত চোষে বা মন্দ করে এমন ধারণা করা এবং তার ডাককে অমঙ্গল মনে করা।

(৫২) সালের প্রথম দিন, পহেলা বৈশাখ ও পহেলা জানুয়ারীতে বাকী না দেয়া। এবং এ দিনের উপর পুরা বছরের কল্যাণ অকল্যাণের ধারণায় অনেক কিছু করা ও অনেক কিছু থেকে বিরত থাকা।

(৫৩) সন্ধ্যা বেলা (সূর্য ডোবার সময়) ঘরবাড়ি, যানবাহনে, দোকানপাটে বরকতের জন্য বাতি, আগারবাতি, মোমবাতি জ্বালানো।

الكفر وأنواعه

দ্বিতীয়তঃ কুফর বা আল্লাহর সাথে কুফরী

কুফর দু' প্রকার

প্রথমঃ এমন কুফর যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।

এটি পাঁচ প্রকার।

এক ঃ মিথ্যা আরোপ করার কুফর।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ 68

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে অথবা তার নিকট সত্য আসার পরও সেটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? কাফিরদের জন্য কি জাহান্নাম বাসস্থান নয়?

– সূরা আনকাবুত ৬৮।

দুই ঃ সত্য বলে মেনে নেয়ার পরও অহংকার এবং অস্বীকারবশত কুফর।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

অর্থ ঃ " আর স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন আমি ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বললাম, তোমরা আদমকে সাজদাহ কর, তখন তারা সাজদাহ

করল, তবে ইবলীস অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। আর সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।” –সূরা বাকারাহ ঃ ৩৪।

তিন ঃ সন্দেহজনিত কুফর।

এটি হচ্ছে ধারণা সম্পর্কিত কুফর।

এর প্রমাণ আলাহর বাণী ঃ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا 35 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا 36 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا 37 لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا 38

অর্থ ঃ “আর নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বললঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আর যদি কখনো আমার পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে সেখানে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে বিতর্কের ছলে বলল, তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে। কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না।”

– সূরাহ কাহফ ঃ ৩৫-৩৮।

চার ঃ বিমুখতা জনিত কুফর।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ 3

অর্থ ঃ “ এবং যারা কুফর করে তারা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক হয় তারা তা হতে বিমুখ।” – সূরাহ আহক্বাফ ঃ ৩।

পাঁচ ঃ নিফাক বা কপটতা জনিত কুফর।

এর প্রমাণ আলাহর বাণী ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ 3

অর্থঃ " এটি এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফর করেছে। অতএব, তাদের অন্তরে মোহরাংকিত করা হয়েছে কাজেই তারা বুঝে না।" –সূরাহ মুনাফিকূন ঃ ৩।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

এটি ছোট কুফর। এটি কাউকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। এটি হচ্ছে নিয়ামতের কুফর।

এর প্রমাণ আলাহর বাণী ঃ

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ112

অর্থ ঃ "আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আলাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। –সূরা নাঃ ১১২।

ثالثا : النفاق وأنواعه

তৃতীয়ত: নিফাক (কপটতা)

নিফাক দু'প্রকার ঃ আকীদাহগত ও আমলগত

আক্বীদাহগত নিফাক্ব ছয় প্রকার। এ শ্রেণীর মুনাফিক্ব জাহান্নামের অতল তলের অধিবাসী।

প্রথমঃ রাসূলকে (সা.) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

দ্বিতীয়ঃ রাসূল (সা.)এর আনীত ওয়াহীর কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

তৃতীয় ঃ রাসূলের (সা.) প্রতি হিংসা- বিদ্বেষ পোষণ করা।

চতুর্থ ঃ রাসূল (সা.) আনীত বিধানের কিছু অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

পঞ্চম ঃ রাসূলের (সা.) দ্বীনের অবনতিতে খুশী হওয়া।

ষষ্ঠ ঃ রাসূলের (সা.) দ্বীনের বিজয়কে অপছন্দ করা ।

আমলগত নিফাক্ব বা কাজে-কর্মে কপটতা

আমলগত নিফাক্ব পাঁচ প্রকার ঃ এর প্রমাণ রাসূলের (সা.) বাণী ঃ

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا ائتمن خان متفق عليه

অর্থ ঃ " মুনাফিকের (কপটের) লক্ষণ তিনটি ঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে । যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে । যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় সেটির খেয়ানত করে ।" – ছহীহ বুখারী ও মুসলিম ।

আরেকটি বর্ণনায় আছে,

وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر

অর্থ ঃ যখন ঝগড়া করে অশ্লীল কথা বলে । যখন সন্ধি করে তা ভঙ্গ করে । –ছহীহ বুখারী ও মুসলিম ।

رابعا : الطاغوت

চতুর্থত: ত্বগুত

ত্বাগুতের অর্থ এবং এর প্রধান প্রধান প্রকারসমূহ:

জেনে রাখুন, (আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন) আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের উপর প্রথম যে জিনিষটি ফরয করেছেন তা হচ্ছে ত্বগুতকে অস্বীকার করা এবং আলাহ্র প্রতি ঈমান রাখা ।

এর প্রমাণ আলাহ্র বাণী ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

অর্থ ঃ "আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ কথা বলে একজন করে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগুত থেকে বিরত থাক ।" –সূরা নাহ্ল ঃ ৩৬ ।

ত্বাগুতকে অস্বীকার করার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদতকে বাত্বিল ও অন্তঃসারশূণ্য বলে বিশ্বাস করা । এটি পরিত্যাগ করা । এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা । যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর বা কোন কিছুর ইবাদত করে তাদের কাফির বলে বিশ্বাস করা এবং তাদের

শত্রু জ্ঞান করা। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হচ্ছে একমাত্র আলাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই– এ কথা বিশ্বাস করা, আলাহ্র জন্যই সকল প্রকার ইবাদতকে নিখাদ ও নির্ভেজাল করা, তিনি ছাড়া যত উপাস্য আছে তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করা, মুখলিছ (একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল) লোকদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করা। মুশরিকদের ঘৃণা করা এবং তাদের বৈরী বলে বিশ্বাস করা। এটাই হচ্ছে নাবী ইবরাহীমের ধর্ম। যারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে তারা নিজেদের বোকা বানিয়েছে।

এ আদর্শ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ4

অর্থ ঃ “নিশ্চয় তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের জীবনে এক অনুপম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের জাতির লোকদের বলল, নিশ্চই আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যার ইবাদত কর তা থেকে মুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম। আমাদের ও তোমাদের মাঝে সর্বদা শত্রুতা এবং ঘৃণার সূচনা হলো যতক্ষণ তোমরা একমাত্র আলাহ্র প্রতি ঈমান না আন।” –সূরাহ মুমতাহিনাহ ঃ ৪।

“ত্বগুত” একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে কোন উপাস্যরূপী, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়র ইবাদত করা হয় এবং এতে সে সন্তুষ্ট থাকে তাকেই “ত্বা্গুত” বলা হয়। অনেক ত্বাগুত আছে, তন্মধ্যে **প্রধান হচ্ছে পাঁচটি**।

প্রথমঃ শয়তান – যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা কোন কিছুর ইবাদত করতে আহবান করে। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ60

অর্থঃ “হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”

–সূরা ইয়াসীন ঃ ৬০

দ্বিতীয় ঃ আলাহর বিধান পরিবর্তনকারী যালিম শাসক ।

এর প্রমাণ আলাহর বাণী ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا 60

অর্থঃ "আপনি কি তাদের দেখেননি যারা ধারণা করে যে, তারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ ওয়াহীর প্রতি ঈমান এনেছে। তারা ত্বগুতকে বিচারক মানতে চায়। অথচ তাদের সেটিকে অস্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের সূদুর ভ্রান্তিতে ফেলতে চায় ।" – সূরা নিসা ঃ ৬০ ।

তৃতীয় ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী শাসন করে ।

এর প্রমাণ আলাহর বাণী ঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 44

অর্থ ঃ "যারা আলাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন করল না তারাই কাফির ।" – সূরা মায়িদাহ ঃ ৪৪ ।

এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ।

قال على ين ابي طلحة عن ابن عباس قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأءلئك هم الكافرون – قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به فهو ظالم فاسق – وعن طاؤس عن عباس في قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله .... قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ' رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ' (انظر ابن كثير 86-85)

আলী বিন ত্বালহাহ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করে বলেন, আলাহর বাণী ঃ যারা আলাহর অবতীর্ণ করা বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা শাসন করে তারা কাফির ।" এর মর্ম হচ্ছে যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকারবশতঃ বর্জন করে তারা কাফির । কিন্তু আল্লাহর বিধানকে যথাযোগ্য স্বীকার করার পর যদি তা দ্বারা শাসন না করে তবে যালিম ও ফাসিক । ত্বাউস ইবনু আব্বাস থেকে উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করে বলেন যে, আয়াতে উল্লেখিত "কুফর" বলতে তোমরা যা মনে করে থাকো তা নয় । এ

বর্ণনাটি হাকিমও উদ্ধৃত করেছেন তার মুসতাদরাক গ্রন্থে সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ'র বরাতে এবং বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ বলেছেন।
–ইবনু কাসীর ২/৮৫/৮৬।

উক্ত আয়াত ও তার তাফসীরের আলোকে আলিমগণ আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত শাসনের পাঁচটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন। (১) যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী মনে করবে সে প্রকৃত কাফির। (২) যে ব্যক্তি উভয় প্রকার বিধানকে সমানভাবে বৈধ মনে করবে সে প্রকৃত কাফির। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে উত্তম বিশ্বাস করতঃ মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা বৈধ মনে করে সেও প্রকৃত কাফির। (৪) যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধানকেই আল্লাহর বিধান বলে দাবী করবে সেও প্রকৃত কাফির। (৫) যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, আলাহর বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয় কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শ্বকতার চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না। এ ব্যক্তি ছোট ও অপ্রকৃত কাফির। এর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বহিস্কত হবে না। –দেখুন আল-উরওয়াতুল উছক্বা ১৬৭-১৬৮।

চতুর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে গুপ্ত জ্ঞানের দাবী করে।

এর প্রমাণ আলাহর বাণী ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا 26 إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا 27

অর্থঃ " তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" – সূরা জ্বিন ঃ ২৬-২৭।

আলাহর বাণী ঃ

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

অর্থ ঃ " তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবী রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শষ্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার

অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে ।" – সূরা আন'আম ঃ ৫৯ ।

পঞ্চম ঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয় এবং সেই উপাস্যারূপী ঐ ইবাদতে সন্তুষ্ট ।

এর প্রমাণ আলাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ 29

অর্থ ঃ " আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে তিনি ছাড়া আমিই মা'বূদ আমি তাকে প্রতিফল হিসাবে জাহান্নাম দিব ।এমনিভাবে আমি অত্যাচারীদের প্রতিফল দেই ।" – সূরা আম্বিয়া ঃ ২৯ ।

জেনে রাখুন, মানুষ ত্বগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আলাহ্‌র প্রতি ঈমান আনতে পারবে না । এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا
وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 256

অর্থ ঃ " যে ব্যক্তি ত্বাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল সে অবশ্যই সুদৃঢ় হাতলকে ধারন করল যা ভাঙ্গবার নয় । আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা । " – সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৫৬ ।

মুহাম্মাদ (সা.) এর দ্বীনই হচ্ছে সঠিক পথ এবং আবু জাহলের পথ ভ্রান্তির পথ । সুদৃঢ় হাতল হচ্ছে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই । এ সাক্ষ্য বাণীতে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে । আল্লাহ ছাড়া সকল সত্ত্বার সকল প্রকার ইবাদতকে অস্বীকার করে । সকল প্রকার ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট করে যার কোন অংশীদার নেই ।

الملحق

" لا إله إلا الله محمد رسول الله " كلمة صحيحة و توحيدية

পরিশিষ্ট

কালিমাহ
" লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" একটি শুদ্ধ ও তাওহীদী বাক্য

১। কালিমার শুদ্ধবাক্য ও অশুদ্ধ বাক্যসমূহ

২। কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর শব্দাবলী – হাফিয আইনুল বারী আলীয়াভী।

৩। সংশয় নিরসন

৪। "কালিমাহ ত্বইয়িবাহ কোন বাক্যটি" বইয়ের পর্যালোচনা।

৫। প্রচলিত কালিমাহ لا إله إلا الله محمد رسول الله শুদ্ধ

শাইখ আব্দুল খালেক সালাফী,

সাবেক প্রিন্সিপ্যাল, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

৬। দারুল ইফতা বাংলাদেশ– এর শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত "ফাতাওয়া"।

৭। জামেয়া সালাফিয়া বেনারস থেকে প্রকাশিত

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ প্রসঙ্গে ফাতওয়া

পর্যালোচনার ফলাফল:

পরিশিষ্ট ১

কালিমার শুদ্ধবাক্য ও অশুদ্ধ বাক্যসমূহ

أولا: بعض الالفاظ الصحيحة للكلمة

প্রথমত: কালিমার বিশুদ্ধ শব্দাবলী :

(1) لا إله إلا الله (مسلم 124و128و 132)

(2) لا إله إلا الله وحده ----

(3) لا إله إلا أنت

(4) أشهد أن/ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله – (مسلم /140)

(5) قول/ قال/: لا إله إلا الله

(6) أشهد أن/ لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله

(7) أشهد أن/ لا أله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

(8) أشهد أن/ لا إله إلا أنت

(9) من شهد أن/ لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله

(10) نشهد أن/ لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

(11) شهادة أن/ لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

(12) شهادة أن/ لا إله إلا الله وانى رسول الله

(13) يشهدوا أن/ لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله

(14) يشهدوا أن/ لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله- مسلم/148

(15) يشهدوا أن/ لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله

(16) يشهدوا أن/ لا إله إلا الله وانى رسول الله

(17) لا إله إلا الله محمد رسول الله

ثانيا : بعض الالفاظ الخاطئة للكلمة

দ্বিতীয়ত: কালিমার ভুল শব্দাবলী

যে সব শব্দে কালিমাটি লেখা ও পাঠ করা দলীলেল দৃষ্টিতে ও ভাষাগত ভাবে ভুল বা সঠিক নয় তা হল নিম্নোক্ত শব্দাবলীঃ

(1) **أن لا إله إلا الله**

(শুরুতে শুধু أن - থাকার কারণে যা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক)

(2) **أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله**

(محمد এর পূর্বে واو এবং أن - না থাকার কারণে)

(3) **لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله**

(প্রথমে لا এর পূর্বে أشهد উল্লেখ না করে দ্বিতীয় অংশে উল্লেখ করার কারণে)

(4) **أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله**

(لا إله এর পূর্বে أن সিদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ شهادة বা أشهد ইত্যাদি না থাকার কারণে)

(5) **لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله**

(প্রথম অংশ অর্থাৎ لا إله এর পূর্বে شهادة أن বা أشهد أن ইত্যাদি না থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ محمد এর পূর্বে و أن ব্যহবহার হওয়ার কারণে)

(6) **إلا الله لا إله**

ইলাল্লাহু লা ইলাহা ।

এই শব্দে কালিমার বাক্য লিখেছেন মাওলানা শাহ আহমদ শফী, শিরক, কুফরী ও বিদআতে ভরপুর বই "ফুয়ুযাতে আহমাদিয়াহ্ পৃঃ ২৩ ।

উপরোক্ত শব্দাবলী যেমন ভাষাগত ভাবে অর্থাৎ আরবী গ্রামারের আলোকে ভুল বা বেঠিক তেমনি দলীলের আলোকেও ভুল । কারণ কুরআন বা ছহীহ কোন হাদীছে উপরোক্ত কোন শব্দে কালিমা বর্ণিত হয়নি । এমনকি উপরোক্ত শব্দে নিজের বানানো ছাড়া জাল ও যঈফ হাদীছ থেকেও কেউ প্রমাণ দেখাতে পারবে না । আব্দুল্লাহ ফারুকও লিখেছে: ব্যাকরণগত ভাবে বিতর্কিত এবং হাদীছের ভাণ্ডারে أشهد শব্দ বিহীন বাক্যটির কোন অস্তিত্ব নেই । পৃষ্ঠা ৬২ ।

উপরোক্ত ছয় ধরণের ভুল শব্দের মধ্যে প্রথম চারটির ব্যবহারও দেখা যায় না । পঞ্চম শব্দে এ যাবত সাধারণ শিক্ষিত কিছু লেখকের কলম দ্বারা বা সমর্থনে চার জায়গায় লিখা পেয়েছি । যার দুই জায়গায় আমি নিজে

শুধরিয়ে দিয়েছি। আরো এক জায়গায় সাইনবোর্ডে লিখিত ছিল। আল-আমীন জামে মসজিদের কিছু মুসল্লী ভেঙ্গে ফেলেছে। উক্ত মসজিদের গেটের উপরে এখনো ঐ ভুল বাক্যটি রয়েছে। এখান থেকে মুছে ফেললে আমার জানামতে চার জায়গা থেকে মুছা হয়ে যাবে।

এই ভুল শব্দে লিখিত কালিমাটির বিষয়ে জনৈক জেনারেল শিক্ষিত ভাই এর সাথে কথা বলতে যেয়ে বা আমার সাথে এক ধরণের তর্কের সময় বললেন এই শব্দে কালিমাটি বুখারী ও মুসলিমে আছে। অনিচ্ছাসত্বেও একদিন সময় করে মুল হাদীছগ্রন্থ (৬-৯ খানা হাদীছ গ্রন্থ) এবং তার নির্ঘণ্ট গ্রন্থ আলমুজামুল মুফাহরিস নিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না। শুধু কালিমার শুদ্ধ শব্দাবলীই পাওয়া গেছে যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরবর্তীতে একদিন এমন একজন আলিমের সাথে সাক্ষাৎ হল জ্ঞান গরিমায় যাঁকে আমার চেয়ে উঁচু স্তরের মনে করি। কারণ তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ.ডি. পাশ করেছেন। তাঁকে অধিক আস্থা অর্জনের জন্য জিজ্ঞাসা করলাম لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله এই শব্দে কোন হাদীছে বর্ণিত বা উল্লেখিত হয়েছে। তিনি আরবীতে বললেন: هذا لا يقوله إلا جاهل এই শব্দে কালিমাহ কোন জাহিল ছাড়া কেউ বলতে পারে না। এটি যে একটি ভুল বাক্য তা ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝা যায়।

কালিমার উপরোক্ত ভুল বাক্যটিকে শুদ্ধ করার জন্য জেনারেল শিক্ষিতদের কেউ কেউ বলেছেন। যেহেতু কালিমার মূল কথা আলাহ্র একত্ব ও মুহাম্মাদ (সা.) এর রাসূল হওয়ার ঘোষণা। তার পূর্বের শব্দগুলো সাক্ষ্যদান বা স্বীকৃতিদানমূলক। অতএব কারো কণ্ঠে উচ্চারিত না হওয়ার ক্ষেত্রে তো সেগুলো বিলুপ্ত করে বলা যায়। সুতরাং বাক্যটি কোথাও লিখার ক্ষেত্রে لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله লিখলে সঠিক হওয়ার কথা। আমি তাকে বললাম এমন বুঝ ও যুক্তির ভিত্তিতেই তো কালিমার বিশুদ্ধ বাক্যগুলোর মধ্যে শেষরূপটি ব্যাপকভাবে ছাহাবী তাবেঈ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ব্যবহার হয়ে আসছে। আর তা হলো لا إله إلا الله محمد رسول الله সাক্ষমুলক شهادة/أشهد বা স্বীকৃতি ও উদ্ধৃতিমূলক শব্দগুলো قول/قال

উঠিয়ে নিলে কালিমার পূর্ণরূপটি দাড়াবে উপরোক্ত রূপটি। প্রিয় পাঠক উপরোক্ত নিয়মে প্রক্রিয়াটি গভীর ভাবে লক্ষ্য করুন।

أشهد/شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

এই বাক্যে প্রথম শব্দটির দাবী অনুযায়ী বা কারণে পরের দু'টি শব্দ أن ও وان এসেছে। সুতরাং শব্দটি সরানোর সাথে সাথে ঐ দু'টি শব্দকেও বাধ্যতামূলক সরাতেই হবে। দু'টির কোন একটি সরিয়ে অপরটি বহাল রাখলে শরীয়তগত ভাবে দলীলশুণ্য এবং আরবীভাষাগত ভাবে বেঠিক বাক্য বলে গণ্য হবে। যাকে আরবী ভাষার বিকৃতি বলা যেতে পারে। যে কোন আরবী ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হাস্যকর হবে। সুতরাং কালিমার চিরাচরিত পরিচিত রূপটিই বিশুদ্ধ ভাবে প্রমাণিত হলো। যেটিকে সাম্প্রতিক কালে কিছু অর্বাচীন, আনাড়ী, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর মার্কা তথাকথিত গবেষক ভুল বা বেঠিক প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। অথচ এদের তথাকথিত এই গবেষণার পক্ষে স্বর্ণযুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আরবী ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন ও কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে পরিপক্ক কোন আলিমের সমর্থন নেই। আর থাকতেও পারে না। উক্ত অর্বাচীনদের গবেষণা যদি সঠিক হয় তবে বলতে হবে সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈন পূর্বাপর মুজতাহিদ আলিমগণ কুরআনের সমস্ত তাফসীর, হাদীছের অনেক কিতাব ও তার বিভিন্ন শরাহ শুরুহাত বা ভাষ্যগ্রন্থ যেমন ফাতহুলবারী, ও তুহফাতুল আহওয়াযী ইত্যাদি এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সমস্ত দলীল ভিত্তিক ও সঠিক ইসলামী গ্রন্থরাজী সব ভুল ও বেঠিক প্রমাণিত হয়। প্রায় প্রতিটি তাফসীরে لا إله إلا الله محمد رسول الله এর উল্লেখ আছে। হাদীছের গ্রন্থে ও ভাষ্যগ্রন্থেও মুহাদ্দিছগণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ ছহীহ বুখারীঃ ছহীহ বুখারীর একটি হাদীছের ব্যাখ্যায় অন্যান্য হাদীছের বর্ণনাঃ খয়বরের যুদ্ধ চলাকালে (বিজয় বিলম্বিত হচ্ছিল দেখে) নবী (সা.) একদিন বলেছিলেনঃ

لاعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله -

رقم 4219 -4210

আমি অবশ্যই আগামী কাল এমন এক ব্যক্তির হাতে এই পতাকাখানা তুলে দিব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহকে ভালবাসে

এবং তার রাসূলকে (সা.) এবং আল্লাহও তাকে ভালবাসে এবং তার রাসূলও। ছহীহ বুখারী, হাদীছ ৪২০৯ ও ৪২১০।

পাঠক বৃন্দ, এ হাদীছে যে পতাকার বর্ণনা এসেছে এ পতাকার রং কি ছিল এবং তাতে কি লিখা ছিল সেটা যদি সন্ধান করতে যাওয়া যায় তবে বিতর্কিত বিষয়ে সমাধান হয়ে যায়। এ সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১। বুখারীর সর্বোৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে ভাষ্যকার আল্লামাহ ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) উক্ত হাদীছের পূর্ণাংশ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে: عن أبي هريرة وزاد مكتوبا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله আবু হুরাইরা (রা.) থেকে এ হাদীছের বর্দ্ধিত অংশ বর্ণিত হয়েছে। সেই পতাকায় লেখা ছিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আলাহর রাসূল। – বুখারীর ভাষ্য ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড পৃঃ ৫৪৫।

২। ইবনু সাইয়িদুন্নাস তার বিখ্যাত গ্রন্থ "উয়ূনুল আছার" গ্রন্থে লিখেছেন : وروى أبو الشيخ ابن حبان من حديث ابن عباس قال: مكتوبا بأعلي رايا‌ته لا إله إلا الله محمد رسول الله আবুশ শাইখ ইবনু হিব্বান ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন ঃ নবী (সা.)-এর সমস্ত পতাকার উপরাংশে لا إله إلا الله محمد رسول الله " লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ" লিখা ছিল। – ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯।

৩। তিনি আরো একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন:

أن الحافظ أبو محمد الدمياطى قال قال أبو يوسف ابن الجوزي: روى أن لواءه أبيض مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله

ইবনুল জাওযী বলেন যে, নবী (সা.) যুদ্ধের পতাকা ছিল সাদা রং এর এবং তাতে লিখা ছিল "লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ"।

(উয়ূনুল আছার ২/২৯৯)।

আরো দেখুন আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়াহ ফী ফাতহিল বারী ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৫৩।

কোন কোন বর্ণনা মতে পতাকার রং কালো পাওয়া যায়। (cÖv¸³ 2/265)|

উপরোক্ত হাদীছ বা বর্ণনা সমুহের অনুসরণে বর্তমান সৌদী আরবের পতাকায় : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখা রয়েছে। একটা

আরবী ইসলামী রাষ্ট্র যে দেশে নির্ভরযোগ্য আলিমে ভরা সে রাষ্ট্রের পতাকায় খামখেয়ালী করে বিনা দলীলে বাক্যটি লিখা হয়নি যেমনটি অর্বাচীন অনুপযুক্ত জনৈক হাস্যকর গবেষকদের ধারণা ।

দ্বিতীয়তঃ ছহীহ মুসলিমঃ ছহীহ মুসলিমের একটি অধ্যায়ে বা পরিচ্ছেদে সংকলক বলেছেন :

باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

লোকদের সঙ্গে যুদ্ধের আদেশের বর্ণনা যতক্ষণ তারা না বলে " লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। †`Lyb Qnxn gymwjg (Aviex Qvcv c„t 684)

উল্লেখ্য যে, কোন হাদীছ সংকলক কখনই হাদীছের প্রতিকুল অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ রচনা করেন না । বিকৃত মস্তিস্ক ছাড়া কেউ এমন ধারণা করতে পারে না ।

তৃতীয়তঃবিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে কালিমার বা কালিমাহ্ ত্বইয়িবাহর শব্দাবলীর মধ্যে " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এর অন্তর্ভূক্তি ।

এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন আলাল্মাহ আইনুল বারী আলিয়াবী সাহেব । গ্রন্থখানার কলেবর ছোট হওয়ায় হুবহু দ্বিতীয় পরিশিষ্টতে উল্লেখ করা হলো ।

পরিশিষ্ট – ২

কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর শব্দাবলী

– হাফিয আইনুল বারী আলীয়াভী

আল-কুরআনের তের পারায় সূরা ইবরাহীমের ২৩ নম্বর আয়াতে একটি শব্দ আছে ঃ – কালিমাতান ত্বইয়িবাহ । আয়াতটি এই –

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ

অর্থাৎ তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কিভাবে কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ (পবিত্র বাণী) এর উপমা দিয়েছেন । তা একটি পবিত্র গাছের মত । যার শিকড় প্রতিষ্ঠিত এবং ওর শাখা প্রশাখা আকাশে প্রসারিত ।

১ । উক্ত আয়াতে বর্ণিত كلمة طيبة " কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ" শব্দটির ব্যাখ্যায় আলাম্মা মুহাম্মাদ ইবনে জরীর ত্ববারী (মৃত–৩১০হিঃ) বলেন ঃ

كلمة طيبة কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে । কেউ বলেন, ওর অর্থ ঈমানদারদের ঈমান । বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, আল্লাহর উক্তি কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর অর্থ " লা-ইলা-হা ইলাল্লা–হ-র সাক্ষ্য দেওয়া" । অন্যরা বলেন, ওর অর্থ ঈমানদার ব্যক্তি ।

– তাফসীর ত্ববারী ১৩ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা ।

২ । বিখ্যাত মুফাসসির আলাম্মা নিযামুদ্দীন আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন নিশাপুরী (মৃত ৪০৬) বলেন ঃ- ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত– معنى كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله

অর্থাৎ কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ হচ্ছে – লা ইলাহা ইলাল্লা–হ্ মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ–বলা । তাফসীরে ত্ববারী মাইমানিয়্যাহ মিসরী ছাপার টীকায় মুদ্রিত তাফসীর গরা-য়িবুল কুরআ-ন ওয়া রগা-য়িবুল ফুরকান, ১৩ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা ।

৩ । আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ কুরতুবী (মৃত ৬১৭ হিঃ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ হচ্ছে লা-ইলা-হা ইলাল্লা–হ । দুই তাবেঈ মুজাহিদ ও ইবনে জুরাইজ বলেন, কালিমায়ে

ত্বইয়িবাহ হল–আল-ঈমান। আতিয়াহ আওফী ও রবী ইবনে আনাস বলেন, তা হচ্ছে স্বয়ং ঈমানদার ব্যক্তি। তাফসীরে কুরতুবী, ৯ম খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠ।

৪। হাফিয ইবনে কাসীর (মৃত ৭৭৪ হিঃ) বলেন ঃ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ হচ্ছে – লা-ইলা-হা ইলাল্লা-হ এর সাক্ষ্য দেওয়া। তাফসীরে ইবনে কাসীর ২য় খণ্ড, ৫৩১ পৃষ্ঠা।

৫। আলাম্মা আলাউদ্দীন আলী আল-খাযিন (মৃত ৭৪১ হিঃ) বলেন ঃ কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ, তা হল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলা ইবনে আব্বাসের উক্তিতে এবং অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে। ÑZvdmx‡i Lv-whb 4_© LÊ, 33 c„ôv|

৬। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিঃ) বলেন, ইবনে জরীর ও ইবনুল মুনযির এবং ইবনে আবি হাতিম ও বায়হাকী তাঁর আল-আসমা ওয়াস সিফাত গ্রন্থে হাদীছ এনেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সূত্রে। তিনি বলেন ঃ কালিমাহ ত্বইয়িবাহ হচ্ছে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেওয়া। তাফসীর দুররে মানসূর ৪র্থ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

ইবনে আবি হাতিম ক্বতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ধনী ব্যক্তিরা বহু নেকী নিয়ে গেলেন। তখন তিনি (ছঃ) বলেন, তোমার অভিমত কি? যদি কেউ দুনিয়ার সাময়িক ভোগের বস্তুর ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর সে একটার পর একটা যানে চড়ে তাহলে সে আকাশে পৌঁছতে পারবে কি? তাহলে আমি তোমাকে এমন আমলের খবর দেব না কি যার শিকড়টা যমীনে প্রতিষ্ঠিত এবং তার শাখা প্রশাখা আকাশে প্রসারিত? তুমি বলবে, লা-ইলা-হা ইলাল্লা-হু আলাহু আকবার ওয়া সুবহানালাহ ওয়াল হামদু লিলাহ দশবার, প্রত্যেক নামাযের পরে। অতএব ওটাই হল সেই (কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ) যার শিকড়টা যমীনে প্রতিষ্ঠিত এবং তার শাখা প্রশাখা আকাশে প্রসারিত। ঐ ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৭। আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃত ঃ ১৩০৭ হিঃ) বলেন, অধিকাংশ আলিমের মতে কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা। কিংবা প্রত্যেক ভালকথা যেমন তসবীহ (সুবহানালাহ) ও তাহমীদ (আলহামদু লিলাহ) এবং ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) বলা, আর তওবাহ এবং দু'আ করা। একথা বলেন আল্লামা যামাখশারী।

তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, ৫ম খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা ।

৮ । আল্লামা সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আলূসী (মৃত ১২৭০ হিঃ) বলেন ঃ– কালিমায়ে ত্বইয়িবার ভাবার্থ হচ্ছে– লা-ইলা-হা ইলাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেওয়া । যেমন বায়হাকী ও অন্যান্যরা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন । আসাম্মের মতে আল-কুরআন । কারো মতে আল্লাহর গুণকীর্তন । কারো মতে ভাল কথা । অন্যের মতে সবরকম নেকীর কাজ । কারো মতে ঈমানদার ব্যক্তি । তাফসীরে রূহুল মাআ-নী, ১৩ খণ্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা ।

৯-১০ । ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (মৃত ৫১৬ হিঃ) এবং আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী সূরা ইবরাহীমে বর্ণিত কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ শব্দের পরের আয়াত ২৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত একটি শব্দ আলক্বওলুস সা-বিত” এর ব্যাখ্যায় বিনা সুত্রে বলেন, তা হলো কালিমায়ে তাওহীদ । আর তা হল – লা ইলাহা ইলাল্লা–হ বলা । তাফসীরে মাআ-লিমুত তানযীল, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা ও তাফসীরে মাযহারী ৫ম খণ্ড, ১৩ পারা ১৬ পৃষ্ঠা ।

১১ । অন্যদিকে আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ নাসাফী (মৃত ৭১০ হিঃ) বলেন ঃ আলক্বওলুস সাবিত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ । তাফসীরে নাসাফী, ১ম খণ্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা ।

১২-১৩ । আল্লামা যামাখশারী (মৃত ৫৩৮ হিঃ) ও আল্লামা আবুস সউদ (মৃত ৯৮২ হিঃ) বিনা বরাতে বলেন, কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ ওটাই হল কালিমায়ে তাওহীদ । – তাফসীরে কাশশা-ফ, ২য় খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কাবীরের টীকায় মুদ্রিত তাফসীরে আবুস সউদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা ।

উপরে বর্ণিত ১৩টি তাফসীর গ্রন্থের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল-কুরআনের সূরা ইবরাহীমের ২৪ নম্বর আয়াতে বর্ণিত – কালেমায়ে ত্বইয়িবাহর অর্থে বহু মতভেদ আছে । সূত্র সহকারে বর্ণিত বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাসের মতে তা হল – লা ইলাহা ইলাল্লা–হ এর সাক্ষ্য দেওয়া । তাফসীরে ত্ববারী, ১৩ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা ।

বিনা সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ হচ্ছে – লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ । Zvdmx‡i Mivwqeyj KziAvb 13 LÊ, 135 c„ôv|

সূত্র সহকারে বর্ণিত প্রসিদ্ধ তাবেঈ ক্বাতাদাহ (রাঃ) এর মতে কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ হচ্ছে – প্রত্যেক নামাযের পর দশবার বলা লা-ইলাহা ইলাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ ।

Zvdmx‡i Be‡b Kvmxi, 2q LÊ, 531 c„ôv, Zvdmx‡i `yi‡i gvbm~i 4_© LÊ 142 c„ôv|

বিশিষ্ট তাবেঈ আল্লামা মুজাহিদ ও ইবনে জুরাইজের মতে কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ এর অর্থ ঈমান । আর দুই তাবেঈ আতিয়্যাহ আওফী ও রবী ইবনে আনাসের মতে কালিমাহ ত্বইয়িবাহর ভাবার্থ ঈমানদার ব্যক্তি ।

তাফসীরে কুরতুবী ৯ম খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা ।

উক্ত সাহাবী ইবনে আব্বাসের মতে কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর ভাবার্থ একরকম । আর চারজন তাবেঈ-র মতে কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর ভাবার্থ দু'রকম । উক্ত এক সাহাবী এবং চারজন তাবেঈ ছাড়া বাকী তাফসীর শাস্ত্রবিদ বিদ্বানদের মতে কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর ভাবার্থ আরো ছয় রকম ।

উপরের বর্ণনায় এটাও জানা যায় যে, মুহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগাভীর তাফসীর অনুযায়ী – " ক্বওলুস সাবিত" এর অপর নাম কালিমায়ে তাওহীদ । আর বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা যামাখশারী ও আল্লামা আবুস সউদের মতে কালিমায়ে ত্বইয়িবারই অপর নাম কালিমায়ে তাওহীদ । আর এক বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা নাসাফীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী ক্বওলুস সাবিত এর অপর নাম কালিমায়ে তাওহীদ এবং কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ । আর তা হচ্ছে – লা ইলা-হা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ।

তাফসীরে নাসাফী ১/ ৬৫১ পৃষ্ঠা ।

কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর সাথে কালিমাতুত তাওহীদের সম্পর্ক

আল-কুরআনের ২৬ পারায় সূরা ফাতহের ২৬ নম্বর আয়াতে একটি শব্দ আছে – " কালিমাতুত তাক্বওয়া । আয়াতটির একটি অংশ এই ঃ–

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ

অর্থাৎ আর তিনি তাদের (মুমিনদের) সাথে " কালিমাতুত তাক্বওয়া – (আল্লাহ ভীতির বাণীটি) অপরিহার্য্য করে দিয়েছেন । এমতাবস্থায় তারাই ছিল ওর অধিকতর যোগ্য এবং ওর উপযুক্ত ।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত كلمة التقوى "কালিমাতুত তাক্বওয়া" শব্দটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রকম তাফসীর পাওয়া যায় । যেমন ইমাম তিরমিযী তাঁর

বর্ণনাসূত্রে এক সাহাবী উবাই ইবনে কা’ব পর্যন্ত মিলিয়ে বলেন। নবী (ছঃ) থেকে বর্ণিত, ওয়া আলযামাহুম কালিমাতাত ত্বাকওয়া–র ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীছটি একমাত্র আলহাসান ইবনে কাযাআহ ছাড়া আর কোন সূত্রে নবী (ছঃ) পর্যন্ত পাইনি। তিরমিযী ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

তাই এই হাদীছটি জোরদার নয়। কারণ ইমাম তিরমিযী এটাকে সহীহ গরীব কিংবা হাসান গরীব বলেননি।

আল্লামা ইবনে জারীর ত্ববারী তাঁর বর্ণনা সূত্রে বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) পর্যন্ত মিলিয়ে বলেন ঃ আবু হুরাইরা সায়িদ ইবনুল মুসায়্যিবকে খবর দেন যে, রসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন ঃ – আল্লাহ বলেনঃ

كلمة التقوى

তা হল লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ। তাফসীরে ত্ববারী, ২৬ খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

কালিমাতুত তাক্বওয়ার ব্যাখ্যায় আলী (রাঃ) থেকে দু’রকম উক্তি পাওয়া যায়। তাহল ঃ (১) লা-ইলাহা ইলাল্লাহ। (২) লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়ালাহু আকবার। ঐ প্রথমোক্ত ৬০ পৃষ্ঠা।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, তাহল লা-ইলা-হা ইলাল্লাহু এর সাক্ষ্য দেওয়া। আর এটা হল কালিমাতুত তাক্বওয়াহ। আর তাক্বওয়াহ তথা আল্লাহ ভীরুতার জড়। H, cÖ_‡gv³ 60-61 c„ôv, Zvdmxi Be‡b Kvmxi, 4_© LÊ, 195 c„ôv|

বিশিষ্ট চারজন তাবেঈ মুজাহিদ, আমর ইবনে মাইমুন, যাহহাক ও ইকরামাহ প্রমুখের মতে কালিমায়ে তাইয়েবাহ হচ্ছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ঐ, প্রথমোক্ত ৬১ পৃষ্ঠা।

আলাম্মা কুরতুবী বলেন, দুই সাহাবী আলী ও ইবনে উমার (রাঃ) থেকে কালিমায়ে তাক্বওয়াহর ব্যাখ্যা দু’রকম বর্ণিত আছে ঃ

(১) লা ইলাহা ইলাল্লাহ। (২) লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়ালাহু আকবার।

(২) দুই তাবেঈ আতা ইবনে আবি রবাহ ও মুজাহিদ (রঃ) বলেন, তা হল, লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুলি-শাইয়িন ক্বদীর।

তাফসীরে কুরতুবী, ১৬ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, মাআ-লিমুত তানযীল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, তাফসীরে দুররে মানসুর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

বিশিষ্ট তাবেঈ আল্লামা আতা-খুরাসানী (মৃত ১৩৫ হিঃ) বলেন, কালিমাতুত তাক্বওয়াহ হচ্ছে – লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ।

তাফসীরে ত্বারী, ২৬ খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা, তাফসীরে খাযিন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, তাফসীরে দুররে মানসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

আল্লামা কুরতুবী বলেন, আতা খুরাসানী – মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ – শব্দগুলো বাড়তি বলেছেন। তাফসীরে কুরতুবী, ১৬ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

হাফিয ইবনে কাসীর বলেন আল্লাম ইবনে জরীর বিশিষ্ট তাবেঈ ইমাম যুহরী থেকে একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, কালিমায়ে তাক্বওয়া হচ্ছে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ শব্দগুলো ইমাম যুহরীর কথায় বাড়তি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

আল্লামা যামাখশারী বলেন, কালিমায়ে তাইয়িবাহ হচ্ছে বিসমিল্লাহির রাহমানির অথবা মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ। তাফসীরে কাশশাফ ৩য় খণ্ড ৪৬৮ পৃষ্ঠা।

আল্লামা নাসাফী ও আল্লামা আবুস সউদ বলেন কালিমায়ে তাক্বওয়াহ হল কালিমায়ে শাহাদাত। তাফসীরে নাসাফী, ২য় খণ্ড, ৫৭৬ পৃষ্ঠা, তাফসীরে আবুস সউদ, ৭ম খণ্ড, ৭৪৫ পৃষ্ঠা।

আল্লামা আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন, কালিমায়ে শাহাদাত হলো – লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ। আর এটাই হলো কালিমায়ে তাকওয়াহ।

আল-ইকলীল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা।

ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, কালিমায়ে তাক্বওয়াহ হচ্ছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। ওঁদের মধ্যে কিছু লোক বাড়িয়ে বলেছেনঃ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। আবার কেউ কেউ বাড়িয়ে বলেছেন ওয়াহদাহু লা- শারীকা লাহু। আর যুহরী বলেন, তা হচ্ছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। তাফসীর ফাতহুল বায়ান, ৯ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।

২। বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরাহ এবং দুই বিশিষ্ট তাবেঈ ইমাম যুহরী ও আতা খুরাসানীর ব্যাখ্যানুসারে কালিমায়ে তাক্বওয়া হচ্ছে – লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪/১৯৫ পৃষ্ঠা,

তাফসীরে ত্ববারী, ২৬ খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা, তাফসীরে বাগাভী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, তাফসীরে খাযিন ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কুরতুবী ১৬ খণ্ড ১৬০ পৃষ্ঠা।

৩। দুই বিশিষ্ট সাহাবী আলী ও ইবনে উমার (রাঃ) এর মতে তা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালাহু আকবার। তাফসীরে কুরতুবী ১৬ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৪। দুই বিখ্যাত তাবেঈ আতা ইবনে আবী রবাহ ও মুজাহিদের মতে তা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুলি-শাইয়িন ক্বদীর। তাফসীরে বাগাভী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, তাফসীরে দুররে মানসূর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

৫। ইমাম যুহরীর মতে তা হলো বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, ৯ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।

৬। আবার কারো মতে তা হল কালিমায়ে শাহাদাত।

তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, ৭ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।

উপরে বর্ণিত নয়জন বিশিষ্ট তাফসীর বিশারদ কালিমায়ে তাক্বওয়ার ছয় রকম ভাবার্থের কোন একটি ভাবার্থকে তাঁদের কেউই জোর দিয়ে বলেননি যে, অমুক ভাবার্থটি সঠিক। তাই সেটা প্রাধান্যযোগ্য হবে। অধিকাংশের মতানুসারে কালিমায়ে তাক্বওয়া যেমন লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ হতে পারে। তেমনি তা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও হতে পারে।

ইতিপূর্বে তাফসীরী বর্ণনা অনুসারে একথা পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে, কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ ও কালিমায়ে তাক্বওয়াহর তাফসীরী ব্যাখ্যায় দু'টি ভাবার্থের মধ্যে মিল আছে। আর তা হল ঃ– (১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং (২) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। আর এই দুই কালিমার বাকী ভাবার্থগুলোতে মিল নেই। তাই ভাবার্থের দিক দিয়ে কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ ও কালিমায়ে তাক্বওয়াহকে যদি একে অপরের কাছাকাছি মনে করা হয় তাহলে উভয়েরই ভাবার্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিংবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ গ্রহণ করলে অসুবিধা কোথায়? আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী কালিমায়ে তাক্বওয়ার ভাবার্থে একটি মাত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তা হল – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

তাফসীরে জালালাইন ৪২৩ পৃষ্ঠা।

হাদীছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ভাবার্থ

বিশিষ্ট সাহাবী আনাসের বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে যে বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর তার হৃদয়ে যবের ওজন সমান ভালও আছে। আর সে ব্যক্তিও জাহান্নাম থেকে বের হবে যে বলেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু । আর তার হৃদয়ে অনুর ওজন সমান ভালও আছে। বুখারী শরীফ, মিসরী ছাপা, ১৪ পৃষ্ঠা।

উক্ত হাদীছে কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার কথা আছে। ওতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ শব্দগুলো নেই। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, কেউ যদি শুধুমাত্র লা ইলাহা ইলাল্লাহু বলে এবং সে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ না বলে তাহলে সে উক্ত হাদীছ অনুসারে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?

এর জওয়াবে হাদীছ শাস্ত্রে "দুনিয়ার হাফেয" যাকে বলা হয় সেই আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এখানে রসূলুল্লাহর উল্লেখ নেই কেন? তার জওয়াব হচ্ছে, এর ভাবার্থ দুটোই। এর প্রথম অংশ দ্বারা দ্বিতীয় অংশ আপনাআপনি বোঝা যায়। যেমন তুমি বলে থাক, আমি – "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" – পড়েছি। এর ভাবার্থ ঐ সূরার প্রথম আয়াতটি পড়েছি নয়, বরং গোটা সুরাটিই আমি পড়েছি। ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা।

তেমনি উক্ত হাদীছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কে প্রচলিত ভাবে সংক্ষেপে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা হয়েছে।

যে ব্যক্তি মরতে যাচ্ছে এমন ব্যক্তিকে তালক্বীন করার ব্যাপারে আবু সায়ীদ খুদরীর বর্ণনা নবী (ছঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের মরণাপন্ন ব্যক্তিকে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তালক্বীন কর। মুসলিম, মিশকাত ১৪০ পৃষ্ঠা।

মুআয ইবনে জাবালের বর্ণনায় রসুলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যার শেষ বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবু দাউদ, মিশকাত ১৪১ পৃষ্ঠা।

উক্ত দু'টি হাদীছ সহ অন্যান্য বহু হাদীছ যাতে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু র উল্লেখ আছে, সে সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারীতে বলেন ওর ভাবার্থ কালিমায়ে শাহাদাতের দু'টি বাক্য। অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লামা যাইনুবনুল মুনীর বলেন লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলাটা এমন এক উপাধি যা শরীয়তগতভাবে লা ইলাহা ইলাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ দু'টি সাক্ষ্যরই জন্য বলা হয়।

তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী বলেন, যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্যটি বলে সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা হয় না। তখন আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, ঐ ব্যক্তি মুসলিম হবে না। আমাদের কোন কোন সাথী বলেন, সে মুসলিম হবে কিন্তু তার কাছ থেকে (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলার) অন্য সাক্ষ্যটিও দাবী করতে হবে। এর দলীল হল নবী (ছঃ) এর উক্তি – আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি লোকদের সাথে ততক্ষণ লড়াই চালাই যতক্ষণ না তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যখন তারা এটা বলবে তখন তারা আমার তরফ থেকে তাদের রক্ত ও মালধনগুলো বাঁচিয়ে নিবে। এই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলাটাকে অধিকাংশ আলিমগণ দু'টি বাক্যের সাক্ষ্যের উপরে প্রয়োগ করেন। এমতাবস্থায় দুটির মধ্যে একটি বাক্যের উল্লেখ থাকলেও অন্যটির অভাব বোধ করা হয় না। কারণ উভয় বাক্যের মধ্যে সংযোগ আছে এবং ওদের প্রসিদ্ধিও আছে। নববীকৃত শারহে মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, উসমান (রাঃ) এর বর্ণনার রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মারা গেল। এমতাবস্থায় সে জানতো লা ইলাহা ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যই নেই) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম, মিশকাত ১৫ পৃষ্ঠা।

তারপর তিনি বলেন, এখানে ভাবার্থ দু'টি সাক্ষ্য। দু'টির মধ্য হতে একটির সাক্ষ্য নয়। যেমন এই হাদীছটিতে আছে। কারণ তাওহীদের জন্য রসূল হবার সাক্ষ্যটিও জরুরী। এখানে প্রথম বাক্যটা দ্বিতীয় বাক্যের সাক্ষ্য দেওয়ারই শিরোনামা। আর এটাতো অত্যাধিক প্রসিদ্ধ কথা। সেজন্য দুটোর মধ্যে একটির উল্লেখকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। তাই উক্ত হাদীছে একটি বাক্য বললেও ওর ভাবার্থ দু'টি বাক্য। আদদীনুল খালিস ৭৮ পৃষ্ঠা।

তিনি আরো বলেন, মুআয বিন জাবালের বর্ণিত মারফূ হাদীছে আছে মাফাতীহুল জান্নাতি শাহাদাতু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুসনাদ আহমাদ।

অর্থাৎ জান্নাতের চাবি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু র সাক্ষ্য দেওয়া ।

মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত ১৫ পৃষ্ঠা ।

এই হাদীছেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-র উল্লেখ নেই । অথচ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্যের উপরে জান্নাত পাওয়াটা নির্ভরশীল । আদদীনুল খালিস ৭৮ পৃষ্ঠা ।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু যরের বর্ণনায় নবী (ছঃ) বলেন, এমন কোন বান্দা নেই যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে । তাপর সে ওর উপরেই মরে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে......... । বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১৪ পৃষ্ঠা ।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ আলামা উবায়দুলাহ রহমানী বলেন, এখানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর উল্লেখ নেই । কারণ এটা জানা কথা । ওটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা ছাড়া কোন ফায়দা দেয় না ।

মিরআত ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা ।

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন হাদীছে যেখানে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার কথা আছে সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ওর ভাবার্থ একটি বাক্য নয়, বরং দু'টি বাক্য । আর তা হল লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ । যেমন হাদীছ বিশারদ মহাবিদ্বান হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ইমাম নববী, আলামা সিদ্দীক হাসান খান, আলামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, আল্লামা উবায়দুল্লাহ রহমানী (রহিমাহুমুল্লাহ) সাহেবগণ বলেছেন । ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, নববী শারহে মুসলিম ১ম খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা, আদদীনুল খালিস ৭৭ ও ৭৮ পৃষ্ঠা, তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড ১২৭ পৃষ্ঠা, মিরআতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড ৯৪ পৃষ্ঠা ।

কুরআন ও হাদীছের বর্ণনায় কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ

আল-কুরআনে কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর শব্দবালীর নাম করে কোন শব্দের উল্লেখ নেই যে, তা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটি বাক্য না লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ দু'টি বাক্য?

তেমনি রসূলুল্লাহ (ছঃ) থেকে কোন হাদীছেও একথা পরিস্কার উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, কালিমায়ে ত্বইয়িবার শব্দাবলী শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটি বাক্য না ওর সাথে মিলিত আর একটি বাক্য মুহাম্মাদুর রাসূলুলুল্লাহ?

থাকলো সাহাবায়ে কিরাম থেকে কালিমায়ে তাইয়িবাহর ব্যাখ্যা ।

সাহাবীদের ব্যাখ্যায় কালিমায়ে তাইয়্যিবার শব্দাবলী

বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাসের বাখ্যায় কালিমায়ে ত্বইয়িবাহর ভাবার্থ হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সাক্ষ্য দেওয়া ।

তাফসীর ত্ববারী, ১৩ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা, তাফসীর ইবনে কাসীর ২য় খণ্ড, ৫৩১ পৃষ্ঠা, তাফসীরে দুররে মুনসুর ৪র্থ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, তাফসীরে রূহুল মাআনী ১৩ খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা ।

উক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ইবনে আব্বাসের মতে কালিমায়ে তইয়িবার শব্দাবলী হয় – আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু । অবশ্য বিনা সনদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত কালিমায়ে ত্বইয়িবার শব্দাবলী হচ্ছে – লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ । Zvdmx‡i Mvivwqeyj KziAvb, 13 LÊ, 135 c„ôv|

ইবনে আব্বাস ছাড়া আর কোন সাহাবী থেকে কালিমায়ে ত্বইয়িবার ব্যাখ্যায় কোন রকম শব্দাবলী বর্ণিত আছে কিনা আমি আগে বর্ণিত ১৩টি তাফসীর গ্রন্থে খুঁজে পাইনি ।

তাবিঈদের ব্যাখ্যায় কালিমায়ে তাইয়্যিবাহর শব্দাবলী

বিশিষ্ট তাবেঈ আল্লামা কাতাদাহর ব্যাখ্যায় কালিমায়ে তাইয়্যিবাহর শব্দাবলী হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া সুবহানাল্লাহু ওয়াল হামদু লিলাহ । তাফসীর দুররে মানসুর ৪র্থ খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা ।

অন্য কোন তাবেঈ থেকে কালিমা তাইয়িবাহ এর শব্দাবলী সম্পর্কে কাতাদাহ বর্ণিত উপরোক্ত শব্দগুলো ছাড়া আর কোন শব্দ আমি খুঁজে পাইনি ।

তাফসীর কারকদের মতে কালিমা তাইয়্যিবাহর শব্দাবলী

বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা যামাখশারী ও আলামা আবুস সউদের মতে কালিমা তাইয়্যিবাহর অপর নাম কালিমায়ে তাওহীদ । তাফসীরে কাশশাফ, ২য় খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, তাফসীরে আবুস সউদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা ।

ইমাম বাগাভী ও আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথীর মতে – আল ক্বওলুস সাবিত (প্রতিষ্ঠিত কথা) এর অপর নাম কালিমায়ে তাওহীদ । তাফসীরে বাগাভী, ৪র্থ খণ্ড ৩৫ পৃষ্ঠা, তাফসীরে মাযহারী ৫ম খণ্ড, ১৩ পারা, ১৬ পৃষ্ঠা ।

আল-কুরআন ও হাদীছে কালিমায়ে তাওহীদ এর নাম করে কোন শব্দাবলী আমার নযরে পড়েনি। থাকলো তাফসীরবিদ মহাবিদ্বানদের অভিমত। তা দু'রকম পাওয়া যায়। ইমাম বাগাভী ও আলাম পানিপথীর মতে কালিমায়ে তাওহীদের শব্দাবলী হচ্ছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ঐ প্রথমোক্ত, ৩৫ পৃষ্ঠা, ঐ শেষোক্ত ১৬ পৃষ্ঠা।

আর আল্লামা নাসাফীর মতে কালিমায়ে তাওহীদ ও কালিমায়ে ত্বইয়িবার শব্দাবলী হচ্ছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

তাফসীরে নাসাফী ১ম খণ্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা।

মোটকথা সাহাবী ও তাবেঈ এবং অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ তথা কালিমায়ে তাওহীদ এর শব্দাবলী দু'রকম। (১) তা হল একটি বাক্য – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (২) অন্য মতে তা হল দু'টি বাক্য লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ।

আল-কুরআন ও হাদীছে রাসূলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটি বাক্য বহু জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দু'টি বাক্য একসাথে কুরআনে ও রসূলুল্লাহ এর হাদীছে বিশুদ্ধ সূত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দু'টি বাক্য একসাথে সাহাবী ও তাবেঈদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত দুটি বাক্য একসাথে উল্লেখ করলে তা ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ হয় কিনা সে ব্যাপারে কিছু লোক আপত্তি করেন। তাই এবার সেই আলোচনা করা হল।

কালিমায়ে তাইয়্যিবাহর দু'টি বাক্যের ব্যাকরণগত আলোচনা

যাঁদের মতে কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ। তা হল দু'টি বাক্য (১) লা ইলাহা ইলালাহ এবং (২) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে দুটি বাক্যকে এক সাথে মেলাতে গেলে দু'টির মাঝখানে একটি সংযোগ অব্যয় অবশ্যই চাই। তাই কালিমায়ে তাইয়্যিবার বাক্যটি হওয়া উচিত – লা ইলাহা ইলালাহ ওয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অন্যথায় দু'টি বাক্যের মাঝে ওয়াও" শব্দ না থাকলে বাক্যটি নাকি ব্যাকরণগত ভাবে ভুল?

এর উত্তরে বলা হয় যে, কখনো বিনা সংযোগ-অব্যয়ে দু'টি বাক্যকে একসাথে বলা বৈধ। যেমন মুহাদ্দীস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফে বা-বু উমুরিল ঈমা-ন পরিচ্ছদে আল-কুরআনের দু'টি আয়াত লিখেছেন। কিন্তু ঐ দু'টি আয়াতের মাঝে তিনি কোন সংযোগ- অব্যয় লেখেননি। তিনি প্রথমে লিখেছেনঃ

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(সূরা বাক্বারাহ: ১৭৭) 177

তারপর তিনি লিখেছেন – 1 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (সূরা মু'মিনুন :১) আয়াতটি।

বুখারী ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

উক্ত পরিচ্ছেদটির ব্যাখ্যায় হাদীছ শাস্ত্রের মহাবিশারদ আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন এখানে ইমাম বুখারী বিলা আদাতি আত্‌ফ অর্থাৎ বিনা সংযোগ অব্যয়ে দু'টি আয়াতকে উল্লেখ করেছেন। এরূপ সংযোগ অব্যয়টাকে বাদ দেওয়া বৈধ। ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা।

ঐরূপ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এরপরে ওয়া" অব্যয় বাদ দিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলাটাও বৈধ। তা আপত্তিকর নয়। ঐ দু'টি বাক্য বিনা সংযোগ অব্যয়ে লিখলেও ওর অর্থে কোন রকম হেরফেরও হয় না। যেমন ঐ দু'টি বাক্যের অর্থ হচ্ছে – আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। মুহাম্মাদ আলাহর রাসূল তথা দূত।

কোন কোন আলিম নাকি বলেন, উক্ত দু'টি বাক্যের মাঝে ওয়াও" না দিয়ে দু'টি বাক্যকে একসাথে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখলে কিংবা বললে তা বিদআত ও শির্ক হবে। কারণ রসূলুল্লাহ (ছঃ) এর কোন হাদীছেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ শব্দগুলো একসাথে পাওয়া যায় না।

ঐসব আলিমদের উত্তরে বেনারস জামিআহ্ সালাফিয়্যাহর দুই মুফতী মাওলানা আব্দুস সালাম মাদানী ও মাওলানা রয়ীস নদভী সাহেবদ্বয় বলেনঃ– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলাটাকে বিদআত ও শির্ক সেই সব আলিমরা বলেন যারা বিকৃত প্রকৃতি হবার কারণে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি ও অর্ন্তদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। কারণ তাঁরা যদি হাদীছ ও তাফসীরগুলোর পড়াশুনা করতেন তাহলে তাঁরা এত দুঃসাহসিকতার সাথে এরূপ প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে বিদআত ও শির্ক বলতেন না। বেনারসের মাসিক উর্দু, মুহাদ্দিস পত্রিকা, জানুয়ারী, ১৯৯৬ সংখ্যা, ৩৬ পৃষ্ঠা।

সেইসব লোকেরাই ঐরূপ আপত্তি করতে পারেন যাঁরা আরবদের বাকরীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, অপরিচিত এবং নিরেট মুর্খ। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা – আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুস সালাম আস সুফরী রচিত গ্রন্থ নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুন্তাখাবুন নাফায়িস আন-আখবারিস স্বলিহীন – মিসরী ছাপার ১২ম খণ্ডে এবং আল্লামা আবুল কাসিম সাইফ বেনারসী (রহঃ) এর রামযূল জামরাতাইন আলা শা-কি কালিমাতিশ শাহাদাতাইন গ্রন্থে আছে। ঐ সংখ্যা, ৩৭ পৃষ্ঠা।

কেউ যদি বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-র অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ছাড়া আর কেউ কোন মাবুদ নেই তাহলে তাকে বিকৃত-প্রকৃতি" এবং পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবা যাবে কি? আল্লাহ ঐরূপ ধারণা পোষণকারীদের সুমতি দিন–– আমীন!

উত্তম যিকরের শব্দাবলী

বিখ্যাত সাহাবী জাবিরের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেনঃ– আফযালুয যিকরি লা ইলাহা ইলাল্লাহ অর্থাৎ সর্বোত্তম যিকর (আল্লাহর স্মরণ) হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই) এবং সর্বোত্তম দু'আ হচ্ছে আলহামদু লিল্লাহ (সবরকম প্রশংসা আল্লাহর)। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২০১ পৃষ্ঠা, নাসায়ী ইবনে হিব্বান, মুসনাদে বাযযার, মিরআতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা, মুস্তাদরিকে হাকেম ১ম খণ্ড, ৪৯৮ ও ৫০৩ পৃষ্ঠা।

উক্ত হাদীছটিতে বর্ণিত– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাক্যটির সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্যটি মেলাবার কথা কোন সাহাবী ও তাবেঈ বলেননি। তেমনি কোন মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরও বলেননি। যেমন তাঁরা কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ ও কালিমায়ে তাক্বওয়াহর শব্দে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ কে মিলিয়ে বলেছেন। যেমন তাঁরা এর আগে বর্ণিত হাদীছগুলোতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কেও গণ্য করেছেন।

বিখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, একবার মুসা (আঃ) বলেছিলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে তুমি এমন একটি জিনিষ শিখিয়ে দাও যদ্বারা আমি তোমাকে স্মরণ করি। কিংবা ওর দ্বারা আমি তোমাকে ডাকি। তখন আল্লাহ বললেন, হে মুসা! তুমি বল, লা ইলাহা ইলালাহ। অতঃপর মুসা বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তোমার প্রত্যেক বান্দাই তো একথাটা বলে? আমার কেবলমাত্র ইচ্ছা এমন জিনিষের শিক্ষা দেয় যদ্বারা তুমি আমাকে বিশিষ্ট কর। তখন আল্লাহ বলেন, হে মুসা! সাতটি আকাশমণ্ডলী এবং ওর বাসিন্দা আমি ছাড়া, আর সাতটি জমীন যদি একটি পাল্লায় রেখে দেওয়া হয় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কে যদি অন্য পাল্লায় রেখে দেওয়া হয় তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু র পাল্লাটি ঝুকে যাবে।

শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ২০১ পৃষ্ঠা।

উক্ত হাদীছটিতেও কোন সাহাবী ও তাবেঈ এবং কোন মুহাদ্দীছ ও ফকীহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ শব্দগুলো মেলাতে বলেননি। তাই আল্লাহর যিকরের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে হবে। ওর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মোটেও বলতে হবে না। কেউ যদি আল্লাহর যিকরেও বলে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাহলে ঐরূপ বলাটা তার মনগড়া বলা হবে। তা হাদীছ সম্মত হবে না এবং কুরআন ও হাদীছ বিশারদদের ফতওয়া সম্মত হবে না। আল্লাহ কালিমায়ে তাওহীদ ও উত্তম যিকরের শব্দাবলীর মধ্যে পার্থক্য না কারীদের পার্থক্য করার সুমতি দিন – আমীন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু সংক্রান্ত একটি বিতর্কিত হাদীছ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, আদম (আঃ) যখন ভুল করেন তখন নিজের মাথাটাকে আরশের দিকে তুলেন। তারপর তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা

ভিক্ষা চাচ্ছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে কি? তখন আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠান। মুহাম্মাদ কি? এবং মুহাম্মাদ কে? তখন আদম (আঃ) বলে, তোমার নাম বৃদ্ধিময়। তুমি যখন আমাকে সৃষ্টি করেছিলে তখন আমি আমার মাথাটা তুলে তোমার আরশের দিকে দেখছিলাম। সেখানে লেখা ছিল। – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ফলে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, তোমার নিকটে তাঁর চেয়ে বেশী মর্যাদাশীল আর কেউ নেই যাঁর নামটাকে তুমি নিজের নামের সাথে রেখেছো। অতঃপর আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী করলেন, হে আদম! সে তো তোমারই সন্তানদের মধ্যে থেকে শেষ নবী এবং তাঁর উম্মতরাই সর্বশেষ উম্মত তোমার সন্তানদের মধ্যে। আর সে যদি না হতো তাহলে হে আদম! আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।

ত্ববারানী সগীর, ২০৭ পৃষ্ঠা, দিল্লী, আনসারী ছাপা।

আল্লামা নুরুদ্দীন হাইছামী বলেন, এ হাদীছটি ত্ববারাণী আওসাতেও আছে। এর সূত্রে এমন কিছু বর্ণনাকারী আছেন যাঁদেরকে আমি চিনি না।

মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮ম খণ্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা।

বিখ্যাত শাফেঈ বিদ্বান আল্লামা তাকিউদ্দীন সুবকী বলেন, ইমাম হাকিম এই হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। তাই আমরা তাঁর বিশুদ্ধ বলার উপরে ভরসা করিছি। শিফাউস সাকাম ১৩৫ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা।

আল্লমা যুরক্বানী বলেন, এই হাদীছটি আবুশ শাইখ এবং হাকিমও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আল্লামা সুবকী ও আল্লামা বাকেল্লানী এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার শারহে যুরকানী ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা, পুর্বোক্ত মাসিক মুহাদ্দীছ ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা।

উক্ত হাদীছটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দু'টি বাক্য একই সঙ্গে হাদীছে পাওয়া যায়। উক্ত হাদীছটি দু'ই বিখ্যাত সাহাবী উমার ইবনুল খাত্তাব এবং ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। আর তা তাবারণী স্বগীর ত্ববারণী আওসাত এবং মুসতাদরেকে হাকিমে বর্ণিত এবং ইমাম হাকিমের জ্ঞানে হাদীছটির সূত্র বিশুদ্ধ আর আলাম্মা সুবকী, আলাম্মা যুরকানী এবং আল্লামা বালকীনীর বিবেকে হাদীছটি সূত্র আপত্তিমূলক নয়।

কিন্তু ওঁদের সবারই বিরোধীতায় বর্তমান যুগের মহা-মুহাদ্দিছ আলামা নাছিরুদ্দীন আলবানী সাহেব বলেন ঃ– উক্ত হাদীছটি ছহীহ্ নয় বরং জাল হাদীছ। এটিকে ইমাম হাকিম তাঁর মুস্তাদরেকের ২য় খণ্ড, ৬১৫ পৃষ্ঠায়, এবং ইবনে আসাকির তাঁর তারিখের ২/৩২/২ পৃষ্ঠায় আর বায়হাকী দালায়িলুন নবুওয়্যতে বর্ণনা করেছেন।

সিলসিলাতু আহাদিছিয যয়ীফাহ ওয়াল মাউযুউআহ ১ম খণ্ড, ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা।

আলবানী সাহেব বলেন, ঐ হাদীছটির এক বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে মুসাল্লাম ইবনে রুশাইদ। যার সম্পর্কে ইবনে হিব্বান বলেন, ঐ লোকটি হাদীছ জাল করার দোষে দুষ্ট। তাই হাদীছটি জাল।

লিসানুল মিযান ৩য় খণ্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা।

হাফিয যাহাবী বলেন, ঐ হাদীছটির এক বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ বাজে বর্ণনাকারী। তাই হাদীছটি জাল। মিযানুল ইতিদাল ২য় খণ্ড।

আলবানী সাহেব আরো বলেন, ইমাম হাকিম তাঁর রচিত "আল-মাদখাল ইলা-মারিফাতিস স্বহীহি মিনাস সাক্বীম" গ্রন্থে বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম নিজ পিতা থেকে বহু জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। পূর্বোক্ত সিলসিলাহ ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

এতদসত্ত্বেও আল্লামা যাহিদ কাওসারী বলেন, এই হাদীছটির এক বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ দুর্বল বর্ণনাকারী হলেও হাদীছটি জাল নয়। কারণ, তাঁকে মিথ্যা দোষে দুষ্ট বলা হয়নি। বরং অহম অর্থাৎ সন্দেহ দোষে দুষ্ট বলা হয়েছে। এরূপ অহম দোষে দুষ্ট কিছু হাদীছ ও গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ ৪১ পৃষ্ঠা।

উক্ত বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, আদম (আঃ) এর দেখা আল্লাহর আরশে লেখা– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ – সংক্রান্ত হাদীছটি বির্তকিত হাদীছ। ইমাম হাকিম ও আলামা সুবকী এবং আল্লামা যুরকানী ও আল্লামা বালকানী আর বর্তমান যুগের আল্লামা যহিদ আলকাওসারীদের মতে উক্ত হাদীছটির সূত্র বিশুদ্ধ ও আপত্তিমুক্ত। তাই তাঁদের মতে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ – দু'টি বাক্যের একত্রে সমাবেশ প্রমাণিত।

কিন্তু হাফিয যাহাবী ও হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও বর্তমান যুগের মহামনিষী আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সাহেবদের মতে উক্ত হাদীছটির সূত্র অতি দুর্বল ও জাল। *

সন্দেহজনক শব্দ সম্বলিত একটি হাদীছ

দুই বাংলার বিখ্যাত আলিম আলামা আব্দুলাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহঃ) তাঁর নবুওতে মুহাম্মাদী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইমাম আহমাদ আবু হুরাইরার প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষেরা যতক্ষণ পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ না বলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

ফতহুর রব্বানী সুসম্পাদিত মুসনাদে আহমাদ (১) ৯৭ পৃষ্ঠা, নবুওতে মুহাম্মাদী, ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা, মে ১৯৮৮ সংস্করণ।

> যে সব আলিম হাদীছটির সানাদ বা সুত্রকে অতি দুর্বল ও জাল বলেছেন তারা কেউই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বাক্যটিকে ভুল বলেন নি। বরং আদম (আ.) এর রসূলুলাহ (সা.) এর অসীলাহয় ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি এবং "সে যদি না হতো তাহলে হে আদম! আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।" এ অংশটি আপত্তিকর মনে করেছেন। কারণ এ দু'টি বিষয় অন্যান্য ছহীহ দলীলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু لا إله إلا الله محمد رسول الله তো কোন দলীল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত নয়। সুতরাং হাদীছটিকে যঈফ ও জাল প্রমাণ করার হলেও লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে কেউই জাল বা অশুদ্ধ বাক্য বলেননি। দেখুন সিলসিলায়ে যঈফাহ হাদীছ নং ৩৮-৪৭

আব্দুল্লাহিল কাফী (রহঃ) ফতহুর রব্বানী গ্রন্থের বরাত দিয়ে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা (রাৎ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমার কাছে বৈরুতের দারু ইয়াহইয়াতিত তুরাছিল আরাবী প্রকাশিত ১৯৯৩ সালের ছাপা নয় খণ্ডে মুসনাদে আহমাদ রয়েছে। ওর ২য় খণ্ডের ৪৫৫ থেকে ৬৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং ৩য় খণ্ডের শুরু থেকে ৩৬৫ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশো পৃষ্ঠাব্যাপী আবু হুরাইরাহ বর্ণিত হাদীছ রয়েছে। যার হাদীছের ক্রমিক সংখ্যা ৭০৭৯ থেকে ১০,৬০১। অর্থাৎ এ দুই খণ্ডে আবু হুরাইরাহ বর্ণিত ৩৫২২টি হাদীছ বর্ণিত আছে। যার প্রত্যেকটি হাদীছ আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। তন্মধ্যে – উমিরতু আন উক্বাতিলান না-সা হাত্তা ইয়াকুলু কিংবা ইয়াশহাদু শব্দের পরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু শব্দ গুলো আমি পেয়েছি। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ শব্দগুলো একটি হাদীছেও আমার নযরে পড়েনি। তাই আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী (রহঃ) উদ্ধৃত ফতহুর রব্বানীর বরাত দেওয়া পূর্বে বর্ণিত মুসনাদে আহমাদের হাদীছটিতে উল্লেখিত "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" শব্দগুলো সম্পর্কে আমি সন্দেহে পড়ে গেছি। ফলে

ঐ হাদীছটির শব্দগুলোর উপর ভিত্তি করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ্ – দুটি বাক্য একসাথে উল্লেখের দলীল প্রমাণিত হচ্ছে না ।

সারকথা

কালিমায়ে ত্বইয়্যিবাহ নাম করে কোন শব্দের উল্লেখ আল-কুরআনে নেই এবং রসূলুল্লাহ (ছঃ) এর হাদীছেও তা প্রত্যক্ষভাবে নেই ।

বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে কালিমায়ে ত্বইয়্যিবার ভাবার্থ হচ্ছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ – এর সাক্ষ্য দেওয়া । তাফসীর ত্ববারী, ১৩ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা, তাফসীর ইবনে কাসীর ২য় খণ্ড ৫৩১ পৃষ্ঠা, তাফসীর দুররে মানসুর ৪র্থ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা ।

অর্থাৎ – "আশহাদু আন লা ইলাহা ইলালাহ্"– বলা । আর অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে ইবনে আব্বাসের উক্তিতে কালিমায়ে ত্বইয়্যিবাহ হচ্ছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা । তাফসীরে খাযিন ৪র্থ খণ্ড , ৩৩ পৃষ্ঠা ।

অবশ্য বিনা সনদে ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে, কালিমায়ে ত্বইয়্যিবার ভাবার্থ হচ্ছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা ।
তাফসীরে গরায়িবুল কুরআন ১৩ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা ।

চারজন বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন ইমাম বাগাভী, আলামা যামাখশারী, আল্লামা নাসাফী ও আল্লামা আবুস সউদ –এর মতে– আল ক্বউলুস সাবিত, কালিমায়ে তাওহীদ এবং কালিমায়ে ত্বইয়্যিবাহ সবই এক জিনিষ । আর আল্লামা নাসাফীর মতে তা হল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহুম্মাদুর রাসূলুলাহ্ । তাফসীরে নাসাফী ১ম খণ্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা ।

কুরআনে বর্ণিত শব্দ –" কালিমায়ে তাক্বওয়ার" ভাবার্থে দু'টি মত অধিক প্রসিদ্ধ । (১) লা ইলাহা ইলালাহ্ । তিরমিযী, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা ।

এবং (২) লা ইলাহা ইলালাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ্ ।

তাফসীরে ত্ববারী ২৬ খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা, তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড ১৫৯ পৃষ্ঠা, তাফসীরে বাগাভী ও খাযিন ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কুরতুবী ১৬ খণ্ড ১৬০ পৃষ্ঠা ।

বিভিন্ন হাদীছে যেখানে কেবলমাত্র – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শব্দগুলোর উল্লেখ আছে সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওর ভাবার্থে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্যটিও উহ্য আছে । হাদীছ বিশারদগণ তাই বলেন । ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড ১২৭ পৃষ্ঠা, নববী শরহে মুসলিম ১ম খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা, আদদীনুল খালিস ৭৭ পৃষ্ঠা, মিরআতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড ৯৪ পৃষ্ঠা ।

ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একটি হাদীছে আছে, নবী (ছঃ) আব্দুল কাইস গোত্রের এক প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ– ---

অর্থাৎ তোমরা কি জান একমাত্র আল্লাহর উপরে ঈমান আনাটা কি জিনিষ? তারা বললো, আল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়া ।
বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১৩ পৃষ্ঠা ।

উক্ত হাদীছটিতে একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ কি? এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ র সাক্ষ্য দেওয়া বলেননি । বরং একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– বলারও সাক্ষ্য দিতে বলেছেন। তাই কালিমায়ে ত্বইয়্যিবার ব্যাখ্যায় মহামান্য সাহাবী ইবনে আব্বাসের উক্তি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এরও সাক্ষ্যও উহ্য আছে ।

ফলে মহামান্য সাহাবী আবু হুরাইরাহ ও দুই বরেণ্য তাবেঈ ইমাম যুহরী ও আতা খুরাসানীর ব্যাখ্যানুযায়ী – লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ দু'টি বাক্যকে বিনা সংযোগ অব্যয়ে বলতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না ।

মুহাদ্দীস সম্রাট ইমাম বোখারী (রহঃ) তদীয় বুখারী শরীফে আল-কুরআনের দু'টি সুরার দু'টি আয়াতকে বিনা সংযোগ-অব্যয়ে লিখেছেন। ঐরূপ লেখাটাকে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানীর মত মহামনীষী আরবী ব্যাকরণগত ভুল বলেননি, বরং তা বৈধ বলেছেন । (ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা) । অতএব লা ইলাহা ইলাল্লাহু-র বাক্যটির পর বিনা সংযোগ অব্যয় ওয়াও ছাড়া মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ বাক্যটি বলা ব্যকরণগত ভুল নয় বরং অর্থের দিক দিয়েও আপত্তিকর নয় ।

ফলে বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রাহ (মৃত ৫৮ হিঃ), প্রসিদ্ধ দুই তাবেঈ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরী (মৃত–১২৪ হিঃ) ও আতা খুরাসানী (মৃত ১৩৫ হিঃ), প্রসিদ্ধ মুফাসসির আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ নাসাফী (মৃত ৭১০ হিঃ), হাদীছ শাস্ত্রের হাফেযুদ দুনিয়া ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত ৮৫২ হিঃ), হিজরী তের শতকের মুজাদ্দিদে উলুম ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃত ১৯৫৩ ইং), বিশিষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা উবায়দুর রহমান মোবারকপুরী ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ পণ্ডিত আলামা আব্দুলাহিল কাফী আল-কুরাইশী (মৃত ১৯৬০ইং)সহ অগণিত মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরে কুরআনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যাখ্যানুযায়ী কালিমায়ে ত্বইয়্যিবার শব্দাবলী হচ্ছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ।

লা ইলাহা ইলাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ বলার সাক্ষ্য

সাহাবী আনাসের বর্ণনায় নবী (ছঃ) তাঁর আরোহীর সাথে মুআযকে বলেন, এমন কোন ব্যক্তিই নেই যে খাঁটি মনে এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউই নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর দুত তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেবেন।

বোখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪ পৃষ্ঠা।

উবাদাহ ইবনে সামেত বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউই নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেবেন। মুসলিম, মিশকাত ১৫ পৃষ্ঠা।

উক্ত দু'টি হাদীছ সহ বহু হাদীছ প্রমাণ করে যে, কেউ কেবলমাত্র লা ইলাহা ইলাল্লাহ বলল তার জন্য আলাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন না বরং তাকে ওর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও বলতে হবে।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট – ৩

সংশয় নিরসন

ভাসমান জ্ঞানের অধিকারী এবং অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর মার্কা কিছু আলিম এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত বাংলা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মন্তব্য করেন এটি মাযহাবীদের কালিমাহ আবার কেউ বলে হানাফীদের কালিমাহ, কেউ বলে বিদআতী কালিমাহ এমনকি শিরকী কালিমাহ বলেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। সম্ভবত: তারা এমন মন্তব্য করে থাকেন জনাব আব্দুল্লাহ ফারুক রচিত বই "আক্বীদার মানদণ্ডে ইসলামের মূলমন্ত্র "কালিমাহ ত্বইয়িবাহ" কোন বাক্যটি?" নামক বই পড়ে প্রভাবিত হয়ে। কিছুক্ষণ পরে এ বইয়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এছাড়াও তাদের কেউ কেউ কুরআনের একটি আয়াতের মস্তিস্ক প্রসূত বুঝ ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়ে এমন মন্তব্য করে থাকে।। সে আয়াতটি হচ্ছে:

وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আলাহ্‌রই অতএব আল্লাহর সাথে আর কাউকেউ আহবান করো না। – সূরা আল-জ্বীন আয়াত ১৮।

এটির সমার্থবোধক আরেকটি আয়াত এ সূরাতেই রয়েছে:

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُو رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً }

বলুন, কেবলমাত্র আমি আমার রবকেই ডাকি তার সাথে আমি কাউকেই শরীক করি না। – সূরা আল-জ্বীন: আয়াত ১০।

এ আয়াতটি দ্বারা বলা হয় যে, "লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" একটি শিরকী বাক্য। এতে মুহাম্মাদ (সা.)কে আল্লাহর সমকক্ষ বা সমপর্যায়ভূক্ত বা শরীক করা হয়েছে। জানি না কি অর্থ বুঝে এই কালিমায় মুহাম্মাদ (সা.)কে আল্লাহর শরীক বানানো হয় বা আল্লাহর সাথে ডাকা হয়। কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরে এরূপ ব্যাখ্যার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। এ যাবৎ আরবী ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন নির্ভরযোগ্য কোন আলিমকে এ বাক্য ভুল বলতে শিরকী অর্থ সম্পন্ন বাক্য বলতে শুনিনি। আল্লাহর রাসূল (সা.) এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এ কালিমার ব্যবহার হয়ে আসছে। অথচ কেউ এটিতে কোন ক্রুটি ধরতে পারে নি। আর আজ কোন আলিম নয়, অথবা ইলমের মাপকাঠিতে কোন ক্রমেই আলিম বলা চলে না বা বলা উচিত নয় এমন কতেক ব্যক্তি এ বাক্যের ভুল ধরতেছে।

আমার নিজের জ্ঞানেও কোন ভুল বা ক্রুটি দেখি না।

নবী (সা.) এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আরবী গ্রামার ও আরবী ভাষীদের বুঝ অনুযায়ী যে অর্থে কালিমাটি ব্যবহার হয়ে আসছে তা হলো আরবীতে لا إله بحق أو حق إلا الله محمد رسول الله অর্থ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আলাহ্‌র রাসূল।

এ অর্থে অবশ্যই এটি তাওহীদী বাক্য। মূলত: এখানে দু'টি বাক্য একত্রভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। অথচ এক কালিমাই বলা হয়। যেমন ভাবে أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله এটিকেও কালিমাহ বা একটি কালিমাহ ই বলা হয়। আমাদের দেশে এটিকে কালিমায়ে শাহাদাত বলা হয় অথচ এর ভিতর দু'টি বাক্য রয়েছে। আরবী ভাষায় কয়েকটি বাক্যকেও একটি কালিমাহ বলা হয়। যেমন কুরআনে আল্লাহ পাকের বাণী দেখুন

حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ * لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

অর্থ এমনকি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু চলে আসে তখন সে বলে: হে আমার রব আমাকে ফিরিয়ে দিন নিশ্চয়ই আমি সৎ আমল করব যা বিগত সময়ে করিনি। কখনই নয়, এটি তার একটি কালিমাহ বা কথামাত্র যা সে আওড়াচ্ছে....। সূরা আল-মুমিনুন: আয়াত ৯৯-১০০।

সম্মানীত পাঠক, দু'টি আয়াতের বক্তব্যকে একটি কালিমা বলা হয়েছে। তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দুটি বাক্য হলেও একটি কালিমাহ বলা অশুদ্ধ হবে কেন?

এবং সূরা আল-জ্বীন এর আয়াতের আসল তাফসীর দেখুন: ইবনু কাছীর রহঃ বলেন, বিখ্যাত তাবেঈ কাত্বাদাহ বলেন:যখন ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের নিজ নিজ উপাসনালয়ে যেত তখনও আল্লাহর সাথে শিরক করতো। তাই আলাহ্ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে মুহাম্মাদ (সা.)এর মাধ্যমে তার উম্মাতকে তাদের ইবাদাত খানা তথা মসজিদসমূহে আল্লাহর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করা থেকে সতর্ক করেছেন। †`Lyb Zvdmxi Be‡b KvQxi Aviex 4_© LÊ c„t 432|

তারপর লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ্ তো আহবানমূলক বাক্য নয়। এটি তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণা বা স্বীকৃতিমূলক বাক্য। আল্লাহর একত্বের ঘোষণার সাথে সাথে মুহাম্মাদ (সা.) এর রিসালাতের ঘোষণা দেয়াই তো কালিমার মর্ম কথা। ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

পরিশিষ্ট – ৪

"কালিমাহ ত্বইয়িবাহ কোন বাক্যটি"

বইয়ের পর্যালোচনা

পৃথিবীর পূর্বাপর সমস্ত আলিম ও সমস্ত ইসলামী গ্রন্থরাজীতে " লা ইলাহা ইলালাহ মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ" বক্তব্য ও লিখনীতে ব্যবহার করেছেন ও করছেন। কারণ এটি ইসলামের কালিমা যা ইসলামের প্রথম রূকন এর মূল ভাষা বা কথা। যার স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য দেয়ার জন্য শুরুতে ও মাঝে বাড়তি শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন قال/قول বলা شهادة أن সাক্ষ্য দেয়া যে, أشهد أن আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, يشهد أن সে সাক্ষ্য দেয় যে, حتى

يشهدوا যতক্ষণ সাক্ষ্য না দেয় যে, ইত্যাদি শব্দ যোগ করে বলতে হয়। আর যদি কারো মুখ দ্বারা উচ্চারণ, ঘোষণা, সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি দেয়া না হয় তাহলে সে শব্দগুলোর কোনটিই শুরু ও মাঝে হবে না।

যেমন আমি যদি পতাকায় লিখি অথবা তাওহীদ বাণী হিসাবে সাইনবোর্ডে বা মসজিদে লিখি তাহলে উপরোক্ত শব্দগুলোর কোনটিই ব্যবহার করা যাবে না। তার কারণ পতাকা বা সাইনবোর্ড তো বলবে না যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, বা স্বীকৃতি দিচ্ছি। সুতরাং সে ক্ষেত্রে لا إله إلا الله محمد رسول الله লিখতে ও বলতে হবে। অথবা কাউকে যদি বলি তুমি "কালিমাহ" তথা لا إله ألا الله محمد رسول الله এর সাক্ষ্য বা স্বীকৃতি দাও তাহলে সে উত্তরে বলবে أشهد أن لا إله ألا الله وأن محمدا رسول الله

বইখানা পর্যালোচনা করতাম না যদি এর ব্যাপক অপপ্রভাব লক্ষ্য না করতাম। আজকে অনেক সাধারণ মুসল্লী (আহলে হাদীছ সমাজে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কে বাত্বিল কথা মনে করে। এমনকি এটিকে ছহীহ ও বাত্বিল আক্বীদার মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যত বড় আলিম হোক না কেন এই বাক্যে কালিমাহ উচ্চারণ করলেই অনেক সাধারণ পাবলিক বলে এ আলিমের আক্বীদাহই ভ্রান্ত।

১। মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রচারিত কালেমা বা কালিমাহ ত্বইয়িবাহ لاإله إلا الله محمد رسول الله কুরআন মাজীদ এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কিনা তা জানার জন্য সারা বিশ্বের ৪৭ জন ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকের নিকট প্রশ্ন পাঠিয়েছেন উল্লেখিত পুস্তকের লিখক জনাব আব্দুল্লাহ ফারুক। তাদের মধ্যে ৪জন উত্তর দিয়েছেন। আবার অনেকেই এ বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করছেন বলে তাকে উত্তর দিয়েছেন। যে চার জন উত্তর দিয়েছেন তাদের কেউই তার কাঙ্খিত জবাব দেন নি। তবে সৌদী আরবের শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহ ইরশাদ এর প্রধান শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) যে উত্তর দিয়েছেন তাকে লেখক তার পক্ষের জবাব মনে করেছেন। নিজে তাঁর কোন শব্দের ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে জবাবটিকে তার পক্ষে টেনে আনার চেষ্টা চালিয়েছেন। অনেক পাঠক হয়ত মনে করেছেন যে, তিনি (বিন বায) সাহেব লেখকের সমর্থনমূলক জবাব দিয়েছেন।

লেখক যে শব্দ বা বাক্যের "অর্থাৎ" বলে ব্যাখ্যা করেছেন তা হল – "কালিমাহ ত্বইয়িবাহ হল "লা ইলাহা ইলাল্লাহ" অর্থাৎ لا إله إلا الله محمد رسول الله (লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্যটি একটি পবিত্র কথা (كلمة طيبة) নহে।" দেখুন পৃষ্ঠা ৭৯। (আণ্ডার লাইনের কথাগুলো লেখকের নিজের)

অথচ লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন যে, স্থায়ী কমিটি لا إله إلا الله محمد رسول الله লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যটি সম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য করেন নাই। পৃষ্ঠা ৮০।

কারণ এটি মন্তব্য উর্ধ্ব বাক্য।

২। কালিমাহ ত্বইয়িবাহ কোন্ বাক্যটি " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" নাকি " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার প্রতি আলিমগণের গুরুত্ব ও আগ্রহ না থাকারই কথা। কারণ এ প্রশ্নটা একেবারে কালিমার শাব্দির বিষয়। আর কালিমাহ ত্বইয়িবার শব্দ ব্যাপক ও অনেক। যেমন পরিশিষ্টের শুরুতে উল্লেখ করেছি। আলিমগণ কালিমার অর্থ, মর্ম ও তার নির্দেশনা অনুযায়ী করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় আলোচনার প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যেমন আমাদের বক্ষমান গ্রন্থেও তাই করেছি।

৩। লেখক তার বইটিকে প্রশ্নপত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর বইয়ের নামকরণ থেকেও তাই বুঝা যায়। তিনি জানতে চেয়েছেন কোন বাক্যটিকে কালিমাহ ত্বইয়িবাহ বলা হয় বা বলতে হবে? অথচ এ বিষয়ে উত্তর না আসার আগেই নিজে নিজে এর একটা জবাব ঠিক করে তার ভিত্তিতে বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা বলেছেন। যারা তার বাগড়ম্বরতা আঁচ করতে পেরেছেন তারা বেশ কঠোর ভাষায় তার জওয়াব দিয়েছেন। এবং তিনি সে জওয়াবে অনেক কষ্ট পেয়েছেন তাও লিখেছেন।

৪। আমার ১০০% বিশ্বাস, যে ৪৭ জনের নিকট চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন যে " কালিমাহ ত্বইয়িবাহ" কোন বাক্যটি? তারা যদি জানতেন যে, এ প্রশ্নের অন্তরালে লেখক আব্দুল্লাহ ফারুক সাহেব "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কে ভুল বা বেঠিক বা শিরকী বাক্য মনে করেন। তাহলে সবাই উত্তর দিয়ে বলতেন আপনি বাত্বিল আক্বীদাহ পন্থী ও মনোবৃত্তির পুজারী। তিনি যদি এ কথার সত্যতা যাঁচাই করতে চান তাহলে

ঐ ৪৭ জনের নিকট এভাবে প্রশ্ন পাঠাক? لا إله إلا الله محمد رسول الله একটি ভুল বাক্য কিনা? বা এটা কি একটি ভুল বাক্য নয়? জানিয়ে বাধিত করবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ৪৭ জনই তাকে পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ ছাড়া অন্য কোন মন্তব্য করবেন না, করতে পারেন না।

৫। উল্লেখিত বই খানা আমার জীবনে প্রাপ্ত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আশ্চর্যজনক ও বিরল প্রকৃতির বই। যে বই কোন বিষয়ে গবেষণা করে লেখক এমন সিদ্ধান্ত বা ফয়সালায় উপনীত হয়েছে যে তার সাথে নবী (সা.) এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কোন আলিমের সমর্থন নেই। বই এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার বিরল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট গবেষণার বিপরীত ও বিরোধী কথাবার্তা ও তার প্রবক্তাদের উল্লেখ করেছেন এবং তার মনোবৃত্তি নিঃসৃত জবাব দিয়েছেন। বইখানা আফসোস বিজড়িত ও দুঃখজনক বটে। কারণ হক্ব উদঘাটনের উদ্দেশ্যে গবেষণা করতে যেয়ে ১০০% না হক্ব-ই তার ভাগ্যে জুটেছে। এমনই হয় যথাযথ ও পর্যাপ্ত ইলম ছাড়া গবেষণার ফলাফল। কারণ কুরআন ও হাদীছের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী নির্ভরযোগ্য আলিম ছাড়া দ্বীনি বিষয়ে গবেষণা অনুমোদনযোগ্য নয়। কুরআন হাদীছ বুঝার যোগ্যতা না রেখে শুধু ধার-কর্জ করে ও একে ওকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে আহরিত তথ্যের ভিত্তিকে গবেষণা করা চলে না।

৬। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কে কালিমা ত্বইয়িবাহ " পবিত্র বাক্য" বলার অর্থ এটা নয় যে, এ বাক্যটি ছাড়া আর কোন পবিত্র বাক্য নেই। যেমনটি বিতর্কিত বই- এর লেখক বুঝেছেন। তার এ সংকীর্ণ বুঝের প্রমাণ তার বইয়ের নাম " কালিমাহ ত্বইয়িবাহ কোন্ বাক্যটি" মানে একটি বাক্য সেটা কোনটি অর্থাৎ যেমনটি তিনি لا إله الا الله কে কালিমাহ ত্বইয়িবাহ" বলার দলীল পাওয়ার কারণে لا إله إلا الله محمد رسول الله "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ"কে কালিমাহ ত্বইয়িবাহ বলার আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে ওটাকে ভুল বাক্য বা অপবিত্র শিরকী বাক্য বলেছেন। কি অদ্ভূত ও উদ্ভট বুঝ???।

নবী (সা.) এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কোন আরবী ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আলিম " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কে অপবিত্র বাক্য বলেনি বলতে পারবেও না। ইলমী কথা এই যে, ইবাদাত প্রধানত ৪

প্রকার (১) মৌখিক উচ্চারণগত (২) অন্তরের ইবাদত (৩) বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের ইবাদাত ও (৪) মালি বা সম্পদগত ইবাদাত ।

মৌখিক উচ্চারণগত সকল ইবাদাতকে পবিত্র বাক্য বা আরবীতে الكلم الطيب বা كلمة طيبة বলা হয় ।

আল্লাহ বলেন

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

তাঁর দিকে উঠে যায় (উত্থিত হয়) সকল পবিত্র বাক্য এবং সৎ আমলকেও তিনি উঠিয়ে থাকেন । (সূরা ফাতির : ১০)

ইবনু কাসীর (রহ.) বলেন

يعني الذكر والتلاوة والدعاء – قاله غير واحد من السلف

অর্থাৎ একাধিক সালাফি সালেহীন বলেছেন পবিত্র বাক্যসমূহ বলতে উদ্দেশ্য আল্লাহর যিকর কুরআন তিলাওয়াত ও দুআ ।

কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য " কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ" পবিত্র বাক্য । উক্ত আয়াতের ভিত্তিতেই বহু আলিম-উলামা দুআ ও যিক্র আযকারের গ্রন্থ সংকলন করে নামকরণ করেছেন الكلم الطيب পবিত্র বাক্যসমূহ । যেমন– ইবনু তাইমিয়া (রহ.) সংকলিত গ্রন্থ " আল-কালিমুত ত্বইয়িব" ।

হাদীছেও নবী (সা.) বলেছেন

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا -

নিশ্চয়ই আলাহ্ তইয়িব - পবিত্র । তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু পছন্দ করেন না । (মুসলিম) । তারপর পবিত্র বস্তুর বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে । খানা ত্বইয়িব, রিযক ত্বইয়িব, ইত্যাদি । এ হাদীছে ত্বইয়িব এর বিপরীতে হলো হারাম । অর্থাৎ যা কিছু হারাম নয় তাই ত্বইয়িব । সুতরাং যেহেতু কোন দলীলে لا إله إلا الله محمد رسول الله "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলা নিষেধ বা হারাম বলা হয়নি । বরং বিভিন্ন ছহীহ, যঈফ বর্ণনায় এ শব্দ বিশিষ্ট কালিমাহ্ বর্ণিত হয়েছে । অতএব لا إله إلا الله محمد رسول الله " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এটিও কালিমায়ে ত্বইয়িবাহ্ সমূহের একটি ।

৭। লেখক শুধু " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কে কালিমাহ ত্বইয়্যিবা বলা এবং لا إله إلا الله محمد رسول الله কে অপ্রমাণিত বা ভুল ও শিরকী বাক্য প্রমাণ করার তালে থাকায় যাকে নিজেও কালিমাহ শাহাদাত বলে অভ্যস্ত তাকেও কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ বলে স্বীকার করে ফেলেছেন। شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله এই মর্মে স্বাক্ষ্যদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। কোন বাক্যটি? পৃষ্ঠা ৩৮, ৩৯, ৭৪ ও ৭৭।

৮। لا إله إلا الله محمد رسول الله এই শব্দে নবী (সা.) থেকে যে হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে তার সনদের অবস্থা মতভেদপূর্ণ। যেমন কেউ ছহীহ বলেছেন কেউ যঈফ বলেছেন আবার কেউ কেউ মাউযু বা জালও বলেছেন।

তবে বাক্যটিকে ভাষাগতভাবে আরবী ব্যাকরণ বিরোধী ভুল বাক্য বা শিরকী বাক্য বলে কেউই ইঙ্গিত করেন নি। তা করেছেন একমাত্র এ বিতর্কিত বই-এর লেখক আব্দুল্লাহ ফারুক সাহেব এবং তার বই এর কিছু ভক্তবৃন্দ। তবে মাওকুফ সানাদে ছহীহ, যঈফ উভয় ভাবে বিভিন্ন ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন (.... পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ছহীহ বুখারীর হাদীছের ব্যাখ্যামূলক পরস্পর সহযোগী তিনটি বর্ণনা। আবু হুরাইরা ও ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) এর খয়বরের যুদ্ধে ব্যবহৃত পতাকায় লিখা ছিল لا إله إلا الله محمد رسول الله অন্য বর্ণনাগুলো শাইখ আইনুল বারী কর্তৃক লিখিত " কালিমাহ ত্বইয়্যিবার শব্দাবলী" শীর্ষক গ্রন্থখানা দেখুন যা বইয়ের পরিশিষ্ট–২ এ হুবহু সন্নিবেশিত হয়েছে। আরো দেখুন কালিমা ত্বইয়িবাহ কোন বাক্যটি।

বেশ কিছু তাবেঈগণ থেকেও "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কালিমাহর ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন বিখ্যাত তাবেঈ যুহরী ও আত্বা আল-খুরাসানী كلمة التقوى এর তাফসীরে বলেছেন।

যদি একই বিষয়ে ছহীহ, যঈফ ও মাউযু বা জাল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহলে জাল ও যঈফ বর্ণনা অনুসারে তা অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে ছহীহ বা গ্রহণযোগ্য বর্ণনা অনুসারে আমল যোগ্য হবে। لا إله إلا الله محمد رسول الله এর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। যেমনভাবে ছলাতে

চার অবস্থায় رفع اليدين রফউল ইয়াদাইন এর ব্যাপারে ছহীহ, হাসান, যঈফ ও জাল হাদীছ সবই আছে। জাল ও যঈফ বর্ণনার কারণে রফউল ইয়াদাইন এর আমল ত্যাগ করবো? না তা করবো না বরং জাল ও যঈফ বর্ণনাগুলো বর্জন করব এবং ছহীহ বর্ণনা অনুযায়ী আমল করব।

৯। যদি ধরে নেয়া হয় যে, لا إله إلا الله محمد رسول الله নবী ছল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম থেকে ছহীহ বা কোন গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। আরবী ভাষীরা– যাকে আমরা কালিমায়ে শাহাদাত বলি তার ভাবার্থ এভাবে করেছেন। আমরা যেমন বাংলা, উর্দূ বা ইংরেজী ভাষায় কালিমার অর্থ করলে তা নবীর ভাষা (মাছূর) হয় না অথচ আমরা তাকে দোষণীয়, ভুল বাক্য শিরক বা বিদআতী বাক্য বলি না। অনুরূপ আরবী ভাষীরাও যদি ছহীহ সূত্রে বর্ণিত কালিমাহর ভাবার্থ হিসাবে " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে তবে ভূল হবে কেন? কোন বিচারে? আরবরা কি তাদের চলিত মাতৃভাষায় রাসূল (সা.) এর কোন কথা ব্যক্ত করতে পারবে না? ভাষাগত ভাবে শুদ্ধ করে ভাবার্থ ব্যবহারিক জীবনে ও বক্তব্যে ব্যবহার করার স্বাধীনতা তাদের অবশ্যই রয়েছে। তাই তো এই শব্দে কালিমাটির ব্যবহার যে কোন আরবী কিতাবে তথা তাফসীর, হাদীছের অধ্যায়, ভাষ্যগ্রন্থ, ফিক্বহ এবং ইসলামী যে কোন গ্রন্থে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এমনকি ছহীহ সূত্রে বর্ণিত অবিতর্কিত বাক্যগুলোর চেয়ে এ বাক্যটির প্রসিদ্ধি বেশী। এ ক্ষেত্রে সনদ বা বর্ণনা সূত্রের শুদ্ধাশুদ্ধির প্রয়োজনও নেই। শুধু বাক্যটির ভাষাগত ভাবে আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বিশুদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট। আর ভাষাগত ভাবে বাক্যটি বিশুদ্ধ এতে কোন সন্দেহ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈনদের যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কোন আরবী ভাষী পণ্ডিত বা অনারব কেউই বাক্যটিকে ভুল বা বেঠিক বা ভাষাগত ত্রুটির কারণে শিরকী বা বিদআতী বাক্য বলতে পারে নি ও পারবে ও না। অথচ এই ব্যক্তি বিতর্কিত বইয়ের লেখক বালাগাত আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের الوصل ও الفصل এর কিছু নিয়মাবলী কার না কার কাছ থেকে ভাসা ভাসা ভাবে তোতাপাখির বুলির মত শিখে তার আলোকে বাক্যটিকে ভুল প্রমাণ করার জন্য বেশ কিছু সাদা পাতাকে কালো করেছেন। অথচ যারা আরবী ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন তারা এই নিয়মের মাধ্যমেও প্রমাণ করেছেন যে, বাক্যটির বিন্যাস সম্পূর্ণ শুদ্ধ। বাক্যটিকে ভাষাগতভাবে বা অর্থগতভাবে ভুল বলা

পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ প্রলাপ দেখেই মনে হয় যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার সাবেক অধ্যক্ষ বালাগাত শাস্ত্রের الفصل ও الوصل এর নিয়মাবলী প্রয়োগের মাধ্যমে لا إله إلا الله محمد رسول الله বাক্যটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য একটি পর্যালোচনা আহলে হাদীছ দর্পণে প্রচার করেছিলেন। ষষ্ঠ বর্ষ ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০০২ ইং পৃঃ ৮-৯। প্রবন্ধটি পরিশিষ্ট -৫ এ দেখুন।

১০। কালিমাহ ত্বইয়িবাহ কোন্ বাক্যটি? এর নির্ণয়ের জন্য বেচারা সূদীর্ঘ ৯টি বছর ব্যয় করেছেন। এ দীর্ঘ সময়ের শ্রম ও তার বিপরীতে বাস্তবতা ও সত্যের মানদণ্ডে এর ফলাফল শূণ্যের নীচে দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছে। لا إله إلا الله محمد رسول الله বাক্যটি كلمة طيبة নয় বা বাক্যটি ভুল বা বেঠিক বা শিরকী বাক্য এসব প্রমাণের জন্য যতশব্দ, বাক্য পৃষ্ঠা লিখা হয়েছে এবং গ্রন্থাকারে ছাপাতে যেয়ে ব্যয় হয়েছে সবই বৃথা, অপব্যয় ও অপচয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আল্লাহ লেখককে ক্ষমা করুন। তার লেখাকে যথাযথ বললে পৃথিবীর আরব-অনারব সকল আলিম ও উলামা এবং কিতাবপত্রকে ভুল বলতে হবে। এটা কি বাস্তবে হতে পারে? তবে উক্ত বিষয়ে লিখতে যেয়ে যে আনুসঙ্গিক অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছেন বা সন্নিবেশন করেছেন সেগুলো অবশ্যই উপকারী। কিন্তু সেটা তো বইয়ের আলোচ্য বিষয়ই নয়। আমার ভাবতেই অবাক লাগছে একজন অনারব তাও আবার আরবী শিক্ষিত নয় সে ছাহাবী, তাবেঈর যুগ থেকে আরবীতে ব্যবহৃত বহুল প্রচারিত বাক্য যাকে সমস্ত আরবীভাষীরা ব্যবহার করে আসছে তাকে অশুদ্ধ বলে চলেছে। এটা অজ্ঞতাপূর্ণ ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

১১। কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ কোন বাক্যটি তা নির্ণয়ের যার এত গরজ ও প্রয়োজন তার কালিমায়ে শাহাদাত কোন বাক্যটি ও কালিমায়ে তামজীদ কোন বাক্যটি? এসব নির্ণয়ের প্রয়োজন হওয়ার কথা। ভাগ্যিস, এটা তার মাথায় জাগেনি। যদি জাগত তাহলে এ দুটির গবেষণায় ১০×২=২০ বছর অবশ্যই লাগত। বরং এ দু'টির জন্য একশো বছরও যদি তাকে গবেষণার সময় দেয়া হয় তাও সমাধান করতে পারবে না। কারণ لا إله إلا الله লা-ইলা-হা ইলাল্লাহু ও অন্য কোন কালিমাহকে যেমন كلمة الله বলার দলীল পাওয়া যায় أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله কে কালিমাহ্ শাহাদাত

বলার দলীল পাওয়া যায় না। অথচ উনিসহ পৃথিবীর অনেকে এটাকে কালিমাহ শাহাদাত বলেন। দয়া করে একটি আয়াত বা হাদীছ বলবেন?

১২। গবেষণা ও তার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সারা পৃথিবীর ও সর্বযুগের আলিম ওলামাগণকে ও গ্রন্থরাজীকে সাধারণভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়াও বিশেষভাবে বিশিষ্ট তাবেই যুহরী ও আত্বা খুরাসানীকে বার বার হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

এমনিভাবে ভারতবর্ষের দুজন বরেণ্য আলিমকে। পরলোকগত বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী ও মাওলানা আব্দুর রহীম (রাহিমাহুমাল্লাহু) কে।

প্রথমতঃ বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম যুহরী ও আত্বা খুরাসানীকে কটাক্ষ করার প্রতিবাদঃ অর্বাচীন গবেষক আব্দুল্লাহ ফারুক সাহেব তার পুস্তকে বিভিন্ন স্থানে কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামগণ বিশেষভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর মুসলিমগণকে মুখোমুখি ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে একাই সেজেছেন কুরআন, সুন্নাহ ও ছাহাবাগণের মর্যাদা ও ভাবগাম্ভির্যের রক্ষক। কি ধৃষ্টতাপূর্ণ ও আস্ফালনমূলক অবস্থান? অথচ নবী (ছঃ) যে তিনটি যুগকে শ্রেষ্ঠ বলে গেছেন তাতে তাবেঈগণের যুগও অন্তর্ভুক্ত। যে লোকেরা শ্রেষ্ঠ যুগের লোকদের কটাক্ষ করে তাকে গোমরাহীর যুগ ছাড়া আর কি বলা যাবে? বরং মুসলিম শরীফের একটি হাদীছ থেকে জানা যায় যে, যে যুগই পরে আসবে পূর্বের চেয়ে নিকৃষ্টতম।

জনৈক তাবেঈ বলেছেন, বিদআতীর একটি নিদর্শন হল সুন্নাহর অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করবে বা কটাক্ষ করবে।

যে সব জায়গায় কটাক্ষ করেছেন তার এক দুইটি নমুনা দেখুন ঃ

সম্মানীত পাঠক এখন আপনাদের বিবেকের সামনে আমাদের প্রশ্ন।

১। আমরা কি রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দোয়া প্রাপ্ত এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কুরআনের ভাষ্যকার সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহ আহনুর ফাতওয়া কালিমাহ তাইয়্যিবাহ كلمة طيبة অর্থ لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) এর সাক্ষ্য দেয়া গ্রহন করবো? নাকি পরবর্তী যুগেরঃ

২। ইমাম যোহরী ও আতা আল-খোরাসানী কর্তৃক কালিমাতুত তাকওয়া- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্যটির সাথে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যটি বৃদ্ধিকৃত এবং আধুনিক যুগের দারুল ইফতা বাংলাদেশ-এর মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান সাহেবের মগজ প্রসূত অর্থাৎ (আশহাদু আল লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) বাক্যটি থেকে (আশহাদু, আন, আন্না এবং ওয়াও) বাদ দিয়ে ও গোপন করে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা মত ছাট কাট করে তৈরী করা "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ" বাক্যটিকে كلمة طيبة কালিমাহ তাইয়্যিবাহ ফাতওয়া গ্রহণ করব?

–"কালিমাহ তাইয়্যিবাহ কোন বাক্যটি" পৃষ্ঠা নং ১১০।

যারা لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বাক্যটি সরল অন্তকরনে সরল চিত্তে কোন রকম কিন্তু ছাড়া (كلمة طيبة) "কালিমাহ তাইয়্যিবাহ" অর্থাৎ "একটি পবিত্র কথা" হিসেবে মেনে নিতে পারেন না বা চান না তারা প্রকৃত অর্থে

১। রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর শিক্ষা দেয়া "কালিমাতুত তাকওয়া" লা ইলাহা ইলাল্লাহ এবং কালিমাহ্ শাহাদাত "আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বাক্য দুটিকে হয় বৃদ্ধি করে অথবা কাটছাট করে বা কাটাকাটি করে " লা ইলাহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্য তৈরী করে। যেমন ইমাম যুহরী ও আতা-আল-খোরাসানী কালিমাতুত তাকওয়া "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অতিরিক্ত সংযুক্ত করে প্রকৃত অর্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা অমান্য করেছেন। ঠিক তেমনি আধুনিক যুগে দারুল ইফতা বাংলাদেশের মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান সাহেব কালিমাহ্ শাহাদাতের তিনটি শব্দ (আশহাদু, আন, আন্না) বাদ দিয়ে এবং একটি শব্দ {ওয়াও} গোপন করে " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বাক্য তৈরী করে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধীতা করেছেন কিনা? সম্মানীত পাঠকবৃন্দ আপনাদের বিবেককে প্রশ্ন করুন। –"কালিমাহ তাইয়্যিবাহ কোন বাক্যটি" পৃষ্ঠা নং ১২১।

এমনকি এক স্থানে ইমাম যোহরীর পরিচয় দিতে যেয়ে বলেছেন তিনি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শাসনকর্তা উমর বিন আব্দুল আযীযের শাসনামলে একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছিলেন।

আত্বা খুরাসানী সম্পর্কে বলেছেন : আত্বা আল- খোরাসানীও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা ছিলেন না। তিনি ইমাম যোহরীর সম সাময়িক যুগের একজন মুহাদ্দীছ ছিলেন। যেখুন ১৮৬ পৃষ্ঠা।

তাদের যেটা বড় পরিচয় সেটাই উল্লেখ করেননি। তারা দু'জনই ছিলেন বিখ্যাত তাবেঈ। **তাদের দু'জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান তুলে ধরা হলোঃ (ক) যুহরী (রঃ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও মর্যাদা ঃ** তার নাম ও কুনিয়াতঃ আবু বাকর মুসলিম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে শিহাব আয-যুহরী আল-ক্বিলাবী আল-কুরাশী। তিনি নবী (ছঃ) এর মাতৃবংশীয়। আবার পিতৃবংশীয় কুরাইশ বংশের লোকও ছিলেন। তিনি সর্ব প্রথম নবী (ছঃ) এর হাদীছ গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। তিনি হাদীছের হাফেয ও ফক্বীহ ছিলেন। তার সম্পর্কে উমার বিন আব্দুল আযীয সকল গভর্ণরদেরও বিভিন্ন আঞ্চলিক দায়িত্বশীলদের নিকট লিখিতাকারে নোটিশ পাঠিয়েছিলেনঃ

عليكم بابن شهاب' فانكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه –

তোমরা অবশ্যই ইবনু শিহাব (যুহরীর) শরণাপন্ন হবে। কেননা এ যুগে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ সম্পর্কে তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন আর কাউকে পাবে না।

তিনি ৫৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করে ১২৪ হিজরীতে সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, তিনি হাফিয ও হুজ্জা (বা দলীল)। ইবনে হাজার বলেছেন তিনি হাফিয ও ফক্বীহ, হাদীছ শাস্ত্রে সকলের ঐকমত্যে তিনি মান্যবর ও পরিপক্ক। – দেখুন তাযকিরাতুল হুফফায ১ম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা। ছিফাতুছ ছফওয়া ২য় খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা, মীযানুল ই'তিদাল ৫ম খণ্ড ১৬৫ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী ১/৩১, তাক্বরীবুত তাহযীব ৪৪০ পৃষ্ঠা।

(খ) আত্বা আল-খুরাসানীর পরিচয় ও মর্যাদা : তিনি তাবেঈ ছিলেন। জন্ম : ৫০ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৩৩ হিজরীতে। তিনি ইবনে উমার, ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ও আনাস ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক, ইবনু জুরাইজ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর বর্ণনায় হাদীছ সংকলন করেছেন। ইমাম বুখারী দু'টি হাদীছ। অনেকে তাকে আত্বা বিন আবী রাবাহও বলেছেন। যাকে ইলম ও আমলের

দিক থেকে তাবেঈগণের সর্দার আখ্যা দেয়া হয়। তবে তার নামে মুরসাল হাদীছ বর্ণনার কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। দেখুন মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪৬৭, ৪৭০, ও তাক্বরীবুত তাহযীব ৩৩২ পৃষ্ঠা।

(১) উপরোক্ত দু'জন তাবেঈ সম্পর্কে কটাক্ষ করার সুযোগ হিসাবে যে বিষয়টি বার বার উল্লেখ করেছেন তা হলো: সূরা আল-ফাতহের ২৬ নং আয়াতে উল্লেখিত "কালিমাতুত তাক্বওয়াহ" এর তাফসীরে অনেক ছাহাবী তাবেঈ এমনকি নবী (সা.) থেকেও বর্ণনা করে বলেছেন (لا إله إلا الله)

আর উপরোক্ত দু'জন তাবেঈ এর সাথে বর্ধিত করে বলেছেন (لا إله إلا الله محمد رسول الله) এটা ইমাম ইবনু কাছীর বর্ণনা করেছেন এবং কুরতুবীও বর্ণনা করেছেন। ইবনু কাছীর ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৯৭ ও কুরতুবী ৮ম খণ্ড ২০৭। আরও দেখুন কোন বাক্যটি: পৃষ্ঠা ১৮৫, ১৮৬।

জ্ঞাতব্য যে, উপরোক্ত তাফসীর কারকগণ তাদের নামে বর্ধিত বর্ণনা করলেও কোন সমালোচনা করেন নি বা বর্ধিত অংশ ভুল বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য তাও বলেন নি। বরং কোন বিরূপ মন্তব্য না করা মানেই তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিরবতার মাধ্যমে উক্ত বর্ধিত অংশ গ্রহণের একটি ইলমী রহস্য রয়েছে। যা ভাসমান জ্ঞানের অধিকারী আব্দুল্লাহ ফারুকদের জানাই যদি থাকবে তবে বোকা পণ্ডিতির ভান্ডার ঐ বই লেখতে যাবে কেন? আর কালিমা নিয়ে সাধারণ জনগণের ভিতর বিভ্রান্তি ছড়াবে কেন? হাদীছ শাস্ত্রের হাদীছ গ্রহণ ও বর্জনের অনেক নীতিমালা রয়েছে যা হাদীছ জ্ঞান চর্চা কারীদের নিকট সুবিদিত। আর অজ্ঞতার মাধ্যমে বিচার করলে তো কোন নীতির বালাই নেই বা ঐ কয়টিই নীতিমালা রয়েছে যে কয়টির নাম শুনেছি অথবা বলে ফেলবে কিসের নীতিমালা? যে সব নীতিমালা রসূলুল্লাহ দিয়ে যাননি তা মানি না। যাক, মুহাদ্দিছগণের নিকট একটি হাদীছের নীতি হল।

مذهب الجمهور فى الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر – أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا – التقييد والإيضاح ص- 111-112 و تدريت الراوى 204/1و 205

অর্থ অধিকাংশ হাদীছ বিশারদ ও ফিক্বহবিদগণের দৃষ্টিতে হাদীছের যে অংশ নির্ভরযোগ্য কোন রাবী এককভাবে বর্ণনা করেন তা অবশ্যই

গ্রহণযোগ্য। চাই সে বর্ধিত অংশ একই নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করুক অথবা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করুক। দেখুন আত- তাক্বঈদ ওয়াল ঈযাহ পৃঃ ১১১, ১১২, ও তাদরীবুর রাবী পৃঃ ২০৪, ২০৫।

এই নীতিমালা অনুসারে উপরোক্ত তাফসীরকারকগণ (ইবনু কাছীর ও কুরত্ববী) যুহরী ও আত্বা আল-খুরাসানীর উদ্ধৃতিতে বর্ধিত অংশ محمد) (رسول الله সহ لا إله إلا الله محمد رسول الله বর্ণনা করে "টু" শব্দেও বিরূপ কোন মন্তব্য করেননি। এই হলো সেই ইলমী রহস্য। আর অজ্ঞতামূলক যোগ্যতার অধিকারী আব্দুল্লাহ তাফসীরকারকগণের মন্তব্য না দেখে ফাকা মাঠে আনাড়ি খেলোয়াড়ের মত গোল মেরে দিয়ে নিজেকে খুব কৃতি ভাবছেন এবং চৌদ্দশত বছর যাবত অমিমাংসিত বিষয়ে মিমাংসা কারী ভাবছেন। কি হাস্যকর ও লজ্জাস্কর এ কৃতিত্ব। এটি নিশ্চয়ই ইলমে কলঙ্ক লেপন করতে গিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়ার শামিল।

দু'জন মান্যবর তাবেঈ কালিমাতুত তাক্বওয়া كلمة التقوى এর তাফসীরে لا إله إلا الله এর পর محمد رسول الله বৃদ্ধি করে বলাতে আর কারো নিকট নয় আব্দুল্লাহ ফারুকের নিকট বাক্যটা ভুল হয়ে গেল। যদি محمد رسول الله শব্দগুলো বা বাক্য ছাড়া অন্য শব্দ বৃদ্ধি করে বলে তাহলেও তো ভুল হওয়ার কথা। কিন্ত সে বৃদ্ধিগুলো তার চোখে পড়েনি। আসলে একতালে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্যের বিরোধীতায় মাতাল ছিলেন তাই তো অন্য বৃদ্ধিগুলোর উপর তার অজ্ঞতার অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেননি।

অন্যান্য বর্ধিত অংশগুলো লক্ষ্য করুন: (নীচে রেখা বিশিষ্ট অংশগুলো বর্ধিত)

১। আত্বা বিন আবী রবাহ বলেছেন : কালিমাতুত তাক্বওয়া হল

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير –

২। যুহরী উরওয়া থেকে এবং উরওয়া ছাহাবী আল মিসওয়ার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, كلمة التقوى হল ঃ لا إله إلا الله وحده لا شريك له পর্যন্ত।

৩। আলী ও ইবনে উমর রাযিঃ كلمة التقوى এর তাফসীরে বলেছেন :

لا إله إلا الله والله أكبر

৪। বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনু যুবাইর বলেছেন : كلمة التقوى হল لا إله إلا الله والجهاد في سبيل الله এমনকি অনেকে এমন শব্দে তাফসীর

করেছেন যাতে لا إله إلا الله বাক্যটির পরিবর্তে অন্য বাক্য দেখা যায়। যেমন

১। বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ বলেছেন কালিমাতুত তাক্বওয়া হল ইখলাস। আল-ইখলাস অর্থাৎ একনিষ্ঠতা বা একনিষ্ঠতা পূর্ণ যে কোন বাক্য বা শব্দ।

২। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক মা'মার থেকে বর্ণনা করেন তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কালিমাতুত তাকওয়া হল ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (†`Lyb Zvdmxi Be‡b KvQxi 4/192 K¡yiZex Ñ 8/207-208)

এসব বৃদ্ধির ব্যাপারে (বিরুদ্ধে) জনাব আব্দুল্লাহ কবে কলম ধরবেন?? আল্লাহ তাকে মাফ করুন ও বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে বিরত রাখুন।

অনুরূপভাবে সূরা ইবরাহীমের ২৪ নং আয়াতের শব্দ كلمة طيبة একটি পবিত্র শব্দ নিয়ে নিজে বিভ্রান্তিতে পড়েছে এবং বই লিখে শত শত ও হাজার হাজার জেনারেল শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত এমনকি নামে মাত্র কিছু আলিমকেও বিভ্রান্ত করেছেন। সেখানেও কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ বলতে যারা لا إله إلا الله বলে তাফসীর করেছেন কেবল সেই তাফসীর অনুযায়ী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাক্যের উপর ষ্টীকার লাগার মত এমন ভাবে চোখ বা দৃষ্টি লাগিয়েছেন যে, সেটা ছাড়া তার দৃষ্টিতে পৃথিবীতে (কুরআন/হাদীছে) আর কোন পবিত্র বাক্য নেই। এবং محمد رسول الله সহ لا إله إلا الله محمد رسول الله

বাক্য ছাড়া কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ বিরোধী আর কোন বাক্য নেই। কি হাস্যকর বুঝ??

অথচ ঐ আয়াতের তাফসীরেই কত প্রকার ও কত রকমের কালিমা ত্বইয়্যিবার বাক্য ও শব্দ ভাণ্ডার পাওয়া যায়। নমুনাস্বরূপ দেখুন: শাওকানী (রহ.) (১১৭৩-১২৫০ হিঃ) লিখিত তাফসীর ফাতহুল ক্বদীর গ্রন্থে বলেনঃ

وهى كلمة الاسلام : أي لا إله إلا الله' او ما هو أعم من ذلك من كلمات الخير (106/3)

অর্থাৎ কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ হচ্ছে ইসলাম এর প্রথম রুকন বলতে যা বুঝায় তথা কালিমাহ لا إله إلا الله অথবা তার চেয়েও ব্যাপক বিষয় তথা

সকল ভাল ও উত্তম শব্দাবলীই কালিমাহ ত্বইয়্যিবা বলতে উদ্দেশ্য। ৩য় খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা।

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন! আল্লামাহ শাওকানী কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহর দু'টির তাফসীর করেছেন:

(ক) "কালিমাতুল ইসলাম" ইসলামের কালিমাহ। আর প্রায় সকল মারফু হাদীছে ইসলামের কালিমাহ বলতে কালিমাতুশ শাহাদাহ-ই উল্লেখ করা হয়।

(খ) দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে ভাল শব্দাবলী অর্থাৎ শির্ক বিদআত মুক্ত যে কোন আরবী বাংলা, উর্দ্দূ, হিন্দি ও ইংরেজী সকল শব্দই কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ।

শাওকানী (রহ.) এর দ্বিতীয় প্রকার তাফসীর এর ব্যাখ্যা হিসাবে ধরা যায় আলামাহ আলুসী (১২১৭- ১২৭০) তার বিখ্যাত তাফসীর (১৬ খণ্ড বিশিষ্ট) রুহুল মাআনী তে তিনি কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহর প্রথম তাফসীর হিসাবে বলেছেন : شهادة أن لا إله إلا الله কালিমাহ শাহাদাত অর্থাৎ এই মর্মে স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতিত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই।

৩। কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ বলতে উদ্দেশ্য "আল-কুরআন"। কেননা কুরআনের প্রত্যেকটি শব্দই পবিত্র শব্দ এবং প্রত্যেকটি বাক্যই হচ্ছে পবিত্র বাক্য।

৪। দাওয়াতুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের পক্ষে দাওয়াত দেয়ার জন্য যে সব শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয় তা অবশ্যই পবিত্র। আলাহ একটি আয়াতে এভাবে ঘোষণা করেছেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

ঐ ব্যক্তির চেয়ে কথার দিক থেকে কে উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান করে এবং সৎ আমল করে আর বলে নিশ্চয় আমি মুসলিম গণের অন্তর্ভূক্ত। সূরাহ হা-মীম আয়াত ৩৩।

৫। কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ বলতে " তাসবীহ-তানযীহ" অর্থাৎ আলাহর পবিত্রতা জ্ঞাপনমূলক শব্দাবলী।

৬। আলাহর গুণকীর্তনমূলক শব্দাবলী।

৭। প্রত্যেক ভাল শব্দ ও বাক্য।

৮। আলাহ্‌র আনুগত্যমুলক সকল কথা।

৯। মু’মিন ব্যক্তিও কালিমাহ বলতে উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন ভাবে ঈসা (আ.)কে ছহীহ হাদীছে কালিমাহ বলা হয়েছে। কেননা তিনি আল্লাহর কালিমাহ বা আল্লাহর বিশেষ সিদ্ধান্তমুলক বাণী দ্বারাই সৃষ্ট। পিতা-মাতার মিলন বা বীর্য দ্বারা নয়। Ñ †`Lyb cweiewa©Z mnKv‡i i“ûj gvAvbx 8g LÊ, c„t 39|

<u>দ্বিতীয়ত ঃ বাংলাদেশের দু’জন বিজ্ঞ আলিমকে কিছু সম্মানজনক ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে শব্দগত সম্মান করলেও তথ্যগত ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।</u> তিনি লিখেছেন “বাংলাদেশের দু’জন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক এবং অনুবাদক “কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ” নামক পুস্তিকা সংকলন করেছেন যার যার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে। যেমন শ্রদ্ধেয় **জনাব আব্দুলাহিল কাফী আল-কুরায়শী এবং শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা মোহাম্মাদ আব্দুর রহীম।** আলাদা আলাদা মন মেজাজে এ বিষয়ে বই লিখেছেন। কিন্তু দু’জনের বই এর নাম “কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ”। এছাড়াও আরো অনেক আহলে হাদীছ ও হানাফী সম্প্রদায়ের আলিমদেরকে কটাক্ষ করেছেন তাদের লিখনির সাথে জড়িত করে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল, আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী তাদের নিজস্ব সহীহ নামায ও দুআ শিক্ষা। এভাবে নুরানী তা’লিমুল কুরআন ওয়াক্বফ এষ্টেট এর প্রধান শিক্ষক জনাব রহমতুল্লাহ সাহেব প্রণীত পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা নুরানী পদ্ধতি” নামক পুস্তকে কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ সম্পর্কে লিখেছেন। এভাবে স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা সহ শিক্ষা বোর্ডের ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বিষয়ক বই পুস্তকে কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়া। কোমল মতি ছোট ছোট শিশুদের ইসলামী শিক্ষার সৎ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম “কায়দা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ শিক্ষা দিয়ে থাকেন অভিভাবকগণ। যেমন “মোকাম্মাল কাওয়ায়েদে মুহাম্মাদী” ক্বাওয়ায়েদে বোগদাদী ও কাওয়ায়েদে নুরাণী।

জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল ’আলা মওদূদী সাহেব “ঈমানের হাকীকত” নামক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন যা বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহীম সাহেব। এ পুস্তকেও “কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ” সম্পর্কে

আলোচনা করেছেন। অথচ উপরোল্লিখিত ইসলামী বই পুস্তকের সংকলক ও লিখকগণ "কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ" লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ لا إله إلا الله محمد رسول الله বাক্যটি লিখেছেন। অথচ কেউই কুরআন অথবা ছহীহ হাদীছে থেকে কোন প্রমাণ পেশ করেন নি।

জবাব ঃ

আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক আরোপিত অভিযোগের জবাব নিম্নরূপঃ

যদিও তিনি নাম ধরে কিছু আলিমকে সম্বোধন করেছেন তাদের লিখিত গ্রন্থের সূত্র ধরে। আসলে এ অভিযোগ নবী (সা.) এর যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল আরব অনারব আলিম-ওলামা তথা সকল মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেন "তারা কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" বাক্যটি লিখেছেন। কিন্তু কুরআন অথবা ছহীহ হাদীছ থেকে কোন প্রমাণ পেশ করেন নি।

ইসলামের মূল স্তম্ভ বা রুকন পাঁচটিঃ কালিমাহ্, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত। প্রথম রুকন কালিমাহ যে শব্দে হাদীছে এসেছে সেটাই তো একত্রে কুরআনের কোন সূরাহ বা আয়াতে উল্লেখ নেই। বিচ্ছিন্নভাবে আছে। সূরা মুহাম্মাদে আছে لا إله إلا الله আয়াত নং ১৯ এবং সুরা আল-ফাতহে আছে محمد رسول الله আয়াত নং ২৯।

বিভিন্ন হাদীছে কালিমাহর পূর্ণাঙ্গ রূপ ও সংক্ষিপ্তরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে জিবরীল সহ অন্য যে সকল হাদীছে ইসলামের ৫টি ভিত্তির বর্ণনা এসেছে সেখানে ঐ কালিমার বর্ণনা নেই যেটিকে ইসলামের মূলমন্ত্র বলে যিকর টেনেছেন ফারুক সাহেব তার পুরো পুস্তকে। যেটা রয়েছে সেটা হলো আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" অতএব এসব হাদীছের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে لا إله إلا الله "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" كلمة طيبة "পবিত্র শব্দ" তবে بناء الاسلام ইসলামের বুনিয়াদ বা মুলমন্ত্র নয়। অবশ্য ঈমানের বুনিয়াদ হিসাবে لا إله إلا الله এর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং যেমনভাবে ইসলামের বুনিয়াদের তালিকায় كلمة طيبة لا إله إلا الله না থাকলেও ইসলামের মূলমন্ত্র বলে গণ্য তেমনিভাবে لا إله إلا الله محمد رسول الله শব্দের কালিমাটিও ইসলামের মূলমন্ত্র হিসেবে গণ্য। ইসলামের বুনিয়াদের তালিকা শীর্ষক হাদীছে এ শব্দের উল্লেখ না থাকলেও অন্য ক্ষেত্রে

এর বর্ণনা ও প্রয়োগ থাকার কারণে এটিও ইসলামের মূলমন্ত্র। কালিমার বিভিন্ন নাম ও শব্দাবলীর বর্ণনা আলোচ্য বিষয়ে উত্তম সমাধান রয়েছে। এর জন্য দেখুন অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৪। নবী (সা.) যদি এ কালেমাটি তার পতাকায় লিখে তা ব্যবহার করেন তাহলে সেটা কি নবী (সা.) থেকে সাব্যস্ত হলো না? তা ছাড়া সাহাবী তাবেঈগণের এ শব্দে কালিমার বর্ণনা তো পাওয়াই যাচ্ছে। যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচনায় এসেছে। পরিশিষ্ট ১ থেকে ৫ পর্যন্ত পড়লে এ বিষয়ে অজ্ঞতা ও সংশয় দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

১৩। কালিমাহ ত্বইয়িবাহ নামে এটা শিরকী বাক্য বলার পিছনে অনেকে এ যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, لا إله إلا الله محمد رسول الله এর মাঝে কোন বিরাম চিহ্ন নেই বা দাড়ী কমার (পৃথক করণ) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। তাই শুধু মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিছু নামে আলিম ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.)কে আল্লাহর সাথে একাকার কারী বাক্য হিসেবে শিরকী বাক্য ধারণা করে থাকেন। অর্থাৎ তাদের ইলমহীন দৃষ্টিতে উক্ত বাক্যটির মাঝে "و" ওয়াও বা "أن" আন্না দিলে কিছুটা শুদ্ধ হত।

উক্ত সংশয়ের জবাবঃ

সাধারণত: সমপর্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তুকে একত্রিত করার জন্য "و" ওয়াও অব্যয় ব্যবহৃত হয়। এই অব্যয়টির নামই হচ্ছে حرف عطف বা সংযুক্তিকরণ অব্যয়। আরবী ভাষায় এ অব্যয় ছাড়া দু বাক্য, বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য সুচিত হয় সে পার্থক্যই হয় পরিপূর্ণ পার্থক্য। সেটাই ঘটেছে لا إله إلا الله محمد رسول الله বাক্যের ভিতরে। যার ফলে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ এর মাঝে পার্থক্যের ব্যবধান আরো বেড়েছে। অথচ "উল্টা বুঝিল রাম" এর মত উল্টা এ বাক্যটিকে আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে একাকার কারী বাক্য ধারনা করে শিরকী বাক্য বলছে অজ্ঞের দল। এ জন্য বলা হয় অজ্ঞ লোকের মুখ খুলতে নেই। বাংলা ভাষাতেও এমন বাক্য আছে যদি আপনি কমা বা সংযুক্তিকরণ অব্যয় "ও" ব্যবহার করেন তাহলে শিরকী বাক্য হবে। আর যদি কমা বা সংযুক্তিকরণ অব্যয় ব্যবহার না করেন তবে শিরকী বাক্য হবে না বরং তাওহীদী বাক্য হবে। দু'টি বাক্য লক্ষ করুনঃ

১। কমা বা সংযুক্তিকরণ অব্যয় ব্যবহৃত বাক্য: "আপনার চেষ্টা ও আল্লাহর রহমতে আমি সফল হয়েছি।" শিরকী গন্ধযুক্ত একটি বাক্য।

২। কমা ও অব্যয় ছাড়া : "আপনার চেষ্টায় আল্লাহর রহমতে আমি সফল হয়েছি।"

প্রথম বাক্যে সংযুক্তিকরণ অব্যয় ব্যবহার করার কারণে শিরকের যে গন্ধ অনুভূত হচ্ছিল দ্বিতীয় বাক্যে ঐ অব্যয় বাদ দেয়াতে সেই শিরকী গন্ধ দূরিভূত হয়েছে।

একথাটাই জনাব আব্দুল্লাহ ফারুককে অনেক আরবী ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি আবরী ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু না; তাতে কোন কাজ হয়নি। তিনি তার বোকা পণ্ডিতি পুস্তকাকারে জাহির করতেই তৃপ্তিবোধ করছেন।

দেখুন দারুল ইফতা বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান কর্তৃক প্রদত্ত ফাতওয়া (কোন বাক্যটি?) পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮। আহলে হাদীস দর্পন........

ফারুক সাহেবের বইখানা পড়ে " বোকা পণ্ডিত বা পণ্ডিতি" বলে যে একটা কথা আছে তার বাস্তব নমুনা বা দৃষ্টান্ত মনে হয়েছে। বইখানাকে ও তার লিখককে। একটা মরিচিকা ময় বিষয় নিয়ে ২৩৮ পৃষ্ঠার বই– আবার এতে ৯ বছর সময় ব্যয়। কত মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক অপচয়ই না হয়েছে!????

পরিশিষ্ট নং – ৫

প্রচলিত কালিমাহ لا إله إلا الله محمد رسول الله শুদ্ধ

শাইখ আব্দুল খালেক সালাফী,

সাবেক প্রিন্সিপ্যাল, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা এবং রসূল করীম (সঃ) এর প্রতি দরূদ।

সমাজে প্রচলিত কালিমাহ তাইয়্যিবাহ لا إله إلا الله محمد رسول الله। এ কালিমাহটি এরূপে কুরআন মাজীদে এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিনা তা জানার জন্য সারা বিশ্বের ৪৭ জন ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মহোদয়গণের নিকট প্রশ্ন পাঠিয়েছেন তথ্যানুসন্ধানী গবেষক জনাব আব্দুল্লাহ আল-ফারুক বিন আব্দুর রহমান সাহেব। উপরোক্ত ৪৭ জন ইসলামী

চিন্তাবিদ ও গবেষকগণের মধ্যে মাত্র উত্তর দিয়েছেন ৪ জনে। বাকী সবাই এ বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করছেন বলে তাঁকে উত্তর দিয়েছেন। সৌদী আরব শিক্ষা, গবেষণা, ফতওয়া, দাওয়াত, ইরশা'দ – এর বিভাগীয় প্রধান শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুলাহ বিন বায। তিনি উত্তর পত্রে উল্লেখ করেছেন যে, لا إله إلا الله সাথে محمد رسول الله এর সংযোগ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।* অবশিষ্ট ৩ জনের উত্তরে কিছু অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে, সেজন্য কলম ধরতে বাধ্য হলাম। এতে তৎকিঞ্চিত উপকার সাধন হলে শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। لا إله إلا الله এর সাথে محمد رسول الله সংযোগ আরবী ব্যকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র এবং হাদীসের দৃষ্টিতে জায়িয তা প্রমাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধের মধ্যে। আল্লাহর আমার এ সামান্য খিদমত কবুল করুন – আমীন।

টীকা: এরূপ কোন বক্তব্য শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায এর লিখনীতে নেই। বরং আব্দুল্লাহ ফারুক ভাওতাবাজীমূলক তার একটি কথার অর্থাৎ বলে অপব্যাখ্যা করে তা লিখেছেন। দেখুন অত্র গ্রন্থের ৩১৭ পৃষ্ঠা।

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد

لا إله إلا الله محمد رسول الله বাক্যের মাঝখানে বিরাম চিহ্ন واو ছাড়া এ বাক্যদ্বয়কে পড়া শুদ্ধ না অশুদ্ধ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে “ইসলামের মূল মন্ত্র কালিমাহ তাইয়্যিবাহ কোন বাক্যটি” পুস্তকে। তাতে জানা গেছে হ্যাঁ ও না এর পক্ষে উলামা মহোদয়গণের দু'টি মত।* আরবী ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র এবং হাদীস দ্বারা কার মতটি সঠিক বলে প্রমাণিত সে সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব নিম্নে সে আলোচনা প্রদত্ত হলো।

وما أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وأليه أنيب

علم معاني এর নিময়ানুযায়ী কোথায় وصل (আতফ) এবং কোথায় فصل (ফাসল) বর্জন করা জরুরী। সে সব স্থানগুলোর পরিচয় আমি পূর্বে পেশ করব ইনশাআল্লাহ। কেননা তাতে পরবর্তী আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হবে।

حرف واو দ্বারা দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের উপর عطف (আত্ফ) হওয়ার স্থানঃ

১। প্রথম বাক্য যদি কোন عامل এর আওতায় থাকে এবং বক্তা দ্বিতীয় বাক্যকে সে عامل এর عمل এ শরীক করতে ইচ্ছুক হয়। তাহলে দ্বিতীয় বাক্যের প্রথম বাক্যের সাথে সংযোগ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত এই:

উভয় বাক্যের মধ্যে عقلي বা خيالي বা وهمي সম্পর্ক جهة جامعة থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে ইত্তিহাদ বা অভিন্নতা থাকতে হবে। যেমন زيد يكتب ويشعر লেখা ও কবিতা রচনার মধ্যে প্রকাশ্য সাদৃশ্য আছে এ জন্য এখানে عطف করা হয়েছে।

২। উভয় বাক্যের মধ্যে কামালে ইনকিতা মা'আ ইহাম (كمال انقطاع مع إيهام) থাকা দরকার। অর্থাৎ বাক্যদ্বয় পরস্পর বিরোধী হবে অর্থ শব্দ উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে। অর্থাৎ তার প্রথম বাক্য خبرية হলে দ্বিতীয় বাক্য انشائية হবে।

*উলামাগণের দু'টি মত নেই, বরং একটিই মত। শুধু দ্বিমত করেছেন আব্দুল্লাহ ফারুক। আর সে আলিমগণের কাতারভুক্ত নয়। এমনকি যারা তার সাথে একমত তারাও নয়। – লেখক।

শুধু তাই নয় উভয় বাক্যের মধ্যে ইহাম (إيهام)-ও থাকতে হবে। অর্থাৎ عطف না করলে বক্তার উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যেমন لا وأيدك الله। এ বাক্যদ্বয় দ্বারা বক্তা শ্রোতার জন্য দু'আ করছেন। কিন্তু عطف ছাড়া পড়লে দু'আর অর্থ না দিয়ে বদ দু'আর অর্থ দিবে। তাতে বক্তার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এই ইহামের সাথে সাথে ইনকিতা انقطاع-ও পাওয়া যাচ্ছে। কেননা উভয় বাক্য পরস্পর বিরোধী دعائية হওয়ার কারণে। তাছাড়া উভয় বাক্যের মধ্যে جهة جامعة আছে।

৩। উভয় বাক্য যদি কামালে ইত্তিসাল এবং কামালে ইনকিতা এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে এবং উভয় জুমলা (বাক্য) শব্দ ও অর্থ অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে পরস্পর মুত্তাহিদ বা অভিন্ন হয়। অর্থাৎ উভয়টি জুমলা খাবারিয়া অথবা উভয়টি জুমলা ইনশাইয়া انشائية হয়। শুধু তাই দু'টি বাক্যের মধ্যে উপরোক্ত আকলী عقلي খেয়ালী خيالي ও ওহমী وهمي

সংযোগকারী কারণের মধ্য হতে কোন একটি কারণ উভয় বাক্যের মধ্যে হওয়া দরকার। তাহলে দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের্ উপর حرف عطف واو দ্বারা عطف করা শুদ্ধ। যেমন يخادعون الله وهو خادعهم' এবং كلوا واشربوا

যে যে স্থানে عطف করা নিষিদ্ধ

১। বক্তা যদি দ্বিতীয় বাক্যকে প্রথম বাক্যের حكم اعرابي তে শরীক করার ইচ্ছা পোষণ না করে তাহলে عطف করা নিষিদ্ধ। যেমন وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون – الله يستهزء بهم

এখানে الله يستهزء بهم বাক্যটিতে إنا معكم إنما نحن مستهزءون বাক্যের উপর عطف করা হয়নি। কেননা দ্বিতীয় বাক্যটি মুনাফিকগণের مقولة বা কথা নয় এটি আলাহর কথা বা مقولة। যদি عطف করা হতো তাহলে قالوا এর مفعول এর সাথে শরীক হয়ে মুনাফিকদের مقولة বা কথা হওয়া সাব্যস্ত হতো যা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে এখানে عطف করা হয়নি।

২। প্রথম বাক্য যদি কোন আমলের আওতায় না থাকে আর তার জন্য এমন একটি গুণ বা বিশেষ্য থাকে যাকে দ্বিতীয় বাক্যের উপর আরোপ করা কোনক্রমেই উচিত নয়। এমন ক্ষেত্রে عطف বর্জন করা জরুরী। কেননা عطف করলে দ্বিতীয় বাক্যকে সে হুকুমে শরীক হয়ে যাওয়ার কারণে বক্তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ প্রকাশ পাবে। যেমন اذا خلوا এ বাক্যের উপর الله يستهزء بهم বাক্যটিকে عطف করা হয়নি। কেননা اذا خلوا বাক্যটি شرطية বুঝা যায় যে, إنا معكم إنما نحن مستهزءون এরূপ কথা মুনাফিকগণ তখন বলত যখন তারা তাদের শয়তানগণের সাথে নির্জনে মিলিত হত। কিন্তু তারা যখন মহানবী (সঃ) এর সাহাবীগণের সাথে থাকত তখন এরূপ কথা বলত না। এরূপ অর্থ এজন্যে হবে যে, قالوا বাক্যটি اذا যরফের সাথে مقيد বা নির্দিষ্ট। علم معاني এর বিধানানুযায়ী ظرف যখন مقدم হয়, তখন تخصيص এর উপকার সাধন করে। এ দৃষ্টিতে قالوا বাক্যের উপর الله يستهزء بهمবাক্যটি عطف হলে قالوا বাক্যটির মত ظرف এর সাথে مقيد হয়ে যাবে এবং তার অর্থ হবে এরূপঃ- তাদের সাথে আল্লাহর বিদ্রূপ করা ঐ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট যে সময় তারা তাদের শয়তানগণের সাথে মিলিত হতো। কিন্তু আয়াতের অর্থ এরূপ নয়। বরং আলাহর এ শাস্তিটি তাদের

সাথে সদা সর্বদা জড়িত ছিল। আয়াতের এরূপ অর্থটি عطف করলে প্রকাশ পেত না। এ কারণে الله يستهزء بهم বাক্যটিকে قالوا বাক্যের উপর عطف করা হয়নি।

৩। উভয় বাক্যের মধ্যে যদি কামালে ইনকিতা বেলা ইহাম (كمال انقطاع بلا إيهام) বিদ্যমান থাকে অথবা এরূপ না হয়ে উভয় বাক্যের মধ্যে كمال اتصال (কামালে ইত্তিসাল) অথবা দুই কামালের কোন একটির সাথে সাদৃশ্য হয় তাহলে عطف নিষিদ্ধ।

এখন আমরা দেখব যে, আতফ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হওয়ার জন্য নির্ধারিত তিন তিনটি কারণের মধ্যে কোনটির সাথে কালেমা তাইয়্যিবাহ لا إله إلا الله محمد رسول الله সম্পৃক্ত। عطف শুদ্ধ হওয়ার কারণ দৃষ্টিতে لا إله إلا الله محمد رسول الله বাক্যদ্বয়ের মাঝখানে সংযুক্তকরণ অব্যয় واو ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কেননা প্রথম বাক্য لا إله إلا الله কোন আমলের আওতাভুক্ত নয় যাতে দ্বিতীয় বাক্যকে বক্তা শরীক করার ইচ্ছা পোষণ করে।

عطف শুদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ কামালে ইনকিতা মা-আ ইহাম। কালিমাহ তাইয়্যিবাহ এর মধ্যে এর লেশ মাত্র নাই। তার কারণ কামালে ইনকিতা كمال انقطاع অর্জিত হয় উভয় বাক্য পরস্পর বিপরীত হলে। অর্থাৎ একটি خبرية হলে অপরটি হবে انشائية। শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে। শুধু তাই নয় বরং উভয় বাক্যের মধ্যে جهة جامعة থাকা দরকার। তাছাড়া عطف করলে বক্তার উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তাও এখানে নাই। যাকে ايهام বলে। উপরোক্ত কারণগুলোর মধ্যে কোন একটিও কালিমাহ তাইয়্যিবাহর মধ্যে নাই এ কারণে عطف নিষিদ্ধ।

তৃতীয় কারণ দৃষ্টিতে যদিও এ কালিমার বাক্যদ্বয় পরস্পর মুত্তাহিদ বা অভিন্ন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে جهة جامعة লেশ মাত্র নাই। এ কারণে عطف নিষিদ্ধ। (সারমর্ম মুখতাসারুল মা'আনী ফসল ওসল অধ্যায় পৃষ্ঠা নং ২২৪/২২৫)

এখানে জানার বিষয় এই যে, কালিমাহ তাইয়্যিবাহর মধ্যে عطف নিষিদ্ধ হওয়ার কোন কোন কারণ বিদ্যমান আছে যার কারণে উভয় বাক্যের মধ্যে সংযুক্তিকরণ অব্যয় واو ব্যবহার করা হয়নি।

عطف নিষিদ্ধ হওয়ার কারণের মধ্যে কামালে ইনকিতা' বেলা ঈহাম كمال انقطاع بلا ايهام কালিমার মধ্যে নাই। কেননা কামালে ইনকিতা অর্জিত হয় উভয় বাক্য خبرية ও انشائية তে একে অপরের বিপরীত হলে, যা এ কালিমার মধ্যে নেই। তেমনি কামালে ইত্তিসাল ও বাক্যদ্বয়ের মধ্যে থাকতে পারে না। কারণ كمال اتصال অর্জিত হয় চারটি স্থানে।

(ক) দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের সিফাত হলে। (খ) দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাকীদ হলে। (গ) দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্য হতে বদল হলে, (ঘ) দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের আতফে বয়ান عطف بيان হলে।

উপরোক্ত কারণগুলোর কোন একটিও কালিমাহ তাইয়্যিবাহ এর মাঝে বিদ্যমান নাই। এ কারণে দুই বাক্যের মধ্যে حرف عطف واو ব্যবহার করা হয়নি। তবে عطف অশুদ্ধ হওয়ার তৃতীয় কারণটি পাওয়া যায়। কাজেই عطف ছাড়া পড়া শুদ্ধ হবে না এমন মন্তব্য করা মোটেও সমীচীন হবে না।

কালিমাহ তাইয়্যিবাহ এর মধ্যে عطف নিষিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় কারণ বিদ্যমান আছে বিশ্লেষণসহ তার প্রমাণ

এ ব্যাপারে আমরা পূর্বে অবগত হয়েছি যে, প্রথম বাক্য যে গুণে বা বিশেষ্যে বিশেষিত দ্বিতীয় বাক্যকে যদি সে গুণে বা বিশেষে শরীক করা উদ্দেশ্য না হয় তাহলে عطف বর্জন করা জরুরী। কালিমাহ তাইয়্যিবাহ এর কারণটির সাথে পূর্ণভাবে সংশিষ্ট। কারণ এ কালিমার প্রথম বাক্যটি قصر الصفة على الموصوف গুণে বা বিশেষ্যে বিশেষিত যাকে দ্বিতীয় বাক্য محمد رسول الله উপর কোনক্রমে আরোপ করা যাবে না। কেননা তাতে দ্বিতীয় বাক্য محمد رسول الله অর্থ দাড়াবে এরূপ যে, একমাত্র محمد صلى الله عليه وسلم আলাহর রসূল আর কেউ নন। যেভাবে الوهية খাস হয়েছে আল্লাহর সাথে علم المعاني এর নিয়মানুযায়ী সেভাবে رسالة ও খাস হবে محمد رسول الله এর সাথে। অথচ আল্লাহর রাব্বুল আলামীন অসংখ্য নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। (ভাবার্থ মুখতাসারুল মা'আনী পৃঃ ১৮৩)।

কাজেই যখন পূর্ব বাক্যের গুণ বা বিশেষণ দ্বিতীয় বাক্যের উপর আরোপ করা কোন ক্রমে সমীচীন নয়। তখন দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্য হতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গেল। কোন প্রকার সংযোগ স্থাপনকারী অব্যয়

ব্যবহার করার আর কোন প্রয়োজন রইল না। সুতরাং কালিমাহ্ তাইয়্যিবার বাক্যদ্বয়কে মাঝখানে واو ছাড়াই পড়া শুদ্ধ এবং واو দ্বারা عطف করে পড়া অশুদ্ধ।

পরিশিষ্ট নং ৬

দারুল ইফতা বাংলাদেশ– এর শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত "ফাতাওয়া টি লক্ষ্য করুন।

এটি তিনি আব্দুল্লাহ ফারুকের পত্রের জবাবে ও তার বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি এটির বিরুদ্ধেও বিরূপ মন্তব্য করেছেন ও লেখককে কটাক্ষ করেছেন।

প্রশ্ন : ইসলামের বুনিয়াদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ" কালেমা আলকুরআনের কোন সূরাতে আছে? " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর পর

কোন বিরাম চিহ্ন বা দুইটি বাক্যকে পৃথককারী কোন হরফ বা শব্দ যেমন "ওয়া আন্না" ব্যবহার না করে " মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লেখা পাঠ করা কি ব্যাকরণ অনুযায়ী সঠিক? অনুবাদে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আলাহর রাসূল কি সঠিক? আব্দুল্লাহ আল ফারুক ।

উত্তর: ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক আকীদা হল দু'টি । এক তাওহীদ অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অতএব হে নবী ভাল করে জেনে নাও আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নাই ।

– সূরা মুহাম্মাদ ১৯ ।

দুই রিসালাত – অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ । আল্লাহ বলেন :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল । আর যে সব লোক তার সঙ্গে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি শক্ত, কঠোর ও পরস্পরে পূর্ণ দয়াশীল ।

(সূরা আল-ফাতহ – ২৯)

ইসলামের অন্যান্য আক্বীদাসমূহ এ দু'টি থেকেই নির্গত এবং এ দু'টিরই শাখা-প্রশাখা । এ দু'টি আক্বীদার ওপর ইসলামের গোটা কাঠামো ভিত্তিশীল । এর কোন একটি বাদ দিয়ে ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না । এ দ'টি বিষয় পর্স্পর ইসলামের জন্য অপরিহার্য । এ দু'টি বিষয়ের স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য ব্যতীত কোন মানুষই মুসলমান হতে পারে না ।

কুরআন মাজীদে এ দু'টি বিষয় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে । ইসলামের মূল ভিত্তি হিসাবে রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম স্বীয় হাদীছে এ দু'টি বিষয়কে একত্রিত করেছেন এবং এর স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে লোকদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন । তিনি বলেন:

بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان -

ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্যদান, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, এবং রমজান মাসে রোযা রাখা। – আল-হাদীস।

ইসলামের দাখিল হওয়া বা ঈমান আনার জন্য কালিমাহ্ শাহাদাত পাঠ করা অপরিহার্য। বহু সহীহ হাদীসে কালিমা শাহাদাতের বর্ণনা এসেছে। কালিমা শাহাদাতে দু'টি বিষয় রয়েছে। একটি হল শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থাৎ أشهد (আশহাদ) (আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি) এটা আকীদা বিশ্বাসের অংশ নয় সাক্ষ্য প্রদানের অংশ মাত্র। অপরটি হল, যার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়।

কালিমাহ শাহাদাত থেকে সাক্ষ্য প্রদানের শব্দ (أشهد) আশহাদু ও তার কারণে ব্যবহৃত অব্যয় أن আন ও وأنّ অআন্না বাদ দিলে যা থাকে তা হল لا إله إلا الله محمد رسول الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ একেই কালিমাহ তাইয়্যেবা বলা হয় এবং এ কালিমাই ইসলামের মৌলিক আক্বীদা তাওহীদ ও রিসালাত – এ সংক্ষিপ্ত রূপ। কালিমাহ্ শাহাদাতে কালিমা তাইয়্যিবার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। কালিমা শাহাদাতে সাক্ষ্য প্রদানের শব্দ ছাড়া আক্বীদা বিশ্বাসের নতুন কিছুই সংযোজন হয়নি্ কাজেই কালিমাহ শাহাদাত মূলতঃ কালিমা তাইয়্যেবা। কালিমা তাইয়্যেবা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء 24

"তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা কালিমাহ তাইয়্যেবাহকে কোন্ জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন? যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, একটি ভাল জাতের গাছ যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ় নিবদ্ধ হয়ে আছে এবং শাখাগুলি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। – সূরা ইব্রাহীম ২৪।

কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কালিমাহ তাইয়্যেবাহ্ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুজাহিদ ও ইবনে জুরাইজ বলেন, কালিমাহ

তাইয়্যেবা হল – ঈমান। আল-জামি লি আহকামিল কুরআন – ৯/২৩৬।

তাওহীদ ও রিসালাত لا إله إلا الله محمد رسول الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ – এর প্রত্যয় ও সাক্ষ্য প্রদান হল ঈমান।

কানযুল উম্মাল গ্রন্থে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে কালিমাহ তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর এর কয়েকটিকে দুর্বল বলেছেন। সহীহ হাদীসের সহায়ক হিসেবে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করা যায়। অতএব, কালিমা তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কুরআন ও হাদীস কর্তৃক বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। এটা কোন ব্যক্তির কল্পিত বা রচিত কালিমাহ নয়।

কালিমাহ তাইয়্যেবার দু'বাক্যের মাঝখানে কোন বিরাম চিহ্ন বা সংযুক্তিকরণ অব্যয় ব্যবহার করা সম্পর্কে আরবী ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম হল বাক্যদ্বয়ের পূর্বে আমিল হিসাবে কোন বিশেষ্য বা ক্রিয়া পদ যদি না থাকে এবং প্রথম বাক্য এমন কোন ইরাবের আওতায় যদি না থাকে যা দ্বিতীয় বাক্যও শামিল করে, তাহলে উক্ত বাক্যদ্বয়ের মাঝখানে কোন সংযুক্তিকরণ অব্যয় না থাকা জরুরী। এতে উক্ত বাক্যদ্বয়ের মাঝখানে কোন বিরাম চিহ্ন ছাড়াই দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্য থেকে পৃথক হয়ে যাবে। যেমন لا إله إلا الله محمد رسول الله বাক্যদ্বয়ের পূর্বে অমিল হিসাবে (أشهد) আশহাদু বা অনুরূপ কোন বিশেষ্য বা ক্রিয়া পদ না থাকায় দ্বিতীয় বাক্য (محمد رسول الله) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর পূর্বে "ওয়াও" (واو) বা "আন" (أن) এর ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং উভয় বাক্যে পূর্ণ সংহতির (কামালে ইত্তিসাল) কারণে বাক্যদ্বয়ের মাঝখানে কোন প্রকার বিরাম চিহ্ন থাকবে না।

অতএব لا إله إلا الله محمد رسول الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ – এর অর্থ হবে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

প্রমাণ দেখুন: মুখতাসারুল মা'আনী ও মুতাওয়াল-আল ফাসাল ওয়াল অসাল অধ্যায়।

মাসিক পৃথিবী (ইসলামী গবেষণা পত্রিকা)
বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৭ এপ্রিল ১৯৯৫ ইং চৈত্র ১৪০১ যুলকাদা ১৪১৫
সম্পাদক আব্দুল মান্নান তালিব, নির্বাহী সম্পাদক এ, কে, এম, নাজির আহম্মদ

[বিঃ দ্রঃ দারুল ইফতা বাংলাদেশ গত ৮/২/৯৫ ইং তারিখে তাহাদের নিজস্ব প্যাডে টাইপকৃত ফাতওয়া পত্রটি ডাকযোগে আমার নিকট পাঠান। আর এই ফাতওয়াটিই তারা মাসিক পৃথিবীতে ছাপিয়েছেন।]

আরো দেখুন "কালিমাহ্ তাইয়্যিবাহ কোন বাক্যটি" পৃষ্ঠা নং ৯৬-৯৮।

পরিশিষ্ট নং ৭

জামেয়া সালাফিয়া বেনারস থেকে প্রকাশিত

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ প্রসঙ্গে ফাতওয়া

এই ফাতওয়াটি জামেয়া সালাফিয়া বেনারস থেকে প্রকাশিত "মোহাদ্দিস" পত্রিকার জানুয়ারী ১৯৯৬ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

নিম্নোক্ত মাসলা প্রসঙ্গে ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ে কেরাম কি বলেন? প্রশ্ন: "কলেমা তাইয়েবা" লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর সঙ্গে 'ওয়াও আত্‌ফ' ছাড়া – মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– বলা যেতে পারে কি না? অর্থাৎ – লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কারণ এভাবে হাদীসে দেখতে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, 'ওয়াও আতফ' এর পরে ওয়া আন্না* মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ এসেছে। এরূপ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর পরে ওয়া আশহাদু আন্না* মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ- ও এসেছে। **এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ বলা বিদ'আত ও শির্ক কি?** যেমন উক্ত নিয়মে পড়াকে বেশ কিছু ওলামা বিদআত ও শির্ক বলেন। আমি আশা করি মুফতি সাহেব সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে শুকরিয়ার সুযোগ দিবেন। ওয়াস সালাম,

প্রশ্নকারী – শামসুদ্দীন মুহিউদ্দীন। ঠিকানা লক্ষ্মণপুর, পোঃ ছিকরহাট, থানা পাকুড় জিলা পাকুড়, বিহার ৮১৬১২২।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর– প্রকাশ থাকে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা যেতে পারে। **অর্থাৎ লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ বলা বিদআত ও শির্ক নয়।** এর বিপরীত সেই সব ওলামা উক্ত কালেমাকে বিদআত ও শির্ক বলেন, যারা বিকৃত প্রকৃতির হওয়ার কারণে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে অর্ন্তদৃষ্টি ও বিচক্ষনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কারণ, তারা যদি হাদীস ও তফসীর পড়া শুনা করতেন তাহলে তারা এত সাহসিকতার সাথে এটাকে বিদআত ও শির্ক বলতেন না।

মুজামে সগীর লিত্ তাবারানী আনসারী দিল্লী ছাপা ২০৭ পৃষ্ঠায় হযরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, লাম্মা অয্‌নাবা আদামু .... ইলা রাফা'তুরাসী ইলা আরশিকা ফায়েজা ফীহে মকতুবুন্ – লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ। এই হাদীসটি সহীহ হওয়া সম্পর্কে আল্লামা তকীউদ্দীন সুবকী (রহঃ) কিতাবু শিফা-য়িস সাকাম মিশরী ছাপা ১৩৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, ইন্নাল হা-কিমা সাহহা হাহু। অর্থাৎ হাকেম এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে অনাহনু নাকুলো কাদ ই'তামাদনা ফী তাসহীহী আলাল হাকিমি – অর্থাৎ আমরা হাকেমের সহীহ হওয়ার উপর ভরসা করেছি। যুরকানী শারহে

মাওয়া-হিবে লা- দুননিয়্যা মিসরী ছাপা ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা এই হাদীস এর সহীহ হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, " রওয়া আবুশ্ শাইখ আল-হাকিম আন্ ইবনে আব্বাসীন সহহাহুল হা-কি ও আকর্রা হুস সুবকী আল-বালকীনী" অর্থাৎ ওতে তিনি একথাও বলেছেন যে, এই হাদীস অন্য সূত্রেও এসেছে। (অর্থাৎ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায়)।

ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠায় আছে, ফাইন ক্বালা ফাকাইফা লাম ইয়াজকুরির রিসালাতা-ফাল জওয়াব আন্নাল মুরাদা আল মজমুউ স্বা-রা জুজউল আউওয়াল ইলমান আলাইহি কামা তাকুলু কারাতু, কুল হু আল্লাহু আহাদ আয়িস সুরাতা কুল্লাহা। অর্থাৎ হাদীসের কিতাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা-র সঙ্গে মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ যে বলা হয়নি – তার দ্বারা এ প্রমাণ হয় না যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ আদৌ নেই। কারণ প্রথম অংশটা স্বয়ং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ প্রমাণ করে। যেমন আরবেরা প্রবাদে বলে, আমি কুল হু আল্লাহু আহাদ পড়েছি। যার অর্থ হচ্ছে যে, পুরা সুরাটাই পড়েছি। **এমন প্রশ্ন তারাই করে যাঁরা আরবের প্রবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অপরিচিত এবং নিরেট মুর্খ।** এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে নুযহাতুল মাজলিস ও মুনতাখাবুন নাফায়িস আন আখবারিস সালিহীন মিসর ছাপা ১ম খণ্ডে, যা আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুস সালাম সফুরীর গ্রন্থ। তফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড ১৯৪ পৃষ্ঠায় আছে ঃ আলযামাহুম কালিমাতুত তাকওয়া অকানু আহাক্কা বিহা আহলাহা অহিয়া "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" অর্থাৎ কালেমাতুত তাকওয়ার ভাবার্থ কালেমায়ে তাওহিদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এরূপ কথাই তফসীর ইবনে জরীর তাবারী ২৭ খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠাতে বলা হয়েছে।

তাফসীর গারায়িবুল কুরআন ১৩ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠায় আছে,

আল কালিমাতুত তাইয়্যিবাতু হিয়া কাওলু লা ইলাহা ইলাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কোরআনের আয়াত "কলেমাতুন তাইয়্যেবাহ এর তাফসীরে বলেছেন, কলেমা তাইয়্যেবাহর ভাবার্থ হচ্ছে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা। এর থেকে বিস্তারিত দেখতে হলে তাফসীরে খাযিন ৪র্থ খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা ও তফসীরে

জালালায়েন, মিসরী ছাপা ২য় খন্ড ১১০ পৃষ্ঠা দেখুন। হাযা- মা ইন্দী ওয়াল্লাহো আলামু বিস্ সওয়াব। হাররাহু – আব্দুস সালাম আবু হোরায়রা সালাফী – জামেয়া সালাফীয়াহ বেনারস। আল্ জওয়াবো সহীহুন– মোহাম্মদ রাঈস নদভী জামেআ সালাফীয়াহ বেনারস। – আহলে হাদীস মাসিক পত্রিকা। ২৪ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৭৪ ও ১৭৫ পৃষ্ঠা।

পর্যালোচনার ফলাফল:

১। আব্দুল্লাহ ফারুকের লিখিত: কালিমাহ ত্বইয়্যোহ একটি বিভ্রান্তিকর গুমরাহী বই। যার সব সংস্করণের সকল বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

২। সংকলকের আল্লাহর নিকট তাওবা করতঃ মুসলিম সমাজের নিকট ভুল স্বীকার করে সেই স্বীকারোক্তি প্রচার করা উচিত।

৩। লেখক নাকি ২৪ বছর গবেষণা করে লা-ইলাহা- ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ” কে ভুল বাক্য প্রমাণ করেছেন। তাহলে তো মনে হয় এ ভ্রান্তি তার অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে। তাওবাহর আশা খুবই ক্ষীণ।

৪। এমতাবস্থায় তার অপরাধের ওজনটা জেনে রাখা ভাল। যেহেতু তিনি তাওহীদী বাক্যকে শির্কী বাক্য বলে দাবী করেছেন। তাই এ দাবী মুরতাদ হওয়ার কারণ। ইসলামী রাষ্ট্রে যার বিচার মৃতুদণ্ড। সুতরাং তাকে মনে করতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের মৃতুদণ্ড প্রাপ্ত একজন আসামী। সকল জ্ঞানীদের উচিত তাকে যথাসমম্ভব সদয় উপদেশ দান করা যাতে তিনি তার অবস্থান থেকে ফিরে আসেন। তার ভাগ্যে সঠিকে (হিদায়েতে) ফিরে আসা থাকলে অত্র কিতাব খানায় তার জন্য যথেষ্ট। ইনশাআল্লাহ।

৫। কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ কোন্ বাক্যটি ছাড়াও তার লিখিত আরেকটি বই “কুরআনের আলোকে অবশ্যই আরাফার দিবস/ হজ্জ এর পরদিন কুরবাণীর ঈদ” দেখেছি। সেটিও বিভ্রান্তিপূর্ণ একখানা বই। দুনিয়াবী ক্ষেত্রে লোকদের আকর্ষণ যেমন নতুনত্ব ও আধুনিকতার প্রতি তার আকর্ষণ তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন আবিস্কৃত মত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি। যার জন্য তার উভয় বই এ গৃহীত সিদ্ধান্তই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে। তাতে তিনি হক্ব ভেবে বাত্বিলেই পতিত হয়েছেন এবং সুন্নাত ভেবে বিদ‘আতেই জড়িত হয়েছেন।

আত্মপ্রচার ও অন্য সবার বিরোধীতাপ্রিয়তাই হলো তাঁর সকল লেখনী ও গবেষণার লক্ষ্য এবং জীবনের শখ ও আকর্ষণ। এজন্য হিদায়াতকামী মুসলিম ব্যক্তির ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার তা থেকেও তাকে বঞ্চিত পেয়েছি। কোন কোন আমল ইবাদাতের ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিস্থিতির যে প্রয়োজন রয়েছে সেটা তার ব্রেনেই ধরেনি। ঈদের জামাত ও ছিয়ামের জন্য পরিবেশ হলো লোক সমাজ। যার প্রয়োজনীয়তার প্রতি

তাগিদ স্বরূপ একাধিক হাদীছ এসেছে। কিন্তু দাড়ি রাখা ও পর্দার জন্য জামাআত ও সমাজের কোন শর্ত ও বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ তার নিকট এ সাধারণ জ্ঞানটুকুও না থাকায় উভয় বিষয় এক মনে করেছেন। এই হলো অজ্ঞতা নির্ভর গবেষণার ফল। দেখুন "কুরআনের আলোকে অবশ্যই আরাফার দিবস/ হজ্জ এর পরদিন কুরবাণীর ঈদ" পৃঃ ১৫।

সুতরাং তার সম্পর্কে ও তার লেখনী সম্পর্কে ইনসাফ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত এই যে, তার জন্য ইসলামী বিষয় বিশেষভাবে আক্বীদাহ ও ইলমী বিষয়ে বই লিখা জায়িয নয়। অজ্ঞতাবশত: যে সব বই পুস্তক লিখেছেন প্রত্যেকের নিজ নিজ দ্বীন ও ঈমানের নিরাপত্তার জন্য তা পড়া নিষেধ। পুড়িয়ে ফেলা জরুরী।

আল্লাহ সকল মুসলিম সমাজকে যাবতীয় ভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং হিদায়াতের উপর কায়েম দায়েম রাখুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

আলাহ্ তাওফীক্ব দাতা।

(الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات)

(সকল প্রশংসা যার অনুগ্রহে ভাল কাজগুলো সম্পন্ন হয়।)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين—

أما بعد

فإن الله سبحانه وتعالى جعل بني آدم أكرم الخلق وأعزهم، وليس كلهم أكرم عنده بل الذين آمنوا به واتقوه. قال تعالى: ''إن أكرمكم عند الله أتقاكم''. ولا يكون العبد متقيا إلا بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، وبهما يتم تحقيق عبودية الله وألوهيته التي خلق الله الخلق لأجلها- قال الله تعالى- ''وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون''. قال المفسرون: ''إلا ليوحدون''- لأن العبادة ما يحقق العبد من خلاله التوحيد- فما حقق العبد من خلاله التوحيد فهي عبادة وما لم يحقق فيه العبد التوحيد فليست بالعبادة، بل هو شرك بالله. قال الله تعالى في الحديث القدسي:''أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركهِ'' رواه مسلم-

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك و من صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائى فقد أشرك- رواه أحمد

فالتوحيد هي الغاية والحكمة من خلق المخلوقات من الإنس والجن والجمادات. وللإقرار والاعتراف به كلمة خاصة متعددة اللفظ ومختلفة الحجم، أخصرها: ''لا إله إلا الله'' وأجمعها على اختصارها ما جاء فى الأحاديث التي تضمنت أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" وأشهرها وأكثرها نطقا وكتابة : ''لا إله إلا الله محمد رسول الله''.

هذه هي الكلمة التى مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة ثلاثة عشر عاما يدعو الناس إليها ومن قالها خالصا من قلبه في تلك الفترة دخل الجنة - إذ لم يفرض على المسلمين من الفرائض شيئا - إلا الصلاة فإنها فرضت قبل الهجرة بعام وشهور.

و إنما خصص الله هذه المدة الطويلة للدعوة إلى هذه الكلمة فقط، دون أن يفرض بقية الفرائض لترسخ كل معاني هذه الكلمة في أذهان الناس وتثبت في معنوياتهم وتمزج فى مخهم وأعراقهم، ومن شأن رسوخها بهذا المستوى يسهل تطبيق الفرائض والتزامها إذا فرضت، دون أي تردد وتبطئ، أو تعب ومشقة. وفعلا شوهد ذلك عندما فرضت الفرائض ونزلت الأوامر والنواهي، حيث طبقوا كل فريضة من أول يوم وأول لحظة من

حين فرضها دون أى احتجاج أو انتظار إلى فرصة ومناسبة أو تعليقها على علل وأسباب حتى قاموا بحقوقها ولوازمها وبكل ما تتطلب إليه. ومن أوضح أمثلة على ذلك أول غزوة التي حدثت بين المسلمين وكفار مكة والتي فرق الله فيها بين الحق والباطل – وهي عزوة بدر- قتل فيها القريبُ من المسلمين قريَبه' من المشركين في النسب.

وذلك لأن الكلمة - كلمة الشهادة - ليست مجرد لفظ يقال، فإنما لها معان دلت عليها فهمها أولئك المسلمون والمشركون فمن وفقه الله للخير والدخول في الإسلام قالها والتزم بما دلت عليه عملا وتركا، ومن لم يوفق امتنع عنها لأنه رأى من نفسه عدم الالتزام بما دلت عليه .

عمل الناس بهذه الكلمة على معانيها الصحيحة – كما ذكر- زمنا كانوا فيه أعز الناس فلما ذهب الصحابة والتابعون وأهل القرون الأولى وخلف من بعدهم خلف جهلوا معناها وتناسوها وأصبحنا فى زمن ينطق بها الكثيرون بالسنتهم ويخالفون معناها بأعمالهم وأقوالهم لجهلهم' فنراهم ألّهو غير الله بتعظيم وتقدير ودعاء ونذر وركوع وسجودوقيام' وخوف ورجاء وتوكل وحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية – وتحاكم إليها، فأصبح الواقع أنك إذا أردت أن تزن المسلمين اليوم على ميزان الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد الظاهر لم تجد أكثر المنتسبين إليه متمسكين به لا ظاهرا ولا باطنا فأكثرهم تاركون للصلاة، مانعون للزكاة، مفطرون في نهار رمضان، ممتنون عن أداء الحج والعمرة، مستهترون بشرائعه، فهولاء كما قال الشيخ محمد عبده رحمه الله – : مسلمون جغرافيون' أي أنهم إذا عدوا أهل قطر عدوهم مسلمين والإسلام يبرأ منهم.

وإذا أردنا وزن المسلمين المصلين على الاسلام الحق الذي يرضاه الله ولا يرضى سواه لم نجد إلا نسبة ضئيلة ربما كان واحدا فى الألف أو أقل''.

(أنظر: حياة القلوب بدعاء علاب الغيوب – للإمام وخطيب الحرم المكي أبي السمح محمد عبد الظاهر بن محمد نور الدين ص 56-57)

ولما وصل المسلمون إلى ما وصلوا من الأحوال السيئة والواقع الأليم يصعب معها اعتبارهم من المسلمين لأجل جهلهم بالكلمة ومدلولاتها — والحظ بهذا الواقع أوفر للشعب النبغالي — ألفت هذا الكتاب باللغة البنغالية باسم : **"توجيهات الكلمة"** لتعريفهم بتفاصل معاني هذه الكلمة إثباتا ونفيا وعملا وتركا* ونقض بعض الشبهات حول بعض ألفاظ "الكلمة" حيث نشأت هذه الفكرة في أوساط هذا الشعب بأن الكلمة بلفظ "لا إله إلا الله محمد رسول الله" كلمة خاطئة لغويا وشركية معنا، وقد ألف بعضهم كتابا لإثبات هذه الفكرة، واقتنع الكثيرون من هذا الشعب بهذه الفكرة ويبتعدون من نطقها وكتابتها ويضللون من يؤيدونها.

كما تأصلت الفكرة بأن كلمة الإسلام خمسة — نظرا إلى ورودها بألفاظ مختلفة، فلابد للمسلم الحقيقى بزعمهم أن يحفظ الكلمات الخمس، وسموها بأسماء معينة ككلمة طيبة، وكلمة التوحيد وكلمة الشهادة وكلمة التمجيد وكلمة رد الكفر، ربما بعض ألفاظ هذه الكلمات مخترعة من قبل بعضهم. مع أن الصحيح والحق أن كلمة الاسلام واحدة، متعددة اللفظ ومختلفة الحجم.

*وجدت غير واحد من المؤلفات بعنوان معنى لا إله إلا الله وقد ترجمت أيضا باللغة البنغالية إلا أنها مختصرة جدا لا تفي بحاجات هذا الشعب اليتيم في علم العقيدة والتوحيد. فقمت بتأليفها ولتتناسب طبائعهم وتتفق بيئتهم وساحتهم

إليكم بعض ما تضمن هذا الكتاب:

1- التعريف بالكلمة وعددها
2- أسماء الكلمة
3- كم عدد الكلمة؟
4- أهمية الكلمة

الجزء الثاني

كتبه :
أكرم الزمان بن عبد السلام
١٥ شعبان ١٤٣٢ ه
الموافق ١٦ يوليو ٢٠١١م

ডকুমেণ্টরী নির্ভর ফায়সালাহ

এই গ্রন্থখানা "কালিমাহ ত্বইয়্যিবাহ্ -

"লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ভারতবর্ষের আলিমে দ্বীন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রহ.) লিখেছেন।

এই গ্রন্থখানা কালিমাহ "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। লিখেছেন আরব বিশ্বের বরেণ্য আলিমে দ্বীন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদাহ বিষয়ের প্রফেসর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল ড. আলী বিন নাছির ফাক্বীহী।

আরব বিশ্বের ও ভারতবর্ষ্যের বরেণ্য আলিমগণ যেহেতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" কে শুদ্ধ ও তাওহীদী বাক্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাহলে এটি শিরকী ও অশুদ্ধ বাক্য নয়।

পক্ষান্তরে নিম্নোক্ত বই খানা কুরআন ও সুন্নাহের ভাষাজ্ঞানে অজ্ঞ একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির লিখিত। সে বইটিতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"কে অশুদ্ধ ও শিরকী বাক্য বলে অভিহিত করেছে। তাই বইটিকে বাত্বিল বলে চিহ্নিত করা হলো। (৩৫০-৩৫২ পৃষ্ঠা)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين—

أما بعد:

(সকল প্রশংসা আল্লাহর যার অনুগ্রহে ভাল কাজগুলো সম্পন্ন হয়।)

পৃষ্ঠা - ৩৪৪

২। সংকলকের আল্লাহর নিকট তাওবা করতঃ মুসলিম সমাজের নিকট ভুল স্বীকার করে সেই স্বীকারোক্তি প্রচার করা উচিত।

৩। লেখক নাকি ২৪ বছর গবেষণা করে লা-ইলাহা- ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" কে ভুল বাক্য প্রমাণ করেছেন। তাহলে তো মনে হয় এ ভ্রান্তি তার অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে। তাওবাহর আশা খুবই ক্ষীণ।

৪। এমতাবস্থায় তার অপরাধের ওজনটা জেনে রাখা ভাল। যেহেতু তিনি তাওহীদী বাক্যকে শির্কী বাক্য বলে দাবী করেছেন। তাই এ দাবী মুরতাদ হওয়ার কারণ। ইসলামী রাষ্ট্রে যার বিচার মৃতুদণ্ড। সুতরাং তাকে

মনে করতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের মৃতুদণ্ড প্রাপ্ত একজন আসামী। সকল জ্ঞানীদের উচিত তাকে যথাসমম্ভব সদয় উপদেশ দান করা যাতে তিনি তার অবস্থান থেকে ফিরে আসেন। তার ভাগ্যে সঠিকে (হিদায়েতে) ফিরে আসা থাকলে অত্র কিতাব খানায় তার জন্য যথেষ্ট। ইনশাআল্লাহ। পৃষ্ঠা - ৩৪৩

আল কালিমাতুত তাইয়্যিবাতু হিয়া কাওলু লা ইলাহা ইলাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কোরআনের আয়াত "কলেমাতুন তাইয়্যেবাহ এর তাফসীরে বলেছেন, কলেমা তাইয়্যেবাহর ভাবার্থ হচ্ছে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা। এর থেকে বিস্তারিত দেখতে হলে তাফসীরে খাযিন ৪র্থ খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা ও তফসীরে জালালায়েন, মিসরী ছাপা ২য় খন্ড ১১০ পৃষ্ঠা দেখুন। হাযা- মা ইন্দী ওয়াল্লাহো আলামু বিস্ সওয়াব। হাররাহু – আব্দুস সালাম আবু হোরায়রা সালাফী – জামেয়া সালাফীয়াহ বেনারস। আল্ জওয়াবো সহীহুন– মোহাম্মদ রাঈস নদভী জামেআ সালাফীয়াহ বেনারস। – আহলে হাদীস মাসিক পত্রিকা। ২৪ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৭৪ ও ১৭৫ পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠা - ৩৪৩